ANTORJATIK PATHSALA
ISSN 2230-9594

চিন্তাভাবনার সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত এখন বাংলা ভাষায়

আন্তর্জাতিক পাঠশালা

জানুয়ারি- মার্চ ২০২১

সত্যজিৎ ১০০

আন্তর্জাতিক পাঠশালা

জানুয়ারি- মার্চ ২০২১

প্রধান সম্পাদক

অমিত রায়

....

যুগ্ম সম্পাদক

কপোতাক্ষী সুর

শুভেন্দু দাশমুন্সী

পাঠশালা প্রোডাকসন্স

২৩ + ২৪, শেখপাড়া লেন। হাওড়া ৭১১ ১০৪

ANTORJATIKPATHSALA,ISSN2230–9594,JAN–MAR.2021

A Non-conventional Multi-disciplinary Quarterly Journal in Bengali Language
A Peer-Reviewed Journal

ANTORJATIK PATHSALA

Vol. X : Issue 1 : January- March, 2021
E-Journal Edition- Number: 3

স্বত্ব: 'পাঠশালা প্রোডাকসন্স'-এর পক্ষে কপোতাক্ষী সুর

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই পত্রিকার কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না এবং কোনো যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক্স, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো মাধ্যম, যেমন ফটোকপি, ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনো পদ্ধতি) মাধ্যেও প্রতিলিপি করা যাবে না। এই পত্রিকায় প্রকাশিত যেকোনো লেখা অন্যত্র বই আকারে প্রকাশ করতে হলে লেখকদের স্বত্বাধিকারী বা প্রকাশকের লিখিত অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সম্পাদকমণ্ডলী

গৌতম মুখোপাধ্যায়, ভাস্বতী দাস, দীপেন্দ্রনাথ দাস, রাখী মিত্র এবং সঞ্চিতা বসু

সহযোগিতায় : সুব্রত কুমার দে

কারিগরি সহযোগিতায়

সুব্রত সাঁতরা

মুদ্রক

সুব্রত সরকার

সম্পাদকীয় দপ্তর

সোনার তরী অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট এ, ২৩ + ২৪, শেখপাড়া লেন, হাওড়া – ৭১১ ১০৪

যোগাযোগ

চলভাষ: 90076 74123 / 94331 46480

বৈদ্যুতিন ডাক: antorjatikpathsala@gmail.com

ফেস বুক: antorjatikpathsala

ওয়েবসাইট : http://www.antorjatikpathsala.com

প্রচ্ছদ, নামাঙ্কন ও অঙ্গসজ্জা

শুভেন্দু দাশমুন্সী

বিনিময় মূল্য

১৫০ টাকা

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয়।

সাহিত্যচর্চা

অপূর্ব সাহা

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক কাব্য । 1

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মধ্যবিত্তের সংকট: সন্তোষকুমার ঘোষের ছোটোগল্প। 9

বিশ্বজিৎ রায়

শঙ্খ ঘোষের কবিতায় শৈশব স্মৃতি মেদুরতা । 15

লোকসংস্কৃতিচর্চা

নন্দিনী সঞ্চারী

'রায়মঙ্গল' ও 'বনবিবির জহুরানামা' : একটি তুলনামূলক আলোচনা। 18

ইতিহাসচর্চা

অমিত রায়

হিন্দুস্তান সোস্যালিস্ট রিপাব্লিকান অ্যাসোসিয়েশন এবং ভগৎ সিং। 29

চলচ্চিত্রচর্চা

অনিশ রায়

শতবর্ষে চলচ্চিত্র : শত জলঝর্ণার ধ্বনি। 47

দুগ্গা দুগ্গা

চৈতালী ব্রহ্ম

অরণ্যসূক্ত পালামৌ। 61

বিশেষ ক্রোড়পত্র

স ত্য জি ৎ : ১ ০ ০

মানস ঘোষ

সত্যজিতের *পরশপাথর*: বৈভবের কল্পনা আর বিপর্যয়ের দুঃস্বপ্ন। 75

অভীক মজুমদার

সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে মিনিমালিজম। 79

সোমদত্তা ঘোষ কর

সত্যজিৎ রায় ও প্রোফেসর শঙ্কু : এক যুগলবন্দি। 82

অরিন্দম দাশগুপ্ত

ব্র্যান্ড ফেলু। 86

পিনাকী মাইতি

ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি সাহিত্যে ও চিত্রকাহিনিতে : একটি তুলনামূলক প্রতিবেদন। 95

ঋষিগোপাল মণ্ডল

রায়বাবু, ক্যামেরা চলছে ও কাশবনের সেই দৃশ্য। 102

সুব্রত কুমার দে

বিভূতিকথার নবনির্মাণ : প্রযত্নে সত্যজিৎ। 108

সংগ্রাম চ্যাটার্জী

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধস্বর : সত্যজিতের কিশোর সাহিত্য। 122

স ম্পা দ কী য়

এই বিশ্বব্যাপ্ত অতিমারির আবহে আন্তর্জাতিক পাঠশালা-র পত্রিকার পূর্ববর্তী দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে বৈদ্যুতিন মাধমে। পত্রিকার নিজস্ব ওয়েবসাইট আত্মপ্রকাশ করেছে সেই সংখ্যা দুটি। বর্তমান সংখ্যাটিও সেই ধারাবাহিকতা মেনেই প্রকাশিত হল আন্তর্জালে। সকলেই আমরা অবগত বিপদ এখনো কাটেনি। বরং বিপদ ক্রমশ আরো ঘনীভূত হয়েছে। মাঝখানে ক্ষণিক স্বস্তি পাওয়া সত্ত্বেও এই বিপদ কাটেনি আমাদের মাথার উপর থেকে। বরং ক্রমশ আরো বেশি পরিমাণে, আরো তীব্রতর হয়েছে সেই জীবাণুর আক্রমণ। সকলের প্রিয়জন আরো বেশি আক্রান্ত হয়েছেন। আমরা আমাদের জানাশোনা বহু সহনাগরিককে হারিয়েছি। মন সকলের বিষণ্ণ। সেই বিষাদের আবহে কাজ করতে হয়েছে আমাদের। প্রতিদিনের কাজ যেমন, পড়াশোনার কাজ যেমন, তেমনই আমরা সক্রিয় ছিলাম এই সংখ্যাটির প্রস্তুতির কাজেও। এ এক দুঃসহ সময়। প্রতি মুহূর্তে আতঙ্কের আবহে কাজ করে চলা--- প্রতি মুহূর্তে ফোনে চোখ রাখলেই এক ভয়, আরো কোনো প্রিয়জনের এই অসুখে আক্রান্ত হওয়ার খবর শুনব কি না, প্রতিদিন খবরের কাগজ বা টিভির পর্দায় চোখ রাখা মানে অসহায়ভাবে আরো বহু মানুষের চলে যাওয়ার খবর।

এরই মধ্যে নির্বাচনি প্রক্রিয়া চলছে। যাঁদের দেখার কথা সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, ভয়- আশঙ্কা, তাঁরাই ভয়ের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে লাগামছাড়া মিটিং মিছিল করছেন। ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে প্রতিদিনের সেই বল্গাহীন জমায়েত। মনে প্রশ্ন জাগছে, সাধারণ মানুষই যদি সুরক্ষিত না থাকেন, তাহলে কীসের সাধারণতন্ত্র! অন্যদিকে দেখছি, বাণিজ্যের মাত্রাতিরিক্ত লোভে, দেশজোড়া এই মৃত্যুনগরীর মধ্যেই চলছে বিলাসী ক্রিকেট খেলার মহাযজ্ঞ। এ যেন এক নির্লজ্জ উৎসবপালন। সমস্ত দেশের সঙ্গে কীভাবে যেন সঙ্গতিহীন হয়ে উঠল এই ক্রীড়া-উৎসব। যে-দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিনিয়ত বাড়ছে ভয় আর উদ্বেগ সেখানে কী এক বায়ো-বাবল বানিয়ে নাকি নিরাপদ মহার্ঘ সব ক্রিকেট টিম। সাধারণ মানুষ যখন আক্রান্ত, যখন তাদের জন্য কোনো টিকাকরণের যথাযথ পথ দেখাতে ব্যর্থ রাষ্ট্র, তখন বিরাট পরিমাণ অর্থব্যয় করে তৈরি হতে পারে সংসদ ভবন। অবশ্যই মারণ-ভাইরাসের ভয় আছে, তবে চারপাশের এই হৃদয়হীনতা আরো ব্যথিত করছে আমাদের। কামড় হয়ত কিছু কমেছে।

এই আবহে বর্তমান সংখ্যাটি প্রকাশিত হল সত্যজিৎ রায়ের শতবার্ষিক উপলক্ষ্যে। বঙ্গীয় নবজাগরণের শেষ প্রতিভূ তিনি। তাঁর ছবি আর তাঁর সাহিত্যের নানা স্বল্পালোকিত কিছু বিষয় অবলম্বনে সজ্জিত হল এই সংখ্যাটির বিশেষ ক্রোড়পত্র। সমস্ত বঙ্গীয় সাময়িকপত্র যথাযথ সম্ভ্রমের সঙ্গে সত্যজিৎ সম্পর্কে বিবিধ চিন্তা চর্চা শুরু করেছে। সঙ্গত এই স্মরণ। আমরাও এই শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এই সাংস্কৃতিক চর্চায় একটু অন্যভাবে সত্যজিৎ-চর্চাতে কিছু অবলোকন যুক্ত করতে চেয়েছি।

আমাদের নিয়মিত ধীমান পাঠক ও গ্রাহকমণ্ডলী এবং শুভানুধ্যায়ীদের উদ্দেশে শুভেচ্ছা ও এই বিপরীত সময়ে নিরন্তর ভালো থাকার আন্তরিক শুভকামনা।

সম্পাদকমণ্ডলী

আন্তর্জাতিক পাঠশালা

স ম্পা দ ক ম ণ্ড লী

অমিত রায়

সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, অর্থনীতি বিভাগ,

ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়, ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

ড. কপোতাক্ষী সুর

সহযোগী অধ্যাপিকা ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিভাগ (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর),

ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়, ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

শুভেন্দু দাশমুন্সী

সহকারী অধ্যপক, বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিভাগ,

স্যর গুরুদাস মহাবিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ।

গৌতম মুখোপাধ্যায়

সহযোগী অধ্যপক ও বিভাগীয় প্রধান, দর্শন বিভাগ,

বসিরহাট কলেজ, বসিরহাট, উত্তর চব্বিশ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।

ড. ভাস্বতী দাস

সহযোগী অধ্যাপিকা, স্কুল অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস,

সেন্টার ফর স্টাডিজ অফ রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট, জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়, নতুন দিল্লি।

ড. দীপেন্দ্রনাথ দাস

অধ্যাপক, স্কুল অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস,

সেন্টার ফর স্টাডিজ অফ রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট, জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়, নতুন দিল্লি।

ড. রাখী মিত্র

সহকারী অধ্যপিকা, বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিভাগ,

গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস কলেজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ।

ড. সঞ্চিতা বসু

সহযোগী অধ্যপিকা, বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিভাগ,

ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।

চিন্তাভাবনার সপ্তসিন্ধু দশ দিগন্ত এখন বাংলা ভাষায়

ISSN: 2230- 9594

প্র কা শি ত ক্রো ড় প ত্র

সুকুমার রায় অবিস্মরণীয়েষু

অনালোকিত রবীন্দ্রনাথ

জনসংখ্যা ও উন্নয়ন

পায়ের তলায় সর্ষে: ভ্রমণ বিষয়ক ক্রোড়পত্র

কার্টুন ও কমিক্স

সুন্দরবনের সুন্দর আর অসুন্দরের আখ্যানবৃত্ত

নানা ছবির অজানা কথা: বাংলা ছায়াছবি বিষয়ক ক্রোড়পত্র

অনালোকিত কথাকাব্যলোক

নিতি নীতি: ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা বিষয়ক সংকলন

ভাষা ভাবনা আর শিক্ষার সম্ভাবনা

স্বাধীনতা উত্তর বাংলা নাট্যচর্চা

কথা উনিশ শতক

হরেক হাসির তত্ত্ব, তথ্য সত্য ও অসত্য

ধর্ম ও রাজনীতি

সার্ধ শতবর্ষে ভগিনী নিবেদিতা

আজও মার্কস। ১

আজও মার্কস। ২

রূপকথা ও উপকথার জগৎ

উদ্বাস্তু অভিবাসন এবং মহামারি (আন্তর্জালিক সংস্করণ)

সাহিত্য : পাঠ সম্মিলন (ঐ)

সংগ্রহের জন্য সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন

চলভাষ : 90076 74123 / 94331 46480

বৈদ্যুতিন ডাক : antorjatikpathsala@gmail.com

আন্তর্জাতিক পাঠশালা-র পক্ষ থেকে
লেখকদের প্রতি

'আন্তর্জাতিক পাঠশালা' নবীন ও প্রবীণ সকল মুক্তমনস্ক লেখকদের আহ্বান জানাচ্ছে।
নতুন বিষয়-ভাবনা, গবেষণা- চিন্তন প্রবন্ধ বা নিবন্ধ আকারে আমাদের পাঠাতে পারেন।
শব্দসীমা ৩০০০-এর মধ্যে রাখা বাঞ্ছনীয়।
সাহিত্য-বিষয়ক বা ইতিহাস, অর্থনীতি, বিজ্ঞান- ভূবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব, দর্শন চর্চা ইত্যাদি
যে কোনো বিষয়ে মননশীল মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠান আমাদের কাছে।
রচনার ভাষা অবশ্যই হতে হবে বাংলা।

লেখা পাঠানোর নিয়মাবলি

১। হাতে লেখা বা স্ক্যান করা লেখা পাঠাবেন না।
২। লেখাটিকে বাংলা হরফে টাইপ করে পাঠান। ব্যবহার করুন ইউনিকোড।
৩। লেখাটি কম্পোজ করতে ব্যবহার করুন অভ্র।
৪। লেখাটিতে কালপুরুষ বা বৃন্দা ফন্ট ব্যবহার করতে পারেন।
৫। ওয়ার্ডে টাইপ করা একটি কপির সঙ্গে লেখাটির একটি পিডিএফ ফাইল-ও পাঠাবেন।
৬। লেখার সময় সম্পূর্ণ লেখাটি কম্পোজ করুন ১১ পয়েন্টে।
৭। দীর্ঘ উদ্ধৃতি হলে, অবশ্যই তা যথাযথভাবে তিন সেন্টিমিটার ইন্ডেন্ট করে পাঠাবেন ও
উদ্ধৃতিতে অবশ্যই ১০ পয়েন্ট ব্যবহার করবেন।
৮। সম্পূর্ণ লেখাটির সঙ্গে যদি কোনো রেখাচিত্র বা অন্য কোনো ধরনের ছবি ব্যবহার করেন,
তাহলে, লেখার মধ্যে তার অবস্থান চিহ্নিত করে দেবেন এবং লেখার সঙ্গে
ছবিটিরও একটি জেপিইজি ফাইল পাঠাবেন।
৯। তথ্যসূত্র, গ্রন্থপঞ্জি ইত্যাদি লেখার সঙ্গে ফুটনোটে নয়, এন্ডনোটে দিতে হবে।
১০। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি-র বাংলা বানান অভিধান অনুযায়ী বানান বিধি মান্য হবে।
১১। তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জিতে লেখক নাম, রচনা নাম, গ্রন্থনাম, প্রকাশক,
প্রকাশকাল এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা অবশ্যই উল্লেখ করবেন।
১২। উল্লেখপঞ্জি প্রস্তুতিতে যেকোনো আন্তর্জাতিক পদ্ধতিই ব্যবহার করতে পারেন।
১৩। ইংরেজি বই, লেখক এবং প্রকাশকের নামের প্রতিবর্ণীকরণ দরকার নেই।
১৪। লেখা পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: antorjatikpathsala@gmail.com
১৫। লেখার সঙ্গে অবশ্যই আপনার পেশাগত পরিচয়, ই-মেল এবং যোগাযোগের জন্য
দূরভাষ নম্বর উল্লেখ করবেন।

সাহিত্যচর্চা

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক কাব্য

একাদশ শতকের কবি ফেরদৌসী থেকে অষ্টাদশ শতকের কবি
মুহম্মদ মুকীমের রচনা পর্যন্ত এক সুবিস্তারিত ঐতিহ্যে
মধ্যযুগের ইসলাম ধর্মাবলম্বী কবিদের লেখা রোমান্টিক প্রণয় আখ্যানে সাহিত্যের
বিষয়বৈচিত্র্য থেকে তাদের ভাবের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে আলোচনা করলেন **অপূর্ব সাহা।**

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বলতে সাধারণ ভাবে দেব নির্ভর সাহিত্য ধারাকে বুঝি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দেব-দেবী নির্ভর সাহিত্য মঙ্গলকাব্য, অনুসারি সাহিত্য, বৈষ্ণব পদাবলী, জীবনী কাব্য, শাক্তপদাবলী, নাথসাহিত্য ইত্যাদি ধারার পাশাপাশি বাঙালি মুসলমান কবিদের হাতে যে কাব্যের দেখা মিলল তাতে দেব-দেবী নয় রক্তমাংসের নর-নারী কেন্দ্রিক রোমান্স প্রণয় মূলক কাব্য। মধ্যযুগের রচনামাত্রই ধর্ম ভাবনা এই ভাবধারা থেকে বেরিয়ে এসে বাঙালি মুসলমান কবিরা তাদের কাব্যে অনাবিল মানব রসের স্বাদ দিল। যার মূলে ছিল নর-নারীর রোমান্টিক প্রণয় ও সুফি ধর্ম। কিন্তু এই কাব্যগুলিকে রোমান্স না রোমান্টিক বলব তা আলোচনায় বিস্তর দাবি রাখে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এই বিশিষ্ট ধারাকে অনেকে 'রোমান্টিক প্রেমকাব্য' বা 'রোমান্টিক প্রণয়আখ্যাণ' বলেছেন। আবার কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন 'রোমান্স কাব্য'। কিন্তু মনে রাখতে হবে শিল্প বিকাশের ধারায় 'রোমান্স' থেকে 'রোমান্টিকতার' উত্তরণ ঘটেছে। তাই 'রোমান্স' ও 'রোমান্টিকতা' সমধর্মী শিল্প চেতনা নয়। রোমান্টিকতা উনিশ শতকের শিল্প ভাবনার ফল। যা কল্পনা সর্বস্ব বিষয়বস্তু নয়, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বা বুদ্ধি গ্রাহ্য ব্যাখ্যা সূত্রে তা গ্রথিত ও ব্যঞ্জিত। সৃজনধর্মী কল্পনা শক্তি এর একমাত্র বাহন। অন্যদিকে রোমান্স লঘু কল্পনার বিষয়। সাধারণত মুক্ত বিলাস, অবাধ গতি, অকারণ পুলক ও আনন্দ রোমান্সের লক্ষ্য। মধ্যযুগের রোমান্স কাব্যের অলৌকিকতা যুক্তিগ্রাহ্য বা দর্শনভিত্তিক নয়, প্রায় স্বেচ্ছাচারী ও স্বচ্ছন্দবিহারী শিল্পচেতনার দ্বারা তা লালিত ও বিন্যস্ত। সামন্তবাদী সমাজে গোষ্ঠীচিন্তার আবর্তনের সাথে রোমান্সের এবং পুঁজিবাদী সমাজে ব্যক্তি চিন্তার বিকাশের সাথে রোমান্টিকতার সম্পর্ক আছে। মধ্যযুগের প্রণয়কাব্যে সমষ্টির অন্তরালে মর্ত্যমানুষের জীবন পিপাসার কথা আছে। সেযুগের সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামোতে যে জীবনের ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল তার মধ্যে এরূপ রোমান্স কাব্যের বীজ নিহিত আছে।

তের শতকের গোড়ায় বাংলায় তুর্কী বিজয়ে ও রাজ্য স্থাপনে দেশের রাষ্ট্র ও অর্থনীতি ব্যবস্থার গুণগত সামান্য পরিবর্তন ছাড়া প্রকৃতির ও চরিত্রের দিক থেকে বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। একনায়কতান্ত্রিক শাসন কাঠামো এবং ভূমিভিত্তিক কৃষিনির্ভর অর্থনীতি পাল-সেন যুগের মত পাঠান-মুঘল আমলে অব্যাহত ছিল – যা সামন্তবাদ নামে পরিচিত। সামন্তপতিরাই ধন-সম্পদ-জমির সবকিছুর মালিক ছিল। এজন্যই তারা ভূপতি ও নৃপতি অর্থাৎ ভূপাল ও নরপাল নামে পরিচিত। এদের লক্ষ্য ও দর্শন ছিল ক্ষমতায় টিকে থেকে সম্পদ আহরণ ও উপভোগ। আর এর জন্য তারা যুদ্ধাভিযান, বনবিহার, দুঃসাহসিক অভিযাত্রা করতেন। সামন্তরাজার কাছে নারী ছিল পণ্যতূল্য, নারী প্রেম ছিলনা, নারী-সম্ভোগ ছিল। তাই নারীরত্ন পাওয়ার

ও ভোগের জন্য তারা জীবনকে বাজি রেখে যুদ্ধ করতেন আবার, কখনো নিরুদ্দেশও হতেন। এই ছিল সামন্তপতিদের শ্রেণি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। রোমান্সের কবিগণ অনেকে এই সামন্ত প্রভুর পৃষ্ঠপোষকতায় জীবন ধারণ ও তাদের মনোরঞ্জনের জন্য কাব্য রচনা করতেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সেই সব রচনায় সামন্তশ্রেণির জীবনকাহিনি প্রতিবিম্বিত হয়। তাই রোমান্টিক কবিদের রচনায় সেই বাস্তব ধর্মী ও ভোগমুখী জীবনের ছায়া দেখা যায়। ধর্ম কথা থাকলেও তা রূপকার্থে আশ্রয় করত।

বাংলার মুসলমান কবিরা তাদের রোমান্স প্রণয়কাহিনি নির্মাণে সংস্কৃত সাহিত্যের অনুসারি হননি। তারা উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন আরব, ইরান, ফারসির লৌকিক, ঐতিহাসিক ও পৌরানিক কাহিনিকে। সুফি কবিরা তাঁদের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রকাশ ঘটাতে রোমান্স কাব্য রচনা করেন। আর তাঁরা রূপক হিসাবে মানব প্রেমকাহিনিকে আশ্রয় করেন। তাই সেকালে রাজা বাদশাহদের মধ্যে যে প্রেমকাহিনি প্রচলিত ছিল সুফি কবিরা তার নবনির্মাণ করলেন। সুফিদের ঐশী প্রেম চেতনার মূলে ছিল নর-নারীর শাশ্বত প্রেম। যে প্রেম ত্যাগ-তিতিক্ষা-সংগ্রাম-সাধনা ছাড়া প্রেমিককে পাওয়া যায় না, প্রেমের এই আদর্শই রোমান্স সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াল। আর এই প্রেমের মধ্যে রাগ-অনুরাগ, লোভ-ঈর্ষা, ভোগবাসনা, মিলন-বিরহ ইত্যাদির দেখা মিলল। যার মধ্য দিয়ে একদিকে সামন্তপতিদের ছবি আর অন্যদিকে সুফি ধর্ম ভাবনার মিশ্রণ ঘটল। তাই 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে বিদ্যা প্রেমের সঙ্গে কালীস্তুতির মিলন ঘটেছে। এই ভাবে বাংলার মুসলমান কবিরা আরব্য, পারস্য ও ভারতের সুফি কবিদের কাব্যের অনুবাদ অনুসরণ করে বাংলায় রোমান্স প্রণয়কাব্য ধারা সৃষ্টি করলেন। কিন্তু হিন্দু কবিদের এরূপ দুর্লভ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ছিল না। শ্রীচৈতন্যদেবের আধ্যাত্মিক প্রেম চেতনায় তা কিছুটা দেখা গেলেও, তা বৈষ্ণব পদাবলী ও জীবনী গ্রন্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রোমান্স কাব্যে মুসলমান কবিদের পদচারণা নিরঙ্কুশ থেকে যায়।

প্রায় সমগ্র মধ্যযুগ ধরেই এই রোমান্সধর্মী কাব্যের রচনাকালের পরিধি ব্যাপ্ত ছিল। সূচনা চতুর্দশ শতকে এবং পরিসমাপ্তি আঠারো শতকে। অর্থাৎ প্রায় ৫০০ বছর জুড়ে এই কাব্যের ধারা চলেছিল। চতুর্দশ শতকের শেষের দিকে অনেকের মতে পঞ্চদশ শতকের গোড়াতে শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যের হাত ধরে বাংলা রোমান্স কাব্যের পথচলা শুরু ও আঠারো শতকে মুসলমান শাসনের পরাজয় কাল পর্যন্ত এই ধারার অনেক কবি তাঁদের কাব্য রচনা করেছিলেন। নিচে একটি তালিকা দেওয়া হল –

কাব্য	কবি	রচনা কাল
ইউসুফ জোলেখা	শাহ মুহম্মদ সগীর	পনের শতক
লায়ালী-মজনু	দৌলত উজির বাহরাম খান	ষোড়শ শতক
মধুমালতী	মুহম্মদ কবীর	ষোড়শ শতক
হানিফা-কয়রাপরী	শাবিরিদ খান	ষোড়শ শতক
বিদ্যাসুন্দর	শাবিরিদ খান	ষোড়শ শতক
সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামান	দোনা গাজী চৌধুরী	ষোড়শ শতক
সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী	কাজী দৌলত	সপ্তদশ শতক
পদ্মাবতী	আলাওল	সপ্তদশ শতক
সপ্তপয়কর	আলাওল	সপ্তদশ শতক
চন্দ্রাবতী	কোরেশী মাগন ঠাকুর	সপ্তদশ শতক
লালমতি সয়ফুলমুলুক	আবদুল হাকিম	সপ্তদশ শতক

গুলে বকাওলী	নওয়াজিস খান	সপ্তদশ শতক
শাহজালাল-মধুমাল	মঙ্গলচাঁদ	সপ্তদশ শতক
জেবলমুলুক শামরোখ	সৈয়দ মহম্মদ আকবর	সপ্তদশ শতক
মৃগাবতী	মুহম্মদ মুকীম	অষ্টাদশ শতক
গদামল্লিকা	শেখ সাদী	অষ্টাদশ শতক

(ওয়াকিল আহমদ – *বাংলা রোমান্টিক প্রণোয়পাখ্যান*, পৃষ্ঠা. ১২)

তালিকায় উল্লিখিত বাংলা রোমান্স কাব্যগুলি অধিকাংশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দি-অবধী ভাষায় রচিত কাহিনি এবং ভারতের বাইরে মধ্য-প্রাচ্য আরবি ফারসি ভাষায় রচিত আরব্য-পারস্য কাহিনি অনুদিত হয়ে এসেছে। মুসলমান শাসক ভারতবর্ষে এলে প্রাচ্য আরব, পারস্য-এর সঙ্গে একটা যোগাযোগ সংগঠিত হয়েছিল। এই যোগাযোগ তিনটি কারণে ঘটতে পারে বলে গবেষকরা মনে করেছেন- মুসলমান শাসকদের সাম্রাজ্য বিস্তারের হাত ধরে, আরবের বাণিকেরা বাণিজ্য সম্পর্কের হাত ধরে, পীর পয়গম্বরদের ধর্মপ্রচার ও তীর্থ যাত্রার হাত ধরে। যেহেতু শাসক শ্রেণির ভাষা আরবি ও ফারসি ছিল তাই মুসলমান কবিরা আরব্য পারস্য কাহিনিকে আরবি ও ফারসি ভাষায় অনুদিত করতে লাগলেন।

একথা ঠিক যে, আক্রমণ (১২০৩-০৬)-এর পর থেকে দিল্লিকে কেন্দ্র করে চারিদিকের মুসলমান রাজ্যের শাসকেরা স্থায়ী ভাষাকে গুরুত্ব দিয়ে কবি-সাহিত্যিকদের কাব্যরচনার প্রেরণাদান করেছিলেন। বাংলাদেশের গৌড় তাদের মধ্যে অন্যতম। তুর্কি বিজয়ে দিল্লির সঙ্গে বাংলার যে সম্পর্ক স্থাপন হয়েছিল তা, মুঘল আমলে আরো দৃঢ়বদ্ধ হয়। আবার বাংলার রাজধানী রাজমহল (বর্তমান বিহারে) স্থানান্তরিত হওয়ার সূত্রেও বাংলার সঙ্গে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি হিন্দি ভাষাভাষী অঞ্চলের মানুষের সাথে মেলামেশা বৃদ্ধি পায়। ফলে বাঙালি মুসলমান কবিরা হিন্দি-অবধী কাব্য অনূদিত করতে থাকেন।

হিন্দি-অবধী ভাষায় রচিত যে রোমান্টিক কাব্য বাঙালি মুসলমান কবিদের প্রভাবিত করেছিল তার সূত্রপাত বোধহয় দ্বাদশ শতক থেকে। দ্বাদশ শতকের কবি আবদুল রহমানের ‘সন্দেশ বাসক’ (সংনেহয় রাসয়) হিন্দি অবধী ভাষায় রচিত কাব্যটিকে গবেষকরা রোমান্স কাব্যধারার প্রাচীন নিদর্শন হিসাবে ধরেছেন। কাব্যটির কাহিনি পরিকল্পনায় কালিদাসের সংস্কৃত কাব্য ‘মেঘদূতে’র ছায়াপাত আছে। ‘মেঘদূত’ কাব্যে মেঘের মাধ্যমে প্রেয়সীর নিকট যেমন সংবাদ পাঠায়, তেমনি ‘সন্দেশ রাসক’ কাব্যে এক বিরহিনী প্রথিকের মাধ্যমে পতির কাছে সংবাদ প্রেরণের কাহিনি আছে।

দ্বাদশ শতকেরই কবি চন্দ্র বরদাই বা চাঁদ কবির ‘পৃথিরাজ রাসউ’ (পৃথ্বীরাজ রাসৌ) হিন্দি অপভ্রংশ ভাষায় রচিত ঐতিহাসিক রোমান্স কাব্য। দিল্লির রাজা পৃথ্বীরাজ কনোজপতি জয়চন্দ্রের কন্যা সংযুক্তাকে জয়চন্দ্রের অমতে বিবাহ করে এবং জয়চন্দ্রের সঙ্গে পৃথ্বীরাজের যুদ্ধ হয়। এই কাহিনি নিয়ে কাব্যটি রচিত তার মধ্যে পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তার কাহিনি একেবারে রোমান্সে পরিপূর্ণ।

ত্রয়োদশ শতকের কবি আমীর খসরূ আর একটি ইতিহাস মিশ্রিত রোমান্স প্রণয় কাব্য – ‘খিজির খান ও দেবলরাণী’ কাব্যটি লেখেন। দিল্লির শাহজাদা খিজির খানের সাথে রাজপুত দুহিতা দেবলরানীর প্রেম নিয়ে এই কাব্যের কাহিনি গড়ে উঠেছে। চতুর্দশ শতকের কবি কুতবন ‘মৃগাবতী’ (১৫১২ খ্রিঃ) নামে আর একটি রোমান্স কাব্য রচনা করেন।

কাব্যে রাজা গনপতি দেবের পুত্র রাজা রূপমুরারির কন্যা মৃগাবতীর রূপে মুগ্ধ হয়ে বিবাহ হয়। এই রাজপুত্র ও মৃগাবতী প্রেম কাহিনি যথার্থ রোমান্স ধর্মী। পরবর্তী কালে জায়সীর 'পদ্মাবতী' (পাদুমাবত) কাব্যে-এর ছায়া লক্ষ করা যায়।

চতুর্দশ শতকের আর এক কবি মোল্লা দাউদ হিন্দি-অবধী ভাষায় একটি প্রণয় কাব্য 'চন্দায়ন' (১৪৩৯ খ্রিঃ) রচনা করেন। গৌড়ের রাজকন্য চন্দ্রানীর সঙ্গে এক বীর নপুংসকের বিবাহ হয়। পরে চন্দ্রানী লোর নামে এক সাহসী যুবকের সঙ্গে পালিয়ে যায় – এই কাহিনি নিয়ে রচিত কাব্যটি। যা পরবর্তীকালে সাধনের 'মৈনাসত' কাব্যে দেখা গেছে। আরো পরে সপ্তদশ শতকে কাজী দৌলতের 'ময়নাবতী ও লোরচন্দ্রী' কাব্যেও এর ছায়া দেখা যায়। বাংলার মুসলমান রোমান্টিক কবিরা শুধু হিন্দি-অবধী ভাষার কাব্য গুলিকে অনুসরণ করেনি আরবি ফারসি ভাষায় রচিত আরব্য পারস্য কাহিনিকেও অনুসরণ করেছেন।

আরব্য-পারস্য থেকে আগত বণিক, সৈনিক, রাজপুরুষ ও ধর্ম সাধকদের সঙ্গে ভারতবাসীদের মধ্যে যে যোগাযোগ স্থাপন হয়েছিল তারই হাত ধরে এদেশে আরব্য পারস্য কাহিনির অনুপ্রবেশ ঘটে। কাব্যের জগতে আরবি অপেক্ষা ফারসি ভাষা এদেশে অধিক বিস্তার লাভ করেছিল। পারস্যের প্রাকৃতিক পরিবেশ অত্যন্ত মনোরম ও সৌন্দর্যপূর্ণ। তাই ইউসুফ জোলেখা, লায়লী মজনু ইত্যাদি কাব্যের স্থান ও প্রাকৃতিক পরিবেশ বর্ণনায় পারস্য দেশ এসছে।

একাদশ শতকের কবি ফেরদৌসী 'ইউসুফ ওয়া জোলায়খা' কাব্যের হাত ধরে আরব্য-পারস্য কাহিনি ধারার সূত্রপাত হয়। এই কাব্য ফারসি ভাষায় লেখা, স্থান ও প্রাকৃতিক পরিবেশ বর্ণনায় কবি পারস্য দেশকে গ্রহণ করেছেন। পরবর্তীকালে পঞ্চদশ শতকের কবি আবদুর রহমান জামী এই কাব্যের সবচেয়ে বেশি খ্যাতি অর্জন করেন।

একাদশ-দ্বাদশ শতকে ইরানের প্রণয় কাহিনি নিয়ে ফারসি ভাষায় রচিত 'ওয়ায়েস ও রমিন' এবং 'ওয়ামিক ও আজরা' কাব্য। এই কাব্য প্রেমিক-প্রেমিকার নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা, দুঃসাহসিক প্রেমের ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রাধান্য পেয়েছে। যা পরবর্তী কালে বাংলা প্রেমের আদর্শ হিসাবে রোমান্টিক কাব্যে দেখা গেছে।

দ্বাদশ শতকের কবি নিজামী গঞ্জভী ফারসি ভাষায় লেখেন 'লায়লী-মজনু' (১১৮৮ খ্রিঃ)। দুটি নর-নারীর অতৃপ্ত প্রেমকাহিনি এতে স্থান পেয়েছে। লায়লীর প্রেমে মুগ্ধ যুবক কয়েস বিরহে উন্মাদ হয়ে 'মজনু' আখ্যা পায়। এই লায়লী-মজনু কাহিনি অবলম্বনে পরবর্তী কালে বাংলাতে রোমান্টিক প্রেম গাথা লেখা হয়েছে ও হচ্ছে।

লায়লী মজনুর মতো আর একটি বিষাদাত্মক প্রেম কাহিনি নিয়ে ১১৮০ খ্রিষ্টাব্দে নিজামী রচিত 'খসরূ শিরীন'। পারস্যের সম্রাট খসর সুন্দরী যুবতী শিরীন তাঁর প্রণয়াসম্পদ। কিন্তু এক পাথর খোদাইকারী যুবক ফরহান শিরীনের রূপে মুগ্ধ হয়। এই ফরহান শিরীনকে পাওয়ার জন্য পাথর কেটে সমুদ্রের জল আনে। কিন্তু তার কাছে শিরীনের মৃত্যু হয়েছে বলে মিথ্যা সংবাদ এলে সে পাহাড়ের খাদে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু বরণ করে। ত্রয়োদশ শতকে আমীর খসরূ দিল্লীতে বসে এই কাব্য লেখেন। এছাড়াও নিজামী 'হফত্ পয়কর' কাব্য লিখেছেন, যেখানে আধ্যাত্মিক রূপে প্রেমত্ত্ব প্রকাশ আছে। আবার জামীর 'সলমন ও অবসাল' নামে আর একটি প্রণয় কাব্যও লেখেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে গোটা মধ্যযুগ ধরে বাঙালি মুসলমান কবিরা যে রোমান্স প্রণয় কাব্য রচনা করছেন তা আরব্য-পারস্য বা হিন্দি-অবধী কাহিনি কাব্য থেকে কতটা গ্রহণ-বর্জন করেছেন সেটাও গবেষণার বিষয়। হিন্দু কবিদের যে রোমান্টিক প্রণয় কাব্য ছিল না তা বলা যায় না। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্' কাব্যে, তাছাড়া চণ্ডী দাসের পদাবলীতে ও বড়ু

চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে রোমান্সের ভাব-চেতনার প্রকাশ দেখা যায়। তবে বাংলার রোমান্স প্রণয় ধারা যাদের হাতে মসৃদ্ধ হয়ে ছিল তারা বাঙালি মুসলমান কবি একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই।

পঞ্চদশ শতকের কবি শাহ মুহম্মদ সগীর বাংলা ভাষায় লিখেছেন 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য। ড. এনামূল হক এই কাব্যটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও শ্রীকৃষ্ণবিজয়-এর মধ্যবর্তী সময়কালের রচিত হয় বলে মনে করেছেন। অর্থাৎ ১৪৮০ খ্রিঃ আগে রচিত। মূলকাহিনি বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের ৩৭ সংখ্যক জোশেফ কাহিনি এবং কোরাণের ১২ সংখ্যক সুরা-ইউসুফ কাহিনি থেকে গৃহিত হয়েছে। এই কাহিনিকে প্রথম ইরানি কবি ফিরদৌসী এবং পরে সুফি কবি জামী তাদের কাব্যে স্থান দেয়। ফিরদৌসীর হাতে প্রাচীন আখ্যান রোমাঞ্চকর রোমান্সে পরিণত হয় এবং জামীর হাতে Allegorical বা রূপক কাব্যে পরিণত হয়। কিন্তু শাহ মুহম্মদ সগীর মুসলমান সমাজে প্রচলিত রোমান্স কাহিনিকে নিজের প্রতিভায় ইউসুফ জোলেখা কাব্যকে নতুন রূপদান করেন। তিনি ধর্মীয় তত্ত্বকে কম প্রাধান্য দিয়ে জোলেখার প্রেমকে বড়ো করে দেখিয়েছেন। কাব্যের বিষয়টি একটু সংক্ষেপে তুলে ধরা হল –

রাজা তৈমুস-এর কন্যা জোলেখা অসাধারণ সুন্দরী। জোলেখা যৌবনে উপনীত হলে প্রথমবার স্বপ্নে এক রাজকুমারকে দেখে তার মনে প্রেম জাগে। এরপর সে স্বপ্নে মিশর রাজকুমার আজিজ-এর কথা জানতে পারে। পিতার মতে বিবাহ হলে জোলেখা দেখে তার স্বপ্নে দেখা রাজকুমার আজিজ নয়। এরপর জোলেখা মনোবেদনায় ভেঙে পড়ে। একদিন হঠাৎ স্বপ্নে দেখা ইউসুফের সঙ্গে জোলেখার দেখা হয়। পরে জোলেখা প্রেম নিবেদন করলে নবী ইউসুফ প্রত্যখ্যান করেন। এবং শেষ পর্যন্ত ইউসুফ জোলেখার রূপ-যৌবন ফিরিয়ে দিলে তাদের মিলন হয়। এখানেই দেখা যাচ্ছে বাইবেল ও কোরানের দুই চরিত্রকে অবলম্বন করে মুহম্মদ সগীর তাঁর কাব্যকে রক্ত মাংসের নর-নারীর প্রেম কাহিনি করে তুলেছেন। অসাধারণ ভাবে সগীর জোলেখার ইউসুফের সঙ্গে মিলন অভিসারকে নিপুণ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। জোলেখার বিরহকে অত্যান্ত মর্মস্পর্শী ভাবে বর্ণনা করেছেন। এই রোমান্টিক প্রণয় ধারা শুধু পঞ্চদশ শতকেই থেমে থাকেনি এই ধারা ষোড়শ শতকেও দেখা গেছে।

ষোড়শ শতকে রচিত চাটিগাঁয়ের কবি দৌলত উজির বাহরাম খান'এর 'লায়লী-মজনু'। আরব্য পারস্য লায়লা মজনু প্রচলিত কাহিনিকে বাহরাম খান বাংলায় নবনির্মাণ করেন। এই কাব্যে লায়লী ও মজনুর বিষাদাত্মক প্রেম কাহিনি স্থান পেয়েছে। আরব বাদশাহের পুত্র মজনু ও আহওয়াল সদাগরের সুন্দরী কন্যা লায়লি একই পাঠশালায় পড়তে গিয়ে তাদের মধ্যে প্রণয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু লায়লীর বাবা-মা মজনুর সঙ্গে বিবাহ দিতে রাজি হয় না মজনু পাগল বলে। এর পর মজনু বনে চলে যায়। একদিন লায়লীর সঙ্গে মজনুর দেখা হলেও, চিনতে না পেরে মজনু লায়লীকে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেয়। শেষ পর্যন্ত দুজনের মৃত্যু হয়। বাহরাম খান অসাধারণ কবিত্ব প্রতিভায় এই প্রেমকে রক্ত-মাংসের নর-নারীর প্রেম করে তুলেছেন। যা সারা বিশ্বে আজও অমর প্রেম গাঁথা হিসাবে পরিচিত।

ষোড়শ শতকের আর এক কবি মুহম্মদ কবীর রচনা করেন 'মধুমালতী' রোমান্টিক প্রণয়কাব্য। এটি হিন্দি-অবধী ভাষার কাহিনি 'মনোহর মালতী' উপাখ্যান থেকে নেওয়া হয়েছে। এটি একটি অসাধারণ রোমান্সধর্মী প্রেম কাব্য। বাংলা সাহিত্যে প্রথম মৌলিক প্রণয় কাহিনি লেখেন সাবিরিদ খান। তাঁর কাব্যটির নাম 'বিদ্যাসুন্দর'। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে সংস্কৃতিতে প্রচলিত বিদ্যাসুন্দর কাহিনিকে অবলম্বন করে সাবিরিদ খান তাঁর কাব্যটি রচনা করেন। এই কাব্যে কবি বিদ্যার সঙ্গে কালীর স্তুতিকে মিলিয়েছেন। সুকুমার সেন তাঁর *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (২য় খণ্ড) গ্রন্থে বলেছেন- "বাংলা সাহিত্যে

প্রথম প্রণয়কাহিনী কাব্য হচ্ছে বিদ্যাসুন্দর। যিনি লেখেন শাবিরিদ খান।" পরবর্তী কালে ভারতচন্দ্র এই কাব্য রচনা করেছিলেন।

ষোড়শ শতকের শেষের দিকে কবি দোনা গাজী চৌধুরী লিখেছেন 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল'। এটি একটি অসাধারণ প্রেম কাহিনি কাব্য। আরব্য প্রচলিত প্রেমকাহিনি নিয়ে এটি লেখা। মিশরের রাজপুত্র সয়ফুলমুলুক শাহকালের কন্যা অসাধারণ সুন্দরী বদিউজ্জামালের প্রেম নিয়ে মুসলিম জগতে পরিচিত কাহিনি নিয়েই এই কাব্য রচিত হয়েছে। এখানে সয়ফুলমুলুক আর বদিউজ্জামালের প্রেম কাহিনি বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। এই প্রণয় ধারা সপ্তদশ শতকেও অব্যাহত ছিল।

সপ্তদশ শতকের দুই বিখ্যাত আরাকান রাজসভার কবি নামে পরিচিত দৌলত কাজী ও আলাওলের আবির্ভাব হয়। দৌলত কাজী মিয়া সাধনের 'সৈনা-কোসৎ' কাব্যের কাহিনি অনুসরণে রচনা করেন 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী'। রোসাঙ্গ রাজসভার মন্ত্রী আসরফ খানের পৃষ্ঠ পোষকতায় তিনি কাব্যটি রচনা করেন। কাব্যে মানব জীবনভিত্তিক সম্ভোগ রস প্রাধান্য পেয়েছে। কাব্যে সতীময়নার আদর্শ প্রেমের ত্যাগ-তিতিক্ষা-ধৈর্য ও সংযমের চিত্র কবি অত্যান্ত নিপুণতার সঙ্গে এঁকেছেন। অন্যদিকে তেমনি বীর বামনের রূপবতী স্ত্রী চন্দ্রানীর রতি কামনার ছবিও এঁকেছেন। রাজা লোরের নারী লোলুপতা তৎকালীন সামন্তপ্রীতি স্বভাবকে কবি ব্যক্ত করেছেন। কাব্যে লোর–চন্দ্রনীর অসাধারণ রোমান্টিক প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়।

সপ্তদশ শতকে আর এক শ্রেষ্ঠ কবি আলাওল রচনা করেন 'পদ্মাবতী' নামে ঐতিহাসিক রোমান্টিক প্রেমকাহিনি কাব্য। কবি আলাওল জায়সীর 'পদুমাবৎ' কাব্যের অনুকরণে এই কাব্য রচনা করেন। অনুকরণ হলেও এই কাব্যে মৌলিকতার ছাপ স্পষ্ট। চিতরের রানা রত্নসেনের পত্নী অসাধারণ রূপসী পদ্মাবতী। আলাউদ্দিন পণ্ডিত রাঘবের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে পদ্মাবতীকে লাভ করতে চায়। আর তা নিয়ে রত্নসেন-আলাউদ্দিনের যুদ্ধে রত্নসেন মারা যায় । স্বামীর চিতায় পদ্মবতীও সহমরণে যায়। এর ঐতিহাসিক সত্যতা না থাকলেও জায়সীর মতো আধ্যাত্মিক তত্ত্ব তেমন ভাবে প্রকাশ ঘটেনি। আলাওল মানবী ভাবনা দিয়ে আধ্যাত্ম চেতনাকে মিলিয়ে দিয়েছেন এই কাব্য। এছাড়াও আলাওল আরব্য-পারস্য উপকথা অবলম্বনে রচনা করেন 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জমাল' রোমান্টিক প্রেম ও অ্যাডভেঞ্চারের মিশ্রণ আছে এতে।

সপ্তদশ শতকে রোমান্টিক প্রণয়কাহিনি রচিত কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোরেশী মাগন ঠাকুর। তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথমে আলাওলের পৃষ্ঠপোষক হিসাবেই পরিচিত। তিনি রোসাঙ্গ রাজসভার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর লেখা রোমান্টিক প্রণয়কাব্যটি হল 'চন্দ্রাবর্তী'। ভদ্রাবতী নগরে চন্দ্রসেন রাজার পুত্র বীরভান। বীরভান ও সঞ্জয় পুত্র সুতের দুই খুব ভালো বন্ধু ছিল। সরন্দ্বীপের রাজকন্যা চন্দ্রাবতী অসাধারণ সুন্দরী। বীরভান চন্দ্রাবতীকে লাভ করার জন্য বন্ধু সুতকে নিয়ে সমুদ্র অভিযানে যায়। অবশেষে বীরভান চন্দ্রাবতীকে লাভ করে বলে জানা যায়। মাগন ঠাকুর অন্যান্য কবিদের মতো নায়ক-নায়িকার মধ্যে মস্তিষ্ক বিকৃতি, উন্মত্ততার পরিচয় নাই। আছে উচ্চঙ্গে প্রিয়ার উদ্দেশ্যে প্রিয়ের বীর অভিযান। তিনি স্বতন্ত্র ভাবে চন্দ্রানীর প্রেমকে এই কাব্যে তুলে ধরেছেন। এই শতকের কবি আবদুল হাকিম লেখেন 'লালমতি সয়ফুলমুলুক' ও কবি নওয়াজিস খান লেখেন 'গুলে বকাওলী' কাব্য কাহিনি। এই দুটিই প্রেমের রোমান্টিকতা প্রকাশ আছে। এই শতকেই এই ধারা শেষ হয়নি তা অষ্টাদশ শতকেও কিছু কিছু এই ধারার কাব্য পাওয়া যায়।

অষ্টাদশ শতকের কবি মুহম্মদ মুকীম একটি রোমান্টিক প্রণয়কাব্য লিখে এই ধারাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। তাঁর কাব্যটির নাম 'মৃগাবতী'। হিন্দি-অবধী ভাষার কবি কুতবনের 'মৃগাবতী' কাহিনির ছায়াপাত ঘটেছে এই কাব্যে। কতুবনের

মতোই চন্দ্রগিরির রাজপুত্র ও কাঞ্চননগরের রাজকুমারী মৃগাবর্তীর রূপে মুগ্ধ হয়ে বিবাহ করে। রাজকুমার একদিন রাজধানীতে ফিরলে সেই সুযোগে মৃগাবতী তার বাবার রাজ্যে পালিয়ে আসে। পরে রাজকুমার যোগী বেশ ধরে মৃগাবতীকে সন্ধান করে। শেষে বহু দুর্গম পথ অতিক্রম করে রাজকুমারের সঙ্গে মৃগাবতীর মিলন হয় এবং রাজ্যে ফিরে আসে। মুহম্মদ মুকীম তাঁর কাব্যে অসাধারণ ভাবে রাজকুমারের ঐকান্তিক প্রেমকে ফুটিয়ে তুলেছেন। কুতুবনের ছায়া থাকলেও এই কাব্যে কবির স্বাতন্ত্রতা অনেকটাই রক্ষিত হয়েছে। এই শতকের আর এক কবি শেখ সাদী 'গদামল্লিকা' নামে একটি বাংলা রোমান্টিক প্রণয়কাব্য রচনাও করেন।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রণয় উপখ্যান গুলিকে রোমান্টিক বাক্য বলা চলে। কিন্তু মনে রাখতে হবে ১৭৯৮ খ্রিঃ ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজের 'লিরিক্যাল ব্যালাডস্' গ্রন্থের হাত ধরে ইউরোপের শিল্প সাহিত্যে যে রোমান্টিক আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল তার থেকে বিষয়গত দিকে থেকে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের রোমান্টিক কাব্যগুলি আলাদা। এগুলি ছিল আবেগ মিশ্রিত মধ্যযুগীয় রোমান্টিকতা। আর তাই এই কাব্যগুলিতে প্রেম আকুলতা, রূপ-তৃষ্ণা, সৌন্দর্য- পিপাসা, ঐশ্বর্যসুখ, ভোগাকাঙ্ক্ষা, দুঃসাহসিক অভিযান, অবাধ দেহমিলন ইত্যাদি বিষয়গুলি বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। মধ্যযুগের রোমান্টিক কাব্যগুলিতে কোথাও কোথাও অলৌকিকতাও প্রাধান্য পেয়েছে। আধুনিক যুগের রোমান্টিকতায় অলৌকিকতা আছে, কিন্তু সেখানে মনস্তত্বের আলো ফেলে তাকে বাস্তবকল্প করে তোলা হয়েছে। যা মধ্যযুগের কাব্যে দেখা যায় না। তাই মধ্যযুগের অলৌকিকতা বাস্তবের অতীত হয়ে দেখা দিয়েছে এই কাব্যগুলিতে।

মধ্যযুগের বাংলা রোমান্টিক কাব্যগুলির দিকে তাকিয়ে যে দিকগুলি উঠে এল তা হল –

১. মধ্যযুগের রোমান্টিক কাব্যগুলিতে সমসাময়িক জীবনকাহিনি নেই। অধিকাংশ কাহিনি ইতিহাসাশ্রিত। রোমান্টিক পটভূমির জন্য আরব্য-পারস্য মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশকে নেওয়া হয়েছে।

২. গঠনগত দিক থেকে এই কাব্যগুলিতে কয়েকটি সাধারণ বিষয় অনুসরণ করা হয়েছে নায়ক-নায়িকার জন্ম রহস্য, বাল্যশিক্ষা, প্রত্যক্ষ দর্শন, চিত্র দর্শন, স্বপ্ন দর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে নায়ক-নায়িকার পূর্বরাগ সঞ্চারণ এবং রূপ-তৃষ্ণার উন্মাদনা দেখানো হয়েছে।

৩. সতীত্ব থেকে পরকীয়া প্রেমের মধ্য দিয়ে কাব্যগুলিতে রোমান্টিকতার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে।

৪. গোপন প্রণয়ের চিত্ররূপে শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য পেয়েছে কাব্যগুলিতে। ছলনা-প্রলোভনের দ্বারা দেহ সম্ভোগের চেষ্টা, কামুকের শাস্তি বিধানও আছে কাব্যগুলিতে।

৫. প্রেমিকার সন্ধানে প্রেমিকের গৃহত্যাগ, দুর্গম পথযাত্রা, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করা, যুদ্ধ, দুঃখবরণ, বিপদবরণ, ইত্যাদি বিষয়গুলির মধ্য দিয়ে প্রেমের ঐকান্তিকতাকে পরিস্ফূট করেছেন এই ধারার কবিরা।

গ্রন্থপঞ্জী :

১) সুকুমার সেন, *ইসলামি বাংলা সাহিত্য*, ২য় সংখ্যা, কলিকাতা, ১৩৮০, পৃ. ২-৩ ।
২) ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দ, পৃ. ১০-২৭।
৩) আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ, 'বাংলা সাহিত্যে উপাখ্যান : গুলে বকাওলী' *সাহিত্য পত্রিকা*, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১২।
৪) সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (২য় খন্ড), ১৪২০ বঙ্গাব্দ; (একাদশ মুদ্রণ) পৃ. ২৮০-৩০৪।
৫) দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), *দৌলত কাজির লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না*, সাহিত্য সংসদ, ২০১৪ খ্রিঃ (সপ্তম মুদ্রণ), পৃ. ১১-৪৩।

৬) মমতাজুর রহমান তরফদার, *বাংলা রোমান্টিক কাব্যের আওয়াধী – হিন্দী পটভূমি*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশক, ২০০৯ খ্রিঃ (প্রথম প্রকাশ), পৃ. ৯-৩৭।
৭) ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৫৫ খ্রিঃ, পৃ. ২৫-১৬৬।
৮) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (তৃতীয় খন্ড: প্রথম পর্ব), মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লি, ২০১৩-২০১৪ খ্রিঃ, পৃ. ৪৩৯-৫১৭।

(মূল্যায়িত পত্র)

অপূর্ব সাহা : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র।

মধ্যবিত্তের সংকট : সন্তোষকুমার ঘোষের প্রথমপর্বের ছোটোগল্প

গল্পকার সন্তোষকুমার ঘোষের গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়কাল প্রকাশিত। এই অস্থির সময়ের মন্বন্তর, দেশভাগ, দাঙ্গা, উদ্বাস্তুসমস্যা ও যুদ্ধকেন্দ্রিক অস্থিরতা বাঙালি সমাজকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। সেই অবক্ষয়িত জীবন ও সমাজের রূপকারের কাহিনিমালা ফিরে পড়লেন **কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়।**

মধ্যম বিত্ত যার সাধারণত তাকেই মধ্যবিত্ত বলে। মধ্যবিত্ত জীবনে নানা সংকট নেমে আসে। সেই সংকটকে সাহিত্যিকরা তাদের গল্প-উপন্যাসের উপজীব্য করে তোলেন। সন্তোষকুমারও তার ব্যাতিক্রম নন। মধ্যবিত্ত জীবনের বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় সন্তোষকুমারের গল্পে পরিলক্ষিত হয়। তাঁর গল্পগুলিতে কলকাতাসহ অন্যান্য স্থানের ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্তজীবনের পরিচয় ফুটে উঠেছে। সন্তোষকুমার ঘোষের ছোটোগল্পে মধ্যবিত্তজীবনের সংকট যেভাবে চিত্রিত হয়েছে তা আমরা আলোচনা করতে পারি।

সন্তোষকুমারের গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালের সময়কাল প্রাধান্য পেয়েছে। এই সময়কাল ছিল অস্থির। মন্বন্তর, দেশভাগ, দাঙ্গা, বাস্তুসমস্যা, যুদ্ধকেন্দ্রিক অস্থিরতা বাঙালি সমাজকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। সেই সময়ের অবক্ষয়িত জীবন ও সমাজ সন্তোষকুমারের লেখনীতে প্রাধান্য পেয়েছে। আর এই অস্থির সময়ে মধ্যবিত্ত জীবনের মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, অর্থনৈতিক সংকট, দাম্পত্য জীবনের সংকট, প্রণয়জনিত সংকট, চাকরির জন্য হাহাকার প্রভৃতি বিষয় তাঁর রচিত ছোটোগল্পগুলিতে ফুটে উঠেছে। তবে অর্থনৈতিক সংকট যে মধ্যবিত্ত জীবনকে চরম সংকটের দিকে ঠেলে দেয় সেকথা আমরা তাঁর বহুগল্পেই পাই। সেইসঙ্গে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে লড়াই করে তা থেকে উত্তরণের ইঙ্গিতও গল্প গুলিতে আমরা পাই। ড. অলোক কুমার চক্রবর্তী তাঁর 'সন্তোষকুমার ঘোষ কথাসাহিত্যে স্বয়ং নায়ক' গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন-

> মধ্যবিত্ত জীবনের সমূহ বিপর্যয়ের মূল কারণ যে অর্থনৈতিক ভিতের পতন তা আমাদের চেনাতেও ভোলেননি। .... মধ্যবিত্তজীবনের সমূহ বিপর্যয়কে তুলে ধরে, বিপর্যয়ের মূল কারণকে চিহ্নিত করে শেষপর্যন্ত গল্পগুলিকে এমন এক জায়গায় লেখক পৌঁছে দেন যাতে গল্পগুলি অর্জন করে কালাতিক্রমী শক্তি।[১]

'কানাকড়ি' গল্পটি সন্তোষকুমার ঘোষের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। অর্থনৈতিক সংকট মানবিক মূল্যবোধকে কেমন ভেঙেচুরে তচনছ করে দেয় তার পরিচয় আছে গল্পটিতে। সরকারি চাকুরে মন্মথ- সাবিত্রী ও মিনুর সুখের সংসার। পাশের বাড়ির মল্লিকার বাড়িতে অনেক পুরুষ মানুষই আনাগোনা করে। হঠাৎ করে চাকরি চলে যায় মন্মথর। সেই অর্থনৈতিক সংকট থেকে মুক্তির জন্য নানারকম উপায় খোঁজে মন্মথ কিন্তু ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যে মল্লিকা সাবিত্রীকে সিনেমাতে নামার প্রস্তাব দেয়। সাবিত্রী চরম অর্থনৈতিক সংকট থেকে মুক্তি পেতে শশাঙ্কর সঙ্গে সিনেমা দেখতে যায়। শশাঙ্কর কাছে সিনেমাতে নামার প্রস্তাব তোলে। কিন্তু শশাঙ্ক তাতে রাজি হয় না। ভুল ভাঙে সাবিত্রীর –

> ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একটানা কেঁদেই চলেছে সাবিত্রী, কী করে বোঝাবে কোথায় কাঁটা। এতদিন নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল শশাঙ্কর কাছে অন্তত ওর শরীরটার মূল্য আছে, আর মন্মথর কাছে ভেতরের মানুষটার। মল্লিকাকে কেন, কাউকে কোনওদিন বলা যাবে না, কত বড় দুটো ভুল আজ একদিনে ভেঙে গেছে।[২]

বীরেন্দ্র দত্ত তাঁর সন্তোষকুমার ঘোষ : এক ব্যতিক্রমী কথাকার গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন,

> অর্থনীতির অসাম্য মধ্যবিত্ত আদর্শকে, নীতিকে ক্রমশ নড়বড়ে করে দেয়।.... মধ্যবিত্ত মানুষের এমন পতনের প্রতীক প্রতিম চিত্রের অনবদ্যতা গল্পটির শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম দিক।[৩]

'পনেরো টাকার বউ' গল্পে গৌরাঙ্গ চাকরি ছেড়ে দিলে সংসারে সংকট নেমে আসে। ফলে 'কৃষ্ণধাম'-এর চল্লিশ টাকার ফ্ল্যাটের ভাড়া থেকে পনেরো টাকার ভাড়ার বস্তিতে আসে মণিমালারা। অর্থনৈতিক সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। ক্ষুধার্ত পুত্র টুটুলকে খাবারও দিতে পারে না। বিক্রি হয়ে যায় মণিমালার সব গয়না। অন্যদিকে ছোটগল্পকার 'কৃষ্ণধাম' এর স্বচ্ছল গৃহবধুদের স্বচ্ছলতাকে তুলে ধরে গল্পরসকে জমিয়ে তোলেন। গৃহবধূদের অলংকারের আস্ফালন মধ্য বিত্তসূলভ –

> "আপনার হারটা তো নতুন দিদি?"
>
> বুকের কাপড় টানতে গিয়ে ষাট টাকার দিদি আরও সরিয়ে দেন, হারটা যাতে সকলের নজরে পড়ে।"[৪]

গহনা প্রদর্শনের এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারে না মনিমালা, অপমানিত হয় সে। কিন্তু এ অপমান তো তার প্রাপ্য ছিল না। মনে মনে ভাবে –

> কীসে ছোট যে ওদের চেয়ে, লেকাপড়ায় রূপে, গুনে- কীসে। শুধু অক্ষম, অবিবেচক একটা অমানুষের হাতে পড়েই চিরকাল তাকে আঁচল ভরে করুনা আর উপেক্ষা কুড়িয়ে যেতে হবে।[৫]

মনে মনে ইর্ষান্বিত হয় সে। অর্থনৈতিক সংকট মণিমালাকে সুখী করেনি। পক্ষান্তরে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে 'কৃষ্ণধাম' এর গৃহবধুরা সুখী। সে প্রতিহিংসাপরায়ন হয়ে ওঠে সে। চিঠি লেখে প্রফেসরকে। তাঁর দূর সম্পর্কের ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর প্রণয়জনিত সম্পর্কের কথা জানিয়ে ঘর ভেঙে দেয়। আশি টাকার দিদির এই বিপদে তৃপ্ত হন ষাট টাকার দিদি। কিন্তু এই সুখ ক্ষণস্থায়ী হয়। কারণ তার মেয়ের বিয়ে ভাঙিয়ে দিতে উদ্যত হয় মণিমালা। বস্তিতে ছুটে আসে ষাট টাকার দিদি ও তার মেয়ে সুস্মিতা। খুশি হয় মণিমালা। কারণ এতদিন তাঁকে যারা অবজ্ঞা করেছে তারাই আজ তাঁর কৃপাপ্রার্থী। সেই সঙ্গে ভবিষ্যৎ অর্থাগমের সম্ভাবনাও তৈরি হয়ে যায়।

'একমের' গল্পেও আছে মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনসংকটের চিত্র। অনন্ত চক্রবর্তী পেশায় মোক্তার। ডাক্তারের কাছে সে আসে তার গর্ভবতী স্ত্রীর গর্ভপাত করানোর জন্য। প্রথমে আপত্তি জানালেও পরে রাজি হয় ডাক্তার বাবু। সাত ছেলে ও তিন মেয়ের জননীকে দেখে করুনা হয় ডাক্তারবাবুর। তাঁর ওষুধে কাজ হয়। অনন্ত মোক্তারকে সাবধানে থাকার পরামর্শ দেন ডাক্তারবাবু। দুই মাস পর একই সমস্যা নিয়ে ডাক্তারবাবুর কাছে আসে অনন্ত চক্রবর্তী। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওষুধ দেন তিনি। কিছুদিন এর একই ভুল করে অনন্ত মোক্তার। মরণাপন্ন হয় তার স্ত্রী। কোনোরকমে বাঁচিয়ে তোলেন ডাক্তারবাবু। ডাক্তারবাবুর ধমক খাওয়ার আগেই নিজ কৃতকর্মের পক্ষে যুক্তি দেয় অনন্ত মোক্তার –

> আপনাদের কত কী খেয়াল আছে ডাক্তারবাবু। গান জলসা, মাঝে মাঝে শখের থিয়েটার। কলকাতা থেকে বই আনিয়ে নেন, প্রতি মাসে বাছাই করা তিন চার খানা নতুন রেকর্ড। আর ওর কথা ভাবুন একবার। একখানা ভাল শাড়ি পরে না, শহরে সিনেমা এলে দেখে না।[৬]

অর্থনৈতিক সংকটের জন্য মনোরঞ্জনের সমস্ত ক্ষেত্র থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয় অনন্ত মোক্তার ও তার স্ত্রী। যৌনমিলনের মধ্যেই তারা আনন্দলাভকে সীমাবদ্ধ রাখে।

বাঙালি মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চিত্র ফুটে উঠেছে 'শনি' গল্পে। নদেরচাঁদ বাই লেনের পতিতা মাতঙ্গ শেষ বয়সে পতিতা বৃত্তি ছেড়ে দাসী বৃত্তি অবলম্বন করে। কিন্তু মনে মনে স্থির করে যমুনাকে পতিতা পল্লী থেকে উদ্ধার সে করবেই। বিয়ে দেবে তার। কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের প্রবীন সমাজ সংস্কারক গিরিজাবাবু এই কাজে সাহায্য করেন। যমুনার স্থান হয় সমিতি পরিচালিত আশ্রমে। 'মফস্বল থেকে এসেছে, দুর্বত্তদের হাতে নিগৃহীতা, স্বজন পরিত্যক্ত কুমারী, এই ধরনের একটা বিশ্বাস্য গল্প' ফাঁদা হয়। বিয়ে হয়ে যায় মফসসলের বিপত্নীক ডাক্তার নরেশের সঙ্গে। সুখী দাম্পত্যজীবনে আবির্ভাব ঘটে গঙ্গাধরের। অর্থের বিনিময়ে ডায়ানা থিয়েটারের মালিকের কাছে সে বেচে দিতে চায় যমুনাকে। যমুনার পূর্বজীবনের কথা সে জানায় নরেশকে। সবকিছু জেনেও যমুনাকে তাড়িয়ে দেয় না নরেশ। সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় সে আগেই দিয়েছিল। সেই উদারতাকে আরও প্রসারিত করে সে। যমুনা ভাবে,

> নরেশ বড়, নরেশ উঁচু, নরেশ মহৎ সে জানত, কিন্তু সে সহত্ব যে এমন অভ্রস্পর্শী তা কখনও অনুমান করতেও পারেনি।[৭]

কিছুদিন পরে মৃত্যু হয় নরেশের। প্রকৃত রহস্য উন্মোচিত হয় তার পরেই। নরেশকে যমুনা দেবতা জ্ঞান করত। কিন্তু অর্থের লোভেই যে যমুনাকে সে বিয়ে করেছিল তা জানতে পারে যমুনা। যমুনার পূর্বজীবনের বৃত্তান্ত শুনে উপরি পাওনা দাবির ঘটনাও শোনে যমুনা। অর্থের লোভে মূল্যবোধকে বিসর্জন দেয় নরেশ। কোনও পার্থক্য থাকে না নরেশ ও গঙ্গাধরের মধ্যে – "হালকা চোখে নরেশের ছবি আর গঙ্গাধরের মুখ একাকার হয়ে গেছে।"[৮]

মধ্যবিত্তের মূল্যবোধ যে, চিনেমাটির মতোই ভঙ্গুর তার চিত্র পাওয়া 'চিনেমাটি' গল্পটিতে। মা মারা গেলে এবং বাবা নিরুদ্দেশ হলে কুঞ্জ একা হয়ে যায়। কাজের সন্ধানে কলকাতায় আসে সে। গ্রামসম্পর্কের দিদি বকুল ও প্রাণকৃষ্ণর বস্তির বাড়িতে ও ঠেসে বকুলকে দেখে কষ্ট হয় কুঞ্চর। শুধু বকুলদি নয়, ললিতাদি, নিলুদিদের দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয় তাঁর –

> স্বামীর জন্য রান্না করে, জামা রিপু করে, একসঙ্গে শোয়, বছর বছর বিয়োয়, কিন্তু তবু কোথায় যেন একটা অস্বাচ্ছন্দ্যের পরদা দুলতে থাকে। একই সুখ, একই দুঃখের শরিক দুজনে তবু দু'জন যেন সমান নয়। একে প্রভু অপরে দাসী।[৯]

কিছুদিন পর প্রাণকৃষ্ণের চাকরি চলে যায়। আর্থিক সংকট থেকে বাঁচতে নিরুপমা পারফিউমরারির অর্গানাইজার সুবোধ চক্কোত্তির কাছে নিজের স্ত্রীকে সঁপে দেয় প্রাণকৃষ্ণ। প্রথমে রাজি না হলেও পরে সুবোধ চক্কোত্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে বকুল। বকুলের চরিত্রের এই পরিবর্তন মেনে নিতে পারে না কুঞ্জ বকুলদির আসনে মেমসাহেব ইন্দ্রানীকে বসায় কুঞ্জ। ইন্দ্রানীর ব্যাক্তিত্বে মুগ্ধ হয় সে। কিন্তু এই মুগ্ধতাও স্থায়ী হয় না। ইন্দ্রানীর স্বামী চৌধুরী সাহেব শেয়ারের খেলায় ফকির হয়ে যান। আর্থিক সংকট থেকে বাঁচতে প্রডিওসার ছবিলালের কাছে আত্মসমর্পণ করে ইন্দ্রানী। বকুলদির মতো ইন্দ্রনীও হয়ে যায় একই পথের পথিক। আর্থিক সংকট মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটায়।

'অমিত্রাক্ষর' গল্পটি মধ্যবিত্ত জীবনে দাম্পত্যসংকটের গল্প। গল্পটিতে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চিত্র ও আছে। শিশিরেন্দু যে বাড়িতে ভাড়া থাকত সেই একই বাড়িতে ভাড়া থাকত সীতা ও তার বাবা-মা। শিশিরেন্দু সুপুরুষ। সেই সঙ্গে সে অর্থবানও। একরম একজন পাত্র যে কোনও কন্যাদায়গ্রস্থ পিতামাতার কাছে আকর্ষনীয়। সীতার মা-ও তার ব্যতিক্রম নয়। অর্থনীতির মানদণ্ডে শিশিরেন্দুর সঙ্গে সীতা বেমানান। তাদের মধ্যে প্রণয়জনিত কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু সীতার মা সীতার ভবিষ্যতের কথা ভেবে অন্য পথ বেছে নেয়। মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে নিজেদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে কলঙ্কিত করে শিশিরেন্দুকে। সীতাকে বিয়ে করতে বাধ্য হয় শিশিরেন্দু। কিন্তু এ বিয়ে সুখের হয় না। ফুলশয্যার রাতে সীতার সহজ আত্মসমর্পন শিশিরেন্দুর মনে সন্দেহের বীজ বপন করে। সীতার হিমশীতল ব্যবহারে সীতার জীবনে অন্য কারো অস্তিত্ব কল্পনা করে শিশিরেন্দু। আর তাই বলে – "কে সে, কে সে সীতা, তাঁর নাম আমাকে বলতেই হবে

তোমাকে।"[১০] অস্বীকার করে সীতা, কারণ সত্য সত্যই তাঁর জীবনে কেউ কোনও দিন ছিলই না। কিন্তু একথা বিশ্বাস করে না শিশিরেন্দু। ভাঙা ভাঙা গলায় বলে- "তবে কেন আমাকে তুমি কিছু দিতে পারলে না। কিংবা সব দিয়েও এমন কিছু রেখে দিলে যাতে আমি নিজেকে আইন-আদালতের পৃষ্ঠায় আসামি ছাড়া কিছু ভাবতে পারিনি।"[১১] কিন্তু শিশিরেন্দুর সঙ্গে সীতার একান্ত না হওয়ার পিছনে দায়ী ছিল মানসিক অন্তরায়। সীতা যে শিশিরেন্দুর যোগ্য নয়- একথাই যেন সীতা মনে মনে সবসময় ভাবে – "শিশিরেন্দু যদি রূপে, গুণে, ঐশ্চর্যে, মর্যাদায় তার চেয়ে এত বেশি বড় না হত, তবে, হয়তো তাকে ভালোবাসতে পারত সীতা, সর্বস্ব দিতে পারত।"[১২] মানসিকতার ব্যবধানই দুজনকে পৃথক করে রাখে। একই সংসারের মধ্যে থেকেও তারা হয়ে যায় অমিত্রাক্ষর।

মধ্যবিত্ত জীবনের দাম্পত্যসংকটের চিত্র ফুটে উঠেছে 'সমান্তর' গল্পে। স্বামী ও স্ত্রী ভিন্নরুচির। ভিন্ন সংস্কৃতিমনস্ক তারা। গল্পের নায়িকা উর্মিলা ছোটবেলা থেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। বাড়িতে ইংরেজিতে তারা কথাবার্তা বলত। এই বিজাতীয় আবহাওয়ার মধ্যে একমাত্র ব্যাতিক্রম ছিলেন ঠাকুমা। সাবেকি নিষ্ঠার প্রতীক ঠাকুরঘর নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন তিনি। উগ্র বিলিতিয়ানার সমর্থক হয়েও উর্মিলার বাবা তাঁকে বিয়ে দেন এক স্বদেশি হিন্দুমনস্ক পাত্রের সঙ্গে। বনিবনা হয় না তাঁদের। উর্মিলা ফিরে আসে বাপের বাড়িতে। 'অতীতকে মুছে দিয়ে বর্তমানের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক রচনা করতে চাইলেও তা আর হয়ে ওঠে না। উর্মিলা নিজেকে পরিবর্তন করতে থাকে। স্বামীর উপযুক্ত হতে চেষ্টা করে। 'খাঁটি জিনিস ছেড়ে' সে যে মিথ্যার পিছনে ছুটেছে একথাও ঠাকুমার কাছ থেকে শুনতে হয় তাঁকে। 'সাদা খদ্দরের লালপেড়ে শাড়ি পরে ও 'কপালে বড় করে সিঁদুরের ফোঁটা এঁকে' ফিরে আসে সে স্বামীর কাছে। কিন্তু স্বামীর রুচি পরিবর্তনে অবাক হয় উর্মিলা। সময়ের সঙ্গে চলতে গিয়ে নিজের আদর্শ থেকে বিচ্যুতি ঘটে তার স্বামীর। মূল্যবোধেরও অবক্ষয় ঘটে। দুজনেই নিজেদের রুচি পরিবর্তন করায় বিরোধের সমাপ্তি হয় না।

'কাটা সৈনিক' গল্পটিতে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রতিহিংসাপরায়নতা পরিলক্ষিত হয় যা মধ্যবিত্ত সুলভ। অভিনেত্রী ইন্দুলতা গল্পকথককে নিজের জীবনের ঘটনা বলে। ইন্দুলতার বিয়ে হয় নামকরা ডাক্তার ও গবেষক নির্মল চতুর্বেদীর সঙ্গে। স্বামী-স্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতার ব্যবধান দুজনের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়। নির্মল চতুর্বেদীর স্ত্রী হবার যোগ্য ছিল তাঁরই সহকর্মী কিঙ্কিনী। কিন্তু সন্তান প্রসবের অক্ষমতার জন্য তাঁর সঙ্গে বিয়ে হয় না নির্মল চতুর্বেদীর। কিঙ্কিনী দূরত্ব বাড়িয়ে দেয় নির্মল ও ইন্দুলতার মধ্যে। বিষ দিয়ে ইন্দুলতার গর্ভস্থ সন্তানকে নষ্ট করে। স্বামীর সাহচর্য থেকেও বঞ্চিত হয় ইন্দুলতা। ফিরে আসে বাপের বাড়িতে। স্বামীর প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ন হয়ে নিজের পথ সে নিজেই ঠিক করে নেয়। সেই সময়ে যা নিন্দনীয় সেই অভিনেত্রীর পথ বেছে নেয় সে। প্রথিতযশা স্বামীকে উচিৎ শিক্ষা দেবার জন্য ইন্দুলতা তার স্বামীর পদবী ব্যবহার করে- "আমার অভিনীত নাটকের সমালোচনা কাগজে কাগজে ছাপা হয়েছিল সেই সঙ্গে ছবি। আমার পরিচয় দিয়ে সবাই লিখেছিল, ইনি বিশিষ্ট ভদ্র কুলবধু, বিজ্ঞানব্রতী ডা. চতুর্বেদীর সহধার্মিনী"।[১৩] উল্লসিত হয় ইন্দুলতা। কিন্তু এই উল্লাস দীর্ঘস্থায়ী হয় না। অভিনয় জগৎ থেকে ধীরে ধীরে নাম মুছে যায় ইন্দুলতার। অথচ ড. চতুর্বেদী একটার পর একটা গৌরবের সিঁড়ি টপকে যান। স্বামীকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা ব্যর্থ হয় ইন্দুলতার। আক্ষেপও করে সে –

> কিন্তু সব মিথ্যে হয়ে গেছে, অনুপমবাবু। আমি সারাজীবন মাইনর রোলের ফাঁকে হাবুডুবু খেয়েছি, উনি একটার পর একটা গৌরবের সিঁড়ি টপকে গেছেন। আমাকে তো কারোর মনেও নেই। আজও শোক সংবাদে দেখুন, সবাই ওঁর সাধনা, কৃতিত্ব, অধ্যাবসায়ের কথা লিখেছে, বারবার এসেছে কিঙ্কিনীর নাম, আমি যে, আমি, কোনও দিন ছিলুম, সে কথাটাও কেউ উল্লেখ করেনি। ওঁকে আমার কলঙ্কের ভাগ দিতে পারলুম কই পরিমলবাবু।[১৪]

'যাদুঘর' গল্পে বাঙালি মধ্যবিত্তজীবনের প্রণয়জনিত সংকট ফুটে উঠেছে। সেই সঙ্গে বাঙালি মধ্যবিত্ত পুরুষের পলায়নী মানসিকতাও গল্পটিতে পরিলক্ষিত হয়। হাওয়া বদল করতে অনন্ত বারাণসীতে অন্নপূর্না আশ্রমে এসে উপস্থিত হয়। পশুপতি মজুমদারের কাছ থেকে অন্নপূর্ণা হোটেলের মালিক জগদিন্দু গাঙ্গুলি ও তাঁর একদা প্রেমিকা সুরমা সম্পর্কে

অনেক কিছু জানতে পারে। কুড়ি বছর আগে স্বামীকে ছেড়ে জগদিন্দুর সঙ্গে বারাণসীতে পালিয়ে আসে সুরমা। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মোহভঙ্গ হয় তাঁর। জগদিন্দুকে খাবারে বিষ মিশিয়ে সে মেরে ফেলতে উদ্যোগী হয়। এর কারণ পশুপতির মধ্য দিয়ে লেখক ব্যক্ত করেন – "স্ত্রী চরিত্র মশায়, এমনি ভালোবাসার লোকের জন্যে প্রাণ দিতে পারে। আবার সে ভালোবাসা ছুটলে প্রাণ নিতেও পারে।"[১৬] যমে মানুষে টানাটানি চলে। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যায় জগদিন্দু। সুরমার প্রতি বিশ্বাস চলে যায় তাঁর। সুরমাকে কলকাতার তাঁর স্বামীর কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার হুমকি দেয় জগদিন্দু। সুরমার এই কাজের জন্য অদ্ভুত প্রতিশোধ নেয় সে। খাবারের আগে পোষা বিড়ালকে খাবার খাইয়ে সে পরীক্ষা করে নেয় তাতে কোনও বিষ মেশানো আছে কিনা। একদা প্রেমিকা সুরমার প্রতি কোনও বিশ্বাস থাকে না জগদিন্দুর – "আজ বিশ বছর ধরে দুটো মানুষ এক ছাতার নীচে বাস করছে, অথচ একফোঁটা ভালোবাসা নেই, বিশ্বাস নেই। শুধু একের অপরের ওপর অপরিসীম ঘৃনা।"[১৬] সেই সঙ্গে সুরমার অর্থ হস্তগত করে সে। তাঁকে কাজের লোকে পরিণত করে জগদিন্দু। এছাড়াও খদ্দের ধরে রাখার জন্য তাদের সঙ্গে সুরমার রাত্রিবাসকেও প্রশ্রয় দেয় জগদিন্দু।

'যাদুঘর' গল্পে মধ্যবিত্ত বাঙালি পুরুষদের পলায়নী মনোবৃত্তিকেও লেখক তুলে ধরেছেন। রিসার্চ ফেলো নীলাম্বুজ মিত্র', পলিটিক্যাল আসামী সুধন্য রায় এবং অনন্ত সকলেই সুরমাকে এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দেবার কথা বলে। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি পূরণ কেউ করে না। মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে অভ্যস্ত সুরমা প্রেমিকদের দেওয়া প্রতিশ্রুতির নমুনাগুলি সংরক্ষণ করে রাখে- "ফটো আর চিরকুট, ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি, দশ পনেরো বছর ধরে এখানে একভাবে চাপা পড়ে আছে। পাশাপাশি দুটি কবর। অনন্তর কার্ডখানাও ওদের পাশে শুইয়ে দিল সুরমা। আরও একটি।"[১৭] ড. অলোক চক্রবর্তী তাঁর "সন্তোষকুমার ঘোষ কথাসাহিত্যে স্বয়ং নায়ক "গ্রন্থে 'যাদুঘর' গল্পের নামকরণ খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন- "পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের যেমন যাদুঘরে স্থান হয় সেরকমই স্থান পেয়েছে প্রেমিকদের দেওয়া প্রতিশ্রুতির নমুনাগুলি। আমরা আরো একটু এগিয়ে, বলতে পারি, প্রেমিকের প্রতিশ্রুতির নমুনা নয়, 'প্রেম' নামক সম্পর্কটিই যে মানব-ইতিহাসের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন, যাদুঘরের সামগ্রী এ তাৎপর্যকেই লেখক রূপ দিতে চেয়েছেন গল্পটিতে।"[১৮]

সন্তোষকুমার ঘোষের 'গিল্টি' গল্পেও আছে বাঙালি মধ্যবিত্তের প্রণয়জনিত সংকটের চিত্র। সলিল সীতাকে এক সময় ভালো বাসতো। তাই স্টীমার কোম্পানির চাকুরে সলিল নানা অজুহাতে সীতার কাছে আসতো। কিছুদিন পর চাকরি যায় সলিলের। আর্থিক সংকট নেমে আসে তাঁর। আর্থিক সংকট নেমে আসে সীতাদের পরিবারেও। স্কুল উঠে যায় সীতার বাবার। সীতা সলিলকে চাকরি খুঁজে দেওয়ার কথা বলে। সলিল সীতাকে দেহ-ব্যবসার কথা বলে। সীতা প্রথমদিকে রাজি না হলেও পরে মেনে নেয়। এই যৌথ ব্যবসাতে ঠকাতে চায় দুজন দুজনকে। সলিল যখন সীতাকে বলে আগাম নেওয়া টাকা জাল তখন সীতাও জানায় আগরওয়ালার কাছে পাওয়া ইয়ারিং গিল্টি। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না। তাই গল্পের শেষে লেখকের খেদোক্তি –

> দুলটা খাঁটি, গিল্টি দুই-ই হতে পারে, 'নোটটা আসল বা জাল' গল্পের শেষটাও অজানা রয়ে গেছে, তবে দূর থেকে আশা করছি ওদের বিচিত্র যৌথ চুক্তির পরমায়ু বেশি দীর্ঘ হয়নি। যেখানে দুই অংশীদারের মধ্যে এত সন্দেহ আর অবিশ্বাস, সেখানে হয় না।[১৯]

সন্তোষকুমার ঘোষের গল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের পরিচয় বিদ্যমান। নানা চরিত্র, নানা ধরনের ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে গল্পগুলিতে। মধ্যবিত্তজীবনের সংকটকে শুধুমাত্র উল্লেখই করেননি গল্পগুলিতে। সেইসঙ্গে মধ্যবিত্ত চরিত্র ও ঘটনার বিশ্লেষণ গল্পগুলিকে এক অন্য মাত্রা দিয়েছে। গল্পগুলির বিষয় উপস্থাপনা ও রীতি নির্ণয়ে সন্তোষকুমার অনবদ্য। মধ্যবিত্ত জীবনের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়কে তুলে ধরে গল্পগুলিকে আকর্ষনীয় করে গড়ে তুলেছেন। তার গল্পগুলি বুদ্ধিদীপ্ত। আর সেই সূত্রেই সন্তোষকুমার স্বতন্ত্র পথের পথিক। মধ্যবিত্তজীবনের সংকট রচনাতেও তিনি হয়ে ওঠেন তুলনারহিত।

তথ্যসূত্র :

১) চক্রবর্তী, অলোক- "সন্তোষকুমার ঘোষ কথাসাহিত্যে স্বয়ং নায়ক," আশাদীপ, কোলকাতা, ২০১৮, পৃ-১৬৬।
২) ঘো্ সন্তোষ কুমার 'সন্তোষকুমার ঘোষ গল্পসমগ্র'- আনন্দ, কোলকাতা, ২০১৬ পৃ-২১।
৩) দত্ত, বীরেন্দ্র– "সন্তোষকুমার ঘোষ : এক ব্যতিক্রমী কথাকার"- পুস্তকবিপণি, কোলকাতা, ২০০১, পৃ-৫৭।
৪) ঘোষ, সন্তোষকুমার-'সন্তোষকুমার ঘোষ গল্পসমগ্র' আনন্দ, কোলকাতা, ২০১৬ পৃ-৩৭০।
৫) ঐ, পৃ-৩।
৬) ঐ, পৃ-৫৪।
৭) ঐ, পৃ-৬৭।
৮) ঐ, পৃ-৭১।
৯) ঐ, পৃ-১৬৬।
১০) ঐ, পৃ-৪৫১।
১১) ঐ, পৃ-৪৫৬।
১২) ঐ, পৃ-৪৫৬।
১৩) ঐ, পৃ-২৪৩।
১৪) ঐ, পৃ-২৪৩।
১৫) ঐ, পৃ-১০০।
১৬) ঐ, পৃ-১০২।
১৭) ঐ, পৃ-১১০।
১৮) চক্রবর্তী, অলোক- "সন্তোষকুমার ঘোষ কথাসাহিত্য স্বয়ং, নায়ক', আশাদীপ, কোলকাতা, ২০১৮, পৃ-১৭১।
১৯) ঘো্ সন্তোষকুমার-'সন্তোষকুমার ঘোষ গল্পসমগ্র' আনন্দ, কোলকাতা, ২০১৬ পৃ-৫৩২।

ড. কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্ব বর্ধমানের মেমারি কলেজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সহকারী অধ্যাপক।

শঙ্খ ঘোষের কবিতায় শৈশব স্মৃতি মেদুরতা

‘স্মৃতির চেয়েও কোনো বাস্তবিক বাস্তুভূমি নেই।’

দেশভাগের স্মৃতি থেকে ফেলে আসা সময়ের আখ্যান।
কবির অবসর আর তাঁর কাব্যচেতনা তাঁকে বারবার পৌঁছে দিয়েছে
শৈশবের কাছে, বাংলাদেশের মাটির শীতল অনুভূতির কাছে।
সেই কথার খোঁজে শঙ্খ ঘোষের কবিতাগুলি নতুন করে পড়লেন **বিশ্বজিৎ রায়**।

কবি শঙ্খ ঘোষের জন্ম ১৯৩২ এর ৫ ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর গ্রামে মাতুলালয়ে। পৈতৃক বাসস্থান বরিশাল জেলার বাণরিপাড়া গ্রামে। কবির শৈশব সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলাদেশের জল-মাটি-আবহাওয়ার মাঝে এবং অবশ্যই একান্নবর্তী পরিবারের সুশৃঙ্খল পরিবেশে। ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত কবির বাবার স্কুল সংলগ্ন বাড়িটিই ছিল কবিদের পরম আশ্রয়। সেখানেই ছিল তাঁর শৈশবের আত্মিক সম্বন্ধ। ১৯৪৬-এর পর এপার বাংলার দাঙ্গার আগুন স্পর্শ করল ওপার বাংলার ঘরে ঘরে। মুসলিম সমাজের একাংশের কোপ গিয়ে পড়ল হিন্দু সমাজের ওপর। তাই সেই সময় সামাজিক কারণেই ছেড়ে যেতে হয়েছিল কবির সেই বসত বাড়িটি, আর ওটাই তাঁর জীবনে প্রথম নিজের বাড়ি ছেড়ে অন্যের বাড়ি বা গ্রামে গিয়ে থাকা। এরপর ১৯৪৭ সালের অখণ্ড দেশকে খণ্ড করার স্বাধীনতায় নানা প্রান্ত ঘুরে আসতে হয়েছে স্বাধীন ভারতবর্ষের পথে।

জীবনের এত ওঠা – নামা, এতো পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে কাটাতে হয়েছে, একথা আপাত ভাবে জীবনের সত্য হলেও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে বিচার করলে বা মানব ধর্মের দিক থেকে বিচার করলে কোনোটাই জীবনের চলার পথে প্রয়োজন ছিল না, জীবন চলতে পারত সরল পথে, কবিও চলতে বা থাকতে পারতেন বাংলাদেশের মাটিকে কেন্দ্র করে। কিন্তু তা না হয়ে জীবন যেভাবে পরিবর্তনশীল হয়ে উঠল, যা কবির মানবিক সত্তা একেবারেই কাম্য করেনি। সেখান থেকেই কবির মানবিক কলমে উঠে এসেছে এই আত্মীয়তাহীন জীবনের কথা –

> এক মুহূর্তের সঙ্গে অন্য মুহূর্তের কোনো আত্মীয়তা নেই।
>
> (‘মুহূর্তের মুখ’, নিহিত পাতালছায়া)

পরিবর্তনের এই ধারায় কবি ভীষণ ভাবেই ব্যথিত। বিশেষভাবে শৈশবের খেলাঘর বাংলাদেশ থেকে এমনভাবে চলে আসতে হবে বা ছেড়ে আসতে হবে তাঁর বাল্য জীবনের মাটি এটা একেবারেই কবি মেনে নিতে পারেননি। আর তাই কবির অবসর কবিকে বারবার পৌঁছে দিয়েছে শৈশবের কাছে বা বলা ভালো বাংলাদেশের মাটির শীতল অনুভূতির কাছে। জলের প্রতিটি বিন্দুর শব্দেই যেন কবি অনুভব করেছেন বাংলাদেশের আত্মিকতাকে। তাই শহুরে কলকাতার জীবনে

দাঁড়িয়ে অবসর সময়ে কবি স্মৃতির আঙিনায় পৌছে যান নদী – নৌকা – বাংলাদেশে। বাস্তবের মাটিতে তা না পাওয়ায় কবি কিছুটা হলেও বিরহ কাতর –

শব্দকুহক, নৌকাকাঙাল, খোলা আজান বাংলাদেশের
কিছুই হাতে তুলে দাওনি, বিদায় করে দিয়েছ, ...

('অলস জল', নিহিত পাতালছায়া)

কিন্তু ১৯৭০-৭১ এর রচনা পর্বে এসে কবির মনে হয়েছে- তিনিই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রয়োজনে ছেড়ে এসেছে তাঁর শৈশবের বাসস্থান –

আজ মনে জানি তুমি নও তুমি নও
আমিই আমাকে ছেড়েছি মধ্যরাতে

('একা', আদিম লতাগুল্মময়)

কবির শৈশব স্মৃতি কথায় পারিবারিক অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি মাত্রায় উল্লেখিত হয়েছে দুর্গাপুজোর কথা। দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে পরিবারের সমস্ত মানুষের মেলবন্ধন সকলে নিজের নিজের প্রস্তুতি এবং দুর্গাপুজোর পাঁচদিনের বিশেষ অধ্যায়গুলি উপস্থাপিত হয়েছে কবির স্মৃতি কথায়। কবিতার মাঝেও অধ্যায়গুলি এসেছে কখনো শৈশবের আবেশে আবার কখনোবা সামাজিক ঘটনার সূত্রে। 'তুমি তো তেমন গৌরী নও' কাব্যগ্রন্থের 'দশমী' কবিতায় উঠে এসেছে পুজোর দিনগুলোর কিছু স্মৃতিময় মুহূর্তকথা। যেখানে ফুলতোলা, বোধনের কথা, বলিদান প্রথার কথা, পুজোর আরতির প্রসঙ্গ, প্রণাম করার প্রসঙ্গ এবং দশমীর দিন ঠাকুমার চোখের জলের সাথে ঠাকুমার চোখ দিয়ে ঠাকুরের চোখের জল দেখার প্রসঙ্গ – 'ঠাকুমা যেমন ঠিক দশমীর চোখে দেখে জল'। 'আদিম লতাগুল্মময়' কাব্যগ্রন্থের 'ব্যভিচার' কবিতায় শৈশবের বা বিশেষভাবে বললে পুজোর দিনগুলোর স্মৃতি কথায় সমকাল ও অতীতের শৈশব এই দুটি বিষয় প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে। সমকালে দাঁড়িয়ে কবি প্রশ্ন করেন অতীতের কথা মনে পড়ে কিনা 'পূজাবাড়ি মনে পড়ে?' পরক্ষনেই উত্তর দেন সমকালের সমস্ত ভালোবাসা তাকে আঁকড়ে ধরলেও অতীতের স্মৃতি তিনি কোনো ভাবেই এড়াতে পারেন না 'অতীতের জলস্রোত এড়াতে পারো না' আর তাই রাতের নিস্তব্ধতায় ঢাকের শব্দ বারবার ফিরে ফিরে আসে কবির জীবনে –

খুব দূর থেকে গড়িয়ে আসে ঢাকের শব্দ
এখন রাতদুপুর ...

('বেজে উঠল ঢাক', বাবরের প্রার্থনা)

স্মৃতির আবেশেই শুধু নয় শৈশবের উত্তর না পাওয়া প্রশ্নগুলো স্মৃতি পথ বেয়ে উত্তর খুঁজে পায় সমকালে দাঁড়িয়ে। এমনই এক দুর্গাপুজোর রাতের কথা স্মরণ করেন কবি বর্তমানে রাতে প্রহরীর টহল দেওয়ার শব্দে। কবি জানান দুর্গাপূজার সময় রাত্রিতে পুজোর প্রতিদিনের মত সমস্ত কাজ মিটে যাওয়ার পর রাতের খাবার সম্পন্ন করে তাঁরা ঘুমাতে যেতো এবং মাঝরাতে শুনতো প্রহরীর উঁচু হাঁক –

'সজাগ আছেননি কর্তা ?'

('টহল', গোটাদেশজোড়া জউঘর)

সাথে সাথে কবির ঠাকুরদাও উত্তর দিতেন

''আছি আছি। আছি।'

('টহল', গোটাদেশজোড়া জউঘর)

তখন থেকেই কবির মনে প্রশ্ন জাগে যদি সারারাত গেরস্থ জেগে থাকে তবে প্রহরীর আর কি দরকার। এর উত্তর পেয়েছেন ‘গোটাদেশজোড়া জউঘর’ কাব্যগ্রন্থের রচনা পর্বে এসে। যেখানে সমকালীন সামাজিক অস্থিরতায় সামাজিক মানুষের চোখে ঘুম নেই। তাই কবির মনে হয়েছে সামাজিক শাসক কেবল বাইরের টহলদারির মধ্যে সীমাবদ্ধ, নিজেকে পাহারা দেবার দায় তাই নিজের। সমাজের মাঝে থেকেও সাধারণ মানুষের এরূপ ঘুমহীন জীবন কবির কাছে এক বিস্ময় –

‘নিজেই নিজেকে যদি পাহারা না দিই বার বার
এসব টহলদারি এতদূর বাইরে থেকে কতটুকু করতে পারে আর !

(‘টহল’, গোটাদেশজোড়া জউঘর)

অখণ্ড ভারতবর্ষে জন্মে কবি শুরু করেছেন জীবনের পথচলা। এরপর এক এক করে নানা ঘটনার সাক্ষী হয়ে চলেছেন জীবনের পথে। শৈশব থেকে কৈশরে পা রাখার পথেই বড় বড় দুটো ঘটনা ঘটে যায় সমাজে – এক ১৯৪৬ এ হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, দুই ১৯৪৭ এ ভারত ভাগ। তাই কলকাতার পথে পা বাড়িয়ে শৈশব জননীর কোল থেকে উপড়ে নিতে হয়েছিল শৈশবের আলোকে বয়ে চলা জীবনের শিকড়। রক্তাক্ত হয়েছে কবিমন। এক দীর্ঘ ব্যথা-যন্ত্রণা তাই কবি অনুভব করেছেন, কখনো বিরহ যন্ত্রণায় ভুগেছেন আবার কখনও অভিমানী হয়েছেন। কিন্তু একটু একটু করে জীবন পথে এগোতে এগোতে বুঝেছেন শাসক-তন্ত্রের হাতে সমাজ – দেশ কত অসহায়। কবি যখন বুঝেছেন কবির মতো অসংখ্য মানুষের সাথে দেশ মায়ের নাড়ি ছেড়ার আঘাতে রক্তাত হয়েছে দেশ তখন কবির জীবন হাহাকার করে উঠেছে। কিন্তু দেশমাতা সমস্ত পর্বের মতোই শান্ত স্বরে কবিকে জানিয়ে যান, শিখিয়ে যান – রক্ত যন্ত্রণার উপর দিয়েই আমাদের সবাইকেই যুগ-যুগান্তরের পথে এগিয়ে চলতে হয়।

শান্ত হও। মনে রাখো
রক্তদাগের ওপর দিয়েই আমাদের যুগ-যুগান্তরের এই চলা।

(‘অব্যাহত’, বহুস্বর স্তব্ধ পড়ে আছে)

বিশ্বজিৎ রায় : কলকাতার অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটিতে বাংলায় এম. ফিল.’এর ছাত্র।

‘রায়মঙ্গল’ ও ‘বনবিবির জহুরানামা’ :

একটি তুলনামূলক আলোচনা

দক্ষিণরায় ও বনবিবি। দুজনের সঙ্গেই জড়িত বাঘের প্রসঙ্গকথা।
একজন বাঘের দেবতা, বাঘ যাঁর বশংবদ, অন্যজন বনের দেবী,
বাঘ যাঁকে ভয় করে চলে। কীভাবে তাঁদের সৃষ্টি হল, কী তাঁদের স্বাতন্ত্র্য?
কীভাবেই বা এঁদের পারস্পরিক সম্বন্ধ যুক্ত করে দুই ভিন্ন কাহিনি গড়ে ওঠে
সাহিত্যের আঙিনায় তার সন্ধান করলেন **নন্দিনী সঞ্চারী**।

জল জঙ্গলের দেশ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা। উন্নয়নের হাওয়ায় হালে জীবনযাপনের মানের আধুনিকীকরণ ঘটলেও কয়েক দশক আগে কিন্তু দৃশ্যটা এমন ছিল না। কৃষিই ছিল মানুষের মূল জীবিকা। আর দক্ষিণের সুন্দরবন এলাকা বিস্তৃত ছিল আরো অনেকটা।

জঙ্গলজীবী ও কৃষিজীবী মানুষের এই বিপদসংকুল ও খেটেখাওয়া সাধারণ জীবনের পরতে পরতে তাই জড়িয়ে গেছে নানান আচার বিশ্বাস। সামন্ততন্ত্রের শোষণ থেকে প্রকৃতি ও জীবজন্তু সকলকেই মানিয়ে চলতে খুঁজতে হয়েছে বিকল্প পন্থা, যাতে অন্তত বিশ্বাসে ভর করে জীবনের বহুমাত্রিক সংকটকে নির্বিঘ্নে দূর করা যায়। আর এথেকেই জন্ম নিয়েছেন নানান লৌকিক দেবদেবী। তৈরি হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার নিজস্ব সংস্কৃতি।

এই লৌকিক দেবদেবীদের মধ্যে অন্যতম হলেন দক্ষিণরায় ও বনবিবি। আসলে আলোচনার প্রয়োজনেই যে এই দুই দেবদেবী উঠে এলেন – তেমনটা নয়। বরং বিষয়গত চমকপ্রদতায় এঁরা আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছেন। হিন্দু-মুসলমান দুই ভিন্ন সংস্কৃতির দুই ভিন্ন দেবদেবী ২৪ পরগণার লোকজীবনে মিশে হয়ে উঠেছেন লোক-আত্মিক। অন্যদিকে ধর্মীয় আচার-বিচারের দুরত্ব ঘুচিয়ে লোকজীবনের প্রয়োজনে কীভাবে একীকরণ ঘটেছে এই দুই দেবদেবীর নির্ভর কাব্যের সেটাই এই আলোচনার লক্ষ্য। কোন পরিস্থিতিতেই বা এঁরা আলোচিত হন এক মঞ্চে, সেটাই দেখার।

দক্ষিণরায় ও বনবিবি দুজনের সঙ্গেই জড়িত বাঘ প্রসঙ্গটি। একজন বাঘের দেবতা, বাঘ যার বশংবদ, আর অন্যজন বনের দেবী, বাঘ যাকে ভয় করে চলে। কিন্তু কীভাবেই বা সৃষ্টি হল এই দুই চরিত্রের? কীভাবেই বা এঁরা একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করে দুই মেরুতে সরে যান? আর কীভাবেই বা এঁদেরকে কেন্দ্র করে পারস্পরিক সম্বন্ধ যুক্ত দুই ভিন্ন কাহিনি গড়ে ওঠে?

প্রথমে আমরা দুজনের উৎস সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব –

দক্ষিণরায় : দক্ষিণরায় হলেন দক্ষিণবঙ্গের গ্রামদেবতা। তিনি ব্যাঘ্রদেবতা বলেই অধিক পরিচিত। দক্ষিণবঙ্গের প্রায় প্রতিটি গ্রামের উপান্তে কোনো গাছের তলায় তাঁর পুজো হয়। কোনও গৃহে তিনি পূজিত হন না, কোন মন্দির নেই, অনেকসময় বেদী হয়ে থাকে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ধপধপিতে তাঁর মূর্তিপূজো হয়। *বাংলার লৌকিক দেবতা* গ্রন্থে গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু লিখছেন –

> বর্ণ হরিদ্রা, মাথায় বাবরী চুল, তার উপর উষ্ণীষ বা মুকুট, কানে কুণ্ডল, কপালে রক্ততিলক, চোখ দুটি বিশাল, একটু রক্তাভ... নাক টিকালো, গোঁফ জোড়া আকর্ণ বিস্তৃত, ... রাজ যোদ্ধার বেশ—হাতে তীর ধনুক বা অসি-পরশু, পিঠে ঢাল ও তূণীর।

দুই চব্বিশ পরগণায় পয়লা মাঘ তারিখে আবার দক্ষিণরায়ের প্রতীক সাধারণত নরমুণ্ডরূপী বারামূর্তি পূজিত হয়। মুণ্ডটি ফাঁপা ও গোলাকার। শিরোভূষণ থাকে, গোঁফ ও দাড়ির নিচে গালপাট্টা, চোখদুটি বড়ো বড়ো হয়। একে বারামুণ্ড বলে। এটি মনে হয় কোনো আদিম দেবতার রূপ। কারণ অন্যান্য দেশে আদিম জাতিদের মধ্যে এরূপ মুণ্ডরূপী দেবতার পুজোর প্রচলন দেখা যায়। একসঙ্গে দুটি মুণ্ডমুর্তি সাধারণত পূজিত হয়। গবেষকগণ মনে করেন আরেকটি কুমীরের দেবতা কালু রায়ের প্রতীক। দক্ষিণ ভারতের বিশমলরি নামক প্রাচীন দেবতার গঠন অনেকটা একই। তামিল তেলেগু বংশজাত কিছু জাতি যে কুট্টনদেবের পুজো করেন, তার মূর্তিও অনেকটা এরকম।

কোনও পুরাণ কাহিনিতে কিন্ত দক্ষিণরায়ের খোঁজ পাওয়া যায় না। অনেক পরে ইনি দেবতা হিসেবে পূজিত হয়েছেন। অবশ্য জঙ্গলে ঘেরা এই বাংলাদেশে ব্যাঘ্রদেবতার পুজো প্রচলিত থাকবে এটাই স্বাভাবিক। দক্ষিণরায়ের পুজো প্রচলের পেছনে অবশ্য কোনো ঐতিহাসিক কারণ থাকতেও পারে। যেমন – ১) অনেকে মনে করেন দক্ষিণরায় দক্ষিণ অঞ্চলের লব্ধ প্রতিষ্ঠ শিকারি ছিলেন। ইনি তীর ধনুকের সাহায্যে বহু বাঘ ও কুমীর শিকার করছিলেন। ২) আবার কখনো বলা হয় ইনি ছিলেন যোশহরের রাজা মুকুট রায়ের সেনাপতি। এজন্য তাঁকে সেনাপতি সাহেব বলা হয়ে থাকে। যখন থেকে তিনি বাংলার শাসক হন তখন থেকে ইনি ভাটিশ্বর উপাধি পান। আগেই বলেছি ধপধপিতে দক্ষিণরায়ের যে মূর্তি পাওয়া যায় তা কিন্তু সুপুরুষ যোদ্ধমূর্তি। ইনি দক্ষিণমুখী আয়তনেত্র। বাহন বাঘ ও ঘোড়া প্রায় চল্লিশ বছর আগে ডানদিকে বাঘ ও বাঁদিকে ঘোড়া ছিল। দেবতা থেকে কিংবদন্তি নাকি কিংবদন্তি থেকে দেবতার জন্ম তা অবশ্য বলা যায় না। তবে হতে পারে কোন ঐতিহাসিক মানবচরিত্র কিংবদন্তিতে জড়িত হয়ে দেবতার জন্ম ঘটিয়েছে।

যাই হোক কবি কৃষ্ণরাম দাস এই দক্ষিণরায় ঠাকুরের মাহাত্ম্য বর্ণন করতে লেখেন রায়মঙ্গল। রচনাকাল সম্ভবত ১৬০৬ থেকে ১৬৮৭ এর মধ্যে। তাঁর পূর্বের এক কবির কথা কৃষ্ণরাম উল্লেখ করলেও তাঁর কোন হদিশ পাওয়া যায় না। পরে হরিদেব নামে এক কবি রায়মঙ্গল লিখলেও কৃষ্ণরামের রচনা অনেক সুগঠিত। বেদ বা পুরাণে দক্ষিণরায় নামের খোঁজ পাওয়া যায় না। নামটি পরবর্তীকালের সংযোজন হলেও এই ব্যাঘ্রদেবতার পুজো অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল মনে করা হয়। কবি হরিদেব তাঁর রায়মঙ্গলে লিখছেন,

> আশ্চম্বিতে উচাটিল গণেশের মাথা ।
> দক্ষিণে পড়িয়া সেই হইল দেবতা ।।

কবি কৃষ্ণরাম আঠার ভাঁটির মালিক বলেছেন ।

> রজনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন।
> বাঘপৃষ্ঠে আরোহণ এক মহাজন ।।

করে ধনুঃশর চারু সেই মহাকায় ।
পরিচয় দিলা মোরে দক্ষিণের রায় ।।

বনবিবি : বনবিবি হলেন বনদেবী। যদিও বনবিবি নামটির মধ্যে মুসলমান সংস্কৃতির পরিচয় রয়েছে, তবুও বনবিবি হিন্দু মুসলমান দুয়েরই আরাধ্যা। সুন্দরবনের ভয়ানক জীবজন্তুসঙ্কুল জীবনে বনজীবী মউলে, জেলে, কাঠুরে মানুষের ধর্ম ততটা বড়ো হয়ে ওঠেনা যতটা বড় হয় তাদের অসহায়তা। তাই ধর্মের বাধা পেরিয়ে হিন্দু মুসলমান উভয়েই পূজিতা এই দেবী।

বনবিবির মূর্তির বিভিন্নতা দেখা যায়। কোথাও মুসলিম অবাঙালি নারীর পোশাক পরিহিতা – বুনো ফুল লতাপাতা আঁকা জরির টুপি মাথায়, চুল বিনুনি করে বাঁধা, কপালে টিকলি, পরনে সালোয়ার কামিজ বা ঘাঘরা, মলমলের ওড়না। এক কলে শিশু, অন্য হাতে বরাভয় ফুল বা আশাবাড়ি। পাশে যোদ্ধাবেশে ভাই সাজঙ্গলী, হাতে খাপড়া বা বন্দুক।

হিন্দু ধারণার বনদেবী শীতলার ন্যায়। এঁর কোন বাহন নেই, তবে কখনো কখনো ইনি বাঘ বা মুরগীর ওপরে আসীন। অনেকস্থানে বনবিবির মূর্তিবিহীন থান বা নিকনো জমিতেই পুজো হয়। বনবিবির এই মূর্তিকল্পনা অর্বাচীন। যতদূর সম্ভব আদিম বনদেবী মুসলমান শাসনকালে বনবিবিতে রূপান্তরিত হন। তবে ইনি যে একেবারে লৌকিক দেবী এঁর পূজা পদ্ধতিতেই তা বোঝা যায়। পেতলের গামলায় সিরনী থাকে। বিভিন্ন থালায় সাদা বাতাসা, কদমা, পাটালি, ফলমূল থাকে। পুজোর কোনো মন্ত্র নেই। মৌলবী দিয়ে অনেক জায়গায় পুজো হয়ে থাকে। পাঁঠাবলি হয় বা মুণ্ড ছিঁড়ে মোরগ বা মুরগি বলি দেওয়া হয়। অর্থাৎ মুসলমান পীরের পুজো, অনার্য দেবসাধনা ও হিন্দুদের ভক্তি সবমিলিয়েই ইনি দক্ষিণবঙ্গের ঘরের দেবী।

কৃষ্ণরাম দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্য বলতে যেমন রায়মঙ্গল লিখেছেন বনবিবির কাহিনিও তেমন মুসলমান কিসসা বোনবিবির জাহুরানামা'য় রয়েছে। বেশ কয়েকজন মুসলমান রচনাকারই এঁর স্রষ্টা। রায়মঙ্গল বেশ পূর্ববর্তী রচনা হলেও বোনবিবির জহুরানামা কিন্তু অনেক পরের লেখা। তবে বনবিবির কাহিনি কিন্তু জঙ্গলের মানুষের কাছে অনেকদিন পরেই পরিচিত। কৃষ্ণরাম লিখেছেন, নিম্নশ্রেণীর জেলে মৌলের গল্পকাহিনি থেকে পৃথক উচ্চশ্রেণীর রচনা লিখতে স্বয়ং দক্ষিণরায়ই তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন।

রায়মঙ্গলের কাহিনি : কৃষ্ণরাম যে রায়মঙ্গল রচনা করেন তাঁর দুটি অংশ –

১) কবির স্বপ্নাদেশ পাওয়া

২) দেবদত্ত ও পুস্পদত্তের কাহিনি

কবি আত্মপরিচয় দিয়েছেন যে তিনি নিমতার কায়স্থ বংশোদ্ভূত ভগবতী দাসের পুত্র। স্বপ্নে দক্ষিণ রায় এসে তাঁকে নির্দেশ দেন মঙ্গলগান করার –

রজনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন ।
বাঘপৃষ্ঠে আরোহণ এক মহাজন.।।
করে ধানুঃশর ছারু সেই মহাকায় ।
পরিচয় দিলা মোরে দক্ষিণের রায় ।।
পাঁচালি প্রবন্ধে কর মঙ্গল আমার ।
আঠারো ভাটির মাঝে হইব প্রচার ।।

দক্ষিণরায় স্বয়ং আত্মপরিচয় দিয়েছেন এইভাবে – রাজা প্রভাকর এক সাধুর কাছ থেকে অবগত হয়ে শিবের আরাধনা করে এক পুত্রসন্তান লাভ করেন। দক্ষিণরায়ই সেই পুত্র । রাজা বন পরিস্কার করে নতুন নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে দক্ষিণরায় ধর্মকেতুর কন্যাকে বিবাহ করেন। তারপর দুজনে যোগবলে স্থূলদেহ ত্যাগ করে চলে যান কৈলাসে। হরের বরে দক্ষিণরায় দক্ষিণের অধীশ্বর হন এবং প্রথমে এই নগরীতে পূজার্চনা লাভ করেন।

কাব্যটির দ্বিতীয় অংশে একটি কাহিনি বর্ণিত হয়েছে, যেখানে দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। কাহিনিটি এইরূপ – এক পথিক (পুস্পদত্ত) বাণিজ্য তরী নির্মাণের কাঠ আনতে আদেশ দেয় বড়দহের রতাই বাউল্যাকে। রতাই তাঁর ছয় ভাইকে নিয়ে নৌকা করে গভীর অরণ্যে কাঠ আনতে যায়। কাঠ নিয়ে যখন তারা ফিরতে প্রস্তুত, সেই সময়ে একটা বৃহদাকৃতির গাছ তাদের চোখে পড়ে এবং গাছটা তারা কেটে ফেলে। এই গাছটা ছিল দক্ষিণরায়ের আবাসস্থল। স্বভাবতই দক্ষিণরায় অতন্ত্য রুষ্ট হলেন। তিনি তাঁর অনুচর ছয়টি বাঘকে আদেশ করলে তারা রতাইয়ের ছয় ভাইকে হত্যা করে। রতাই ভাইয়েদের শোকে আত্মহত্যা করবে বলে মনস্থির করে ছেলেকে বাড়ি ফিরে যেতে বলে। রতাই আত্মহত্যা করতে যাবে ঠিক তখনি, ছয় ভাইয়ের মৃত্যুর কারণ জানিয়ে দৈববাণী হল। দক্ষিণরায় স্বয়ং নিজ পরিচয় দিয়ে বলেছেন –

আমি দক্ষিণের রায় সর্বলোকে গুণ গায়
আঠারো ভাটিতে পূজে সবে ।
পুত্র দিয়া বলিদান পূজ আমা সাবধান
ছয় ভাই জিয়াইব তবে ।

এখানে খানিকটা মনসা মঙ্গলের ছায়া আছে বলে মনে হয়। তবে রতাই সেই স্থানেই পুজো করে দক্ষিণরায়ের কাছে ছেলেকে বলি দিল। দক্ষিণরায় এতে রতাইয়ের ওপর সন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁর ছয় ভাই ও ছেলেকে পুনুরুজ্জীবিত করলেন। এরপর রতাই ফিরে এলে বণিক পুস্পদত্ত তাঁর কাছে দক্ষিণরায়ের মহিমার কথা জানতে পারলেন।

পুস্পদত্ত একবার নৌকা তৈরি করার জন্য দক্ষ কারিগরের খোঁজ করতে লাগলেন। তিনি একটি স্বর্ণপেটিকা নিয়ে নগরীতে ঘোষণা করলেন যে, যে নিজেকে দক্ষ কারিগর হিসেবে প্রমাণ করতে পারবে, সে যেন এই স্বর্ণপেটিকাকে গ্রহণ করতে এগিয়ে আসে। এদিকে এই ঘোষণা শুনে কৈলাশের মহাদেব হনুমান এবং বিশ্বকর্মাকে আদেশ দিলেন পুস্পদত্তের নৌকা তৈরি করে দিতে। এঁরা দুজন মানুষের ছদ্মবেশে এসে সাতটি নৌকা মাত্র সাত দণ্ডের মধ্যে তৈরি করে দিয়ে বণিককে স্বপ্নে আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত জানিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান। পুস্পদত্ত তারপর যথাবিহিত পুজো করে নৌকার নাম দিল মধুকর, অনেকটা চাঁদ সদাগরের মধুকর সপ্তডিঙ্গার অনুকরণে।

তবে এরপর থেকেই কাহিনি চণ্ডীমঙ্গলের শ্রীমন্তের আখ্যানের দিকে মোড় নেয়। পুস্পদত্ত দেশের কাছ থেকে বাণিজ্য যাত্রার অনুমতি চায়। সে আরো জানায় তাঁর পিতাও রাজার অনুরোধে মূল্যবান সম্পদ আনতে বিদেশযাত্রা করেছিলেন, কিন্তু তিনি তারপর থেকেই নিরুদ্দেশ হয়েছেন। তাঁর মাও শোকে অন্নজল ত্যাগ করেছেন। তাই পুস্পদত্ত পিতার সন্ধানে যেতে চায়। রাজা পুস্পদত্তের বিপদের আশংকা করে অনুমতি দিতে চাইলেন না, কিন্তু শেষপর্যন্ত কাকুতি মিনতি ও প্রাণত্যাগ করার সংকল্প শুনে সম্মতি জানালেন।

এবার পুস্পদত্ত বিদেশযাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। পুস্পদত্তের জননী সুশীলা এই যাত্রার কথা শুনে ভেঙ্গে পরলেন। শেষপর্যন্ত তিনি দক্ষিণরায়ের আরাধনা করে তাঁকে করজোড়ে জানালেন, তিনি (দক্ষিণরায়) দক্ষিণের রাজা, তিনিই

যেন তাঁর ছেলেকে বিদেশে বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেন। সুশীলার আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে দক্ষিণরায় আবির্ভূত হয়ে তাঁকে আশ্বস্ত করেন। বিদায়কালে সুশীলা পুষ্পদত্তকে দক্ষিণরায়ের পুজোর প্রসাদ দিয়ে বলে দিলেন যখনি সে বিপদে পড়বে তখনই যেন দক্ষিণরায়ের পদযুগল ধ্যান করে।

এরপর মধুকরে চড়ে পুষ্পদত্ত পিতার সন্ধানে যাত্রা করল। বরদহ ছাড়িয়ে, কল্যাণপুরে বলরামের পুজো সেরে, হোগলাপাথরঘাটা অতিক্রম করে, বাড়াসতে অনাদ্য শিবের আরাধনা করে খানিয়ায় গিয়ে পৌঁছায়। এইখানে সে দক্ষিণরায়ের পবিত্রস্থানে পুজো দেয়। থানের সামনেই পীরের আস্তানায় দেখে ফকিররা মাটির ঢিবি ও মুণ্ডাকৃতি মূর্তি পুজো করছে। মাঝিকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে মাঝি পীরের সঙ্গে দক্ষিণরায়ের যুদ্ধের সবিস্তার বর্ণনা করে ।

শুন্যছা বড় খাঁ গাজি পরতেক পীর ।
ঠাকুর দক্ষিণরায় আঠার ভাটির ।।
দুজনে দোস্তানি হইয়াছিল আগে ।
তারপর হুড়োহুড়ি মহাযুদ্ধ লাগে ।।
অধিকার বড় ধন সবে নিতে চায় ।
ভাই ভাই বিরোধে কতেক ঠাঞী যায় ।।
.....
বড়খাঁ হানিল খাঁড়া গলায় তাহার ।
মায়ামুণ্ড ক্ষিতে পড়ে এমনি প্রকার ।।
বিরোধ ভাঙিয়া দিল আসিয়া ঈশ্বর ।
তারপর দোস্তানি পাইল দোঁহাকার ।।
কাটামুণ্ড বারাপুজা সেই হইতে করে ।
কোনখান্যে দিব্যমূর্তি বাঘের উপরে ।। (*রায়মঙ্গল*, কবি কৃষ্ণরাম দাস)

অবশ্য দক্ষিণ ২৪ পরগনার অনেক গ্রামেই একটি ভিন্ন গল্প শোনা যায় – অনাথ দুখেকে বাঁচাতে বনবিবি খড়ম দিয়ে বাঘের মাথা উড়িয়ে দেন। তখন দেখা গেল মাথাটি দক্ষিণরায়ের। যদিও বোনবিবির জহুরানামাতে এর উল্লেখ নেই।

এবার পুষ্পদত্ত ছত্রভোগে এসে ত্রিপুর ভবানীর পুজো দেয়। মগরা পার হয়ে গঙ্গাসাগরে পৌঁছায়। এখানে ভগীরথের বৃত্তান্ত শুনে সে উড়িষ্যার উপকূলে পৌঁছায়। সেখানে জগন্নাথের পুজো সেরে সে রামেশ্বরে যায়। এখান থেকে সদলবলে সে শ্রীহদ্যদহ কাকদাদহ ও জোকাদহ অতিক্রম করে।

রাজদহে পৌঁছে পুষ্পদত্ত একটা অপূর্ব দৃশ্য দেখতে পায়। তাঁর মনে হয় সমুদ্রবক্ষে একটা অপূর্ব সুন্দর প্রাসাদ দাঁড়িয়ে রয়েছে। পুষ্পদত্ত খুব আনন্দিত হয়ে সঙ্গী সাথীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলে তারা জল ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পায় না। সমুদ্র অতিক্রম করে পুষ্পদত্ত এবার তুরঙ্গ শহরে পৌঁছায়। এখানে উপযুক্ত উপঢৌকনসহ সে রাজার সঙ্গে দেখা করতে যায়। তুরঙ্গের রাজা সুরথের নিকট পুষ্পদত্ত আপন পরিচয় দান করে। রাজা সুরথ সস্নেহে তাঁকে তুরঙ্গে আসার কারণ জানতে চাইলে সে তাঁর উদ্দেশ্যের কথা বলে। রাজা তাঁর অপূর্ব পিতৃভক্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এবার পুষ্পদত্ত তাঁর আগমনের বিবরণ দিতে গিয়ে সমুদ্রবক্ষে দৃষ্ট অপূর্ব প্রাসাদের বিষয় উল্লেখ করে।

এতে রাজা পুষ্পদত্তকে তিরস্কার করলে সে বলে যদি রাজাকে সে সমুদ্রবক্ষে প্রাসাদ দেখাতে না পারে তবে রাজা যেন তাঁর সাতটি নৌকাই বাজেয়াপ্ত করেন। রাজা প্রতিশ্রুতি দিলেন যদি তিনি সমুদ্র বক্ষে বিশাল প্রাসাদ দেখতে পান তাহলে তাঁর রাজকন্যাসহ সমগ্র রাজত্ব তিনি পুষ্পদত্তকে দিয়ে দেবেন। এরপর পুষ্পদত্ত রাজাকে নিয়ে রাজদহে গেল।

কিন্তু কোনো ভাবেই সে তাঁকে সমুদ্রবক্ষে প্রাসাদ দেখাতে পারল না। পরিণামে পুষ্পদত্ত বন্দি হয়। রাজা কোতোয়ালকে আদেশ দিলেন – পরদিন পুষ্পদত্তের শিরচ্ছেদ করতে।

কারাগারে বন্দি পুষ্পদত্ত দক্ষিণরায়ের স্তব ও বন্দনাগান করতে লাগলেন। পরদিন যখন নগরকোটাল তাঁকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে, তখনই সেখানে বেশ কিছু বাঘ উপস্থিত হল, সঙ্গে স্বয়ং দক্ষিণরায়। ব্যাঘ্রবাহিনী সমস্ত তুরঙ্গ নগরীকে বিধ্বস্ত করে ফেলতে লাগল, যারা পারল তারা পালিয়ে বাঁচলে, বাকিরা ব্যাঘ্রবাহিনীর আক্রমণে মারা পড়ল। রাজার সৈন্যবাহিনীও ব্যাঘ্রবাহিনীর আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। দক্ষিণরায় স্বয়ং রথে চড়ে বধ্যভুমি উপস্থিত হলেন তাঁর সেবককে রক্ষা করতে। রাজা সুরথ দক্ষিণরায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত মারা গেলেন।

রানির কাছে এই সংবাদ পৌছলে তিনি বিস্রস্ত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছলেন। দক্ষিণরায় তখন দৈববাণী করে জানালেন কেন রাজা সুরথের মৃত্যু হয়েছে। অবশ্য রানি যদি শপথ করেন যে তিনি তাঁর কন্যার সঙ্গে পুষ্পদত্তের বিবাহ দেবেন এবং রাজা যদি দক্ষিণরায়ের মূর্তি গড়িয়ে পুজো করেন তবেই তিনি প্রাণ ফিরে পাবেন। রানি দক্ষিণরায়ের শর্তে সম্মত হলে দক্ষিণরায় অমৃত কুম্ভের জল সিঞ্চনে মৃত রাজা ও তাঁর সৈনিকদের পুনরুজ্জীবিত করলেন।

এবার রাজা ও রানী তাদের একমাত্র কন্যা রত্নাবতীকে পুষ্পদত্তের হাতে সমর্পণ করতে প্রস্তুত। ইতিমধ্যে দক্ষিণরায় পুষ্পদত্তকে জানিয়ে দিয়েছেন যে বিবাহের পূর্বে সে যেন সুরথের কারাগারে বন্দি পিতার মুক্তি চেয়ে নেয়। পুষ্পদত্তের অনুরোধে রাজা সমস্ত বন্দিদের মুক্তি দিলে, পিতা পুত্রের মিলন ঘটল। এরপর রত্নাবতীকে বিবাহ করে পিতাকে নিয়ে পুষ্পদত্ত দেশে ফিরল। দেশের রাজাও সমস্ত শুনে ভক্তিসহকারে দক্ষিণরায়ের পুজো করলেন। এইভাবে সর্বত্র দক্ষিণরায়ের পুজোর প্রচলন হল।

রায়মঙ্গলের কাহিনিটিতে একবার চোখ বোলালেই বোঝা যায় এতে মঙ্গলকাব্য বিশেষত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রভাব অনেকটাই। লৌকিক দেবতা দক্ষিণরায়ের পাঁচালি রচনা করতে বসে কৃষ্ণরাম শুরুতেই বলেছেন তিনি জাগরণ গান ও পালার থেকে পৃথক উচ্চশ্রেণীর কাব্য রচনা করতে চলেছেন। তাই এই উদ্দেশ্যে সচেতনভাবেই কবি বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদগুলির ছায়াগ্রহণ করেছেন। আসলে দক্ষিণরায়ের মতো এক লোকদেবতাকে প্রধান দেবগণের সারিতে বসাতে কৃষ্ণরামের কাছে এই কাব্য চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। তবে কাহিনির লক্ষণে এখানে অন্য সাহিত্যের প্রভাব থাকলেও রচনার গুণে ও কিছু অভিনবত্বয় তিনি এই চ্যালেঞ্জ রক্ষায় সফল হয়েছেন। যেমন ব্যাঘ্রবাহিনীর বর্ণনা – ১) হুরকোথশালে বাঘ ঘরের হুড়কো ভেঙে গরুবাছুর খায়। ২) কুসভ্যা বাঘ জলে হাড়ি মাথায় দিয়ে লুকিয়ে থাকে। নৌকায় লোক কম থাকলে লাফ দিয়ে পড়ে। ৩) টং ভাঙা বাঘের জীবিকা নির্বাহ হয় টং ভেঙে, প্রভৃতি। এইভাবেই রায়মঙ্গল কাব্য দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্যসূচক কাহিনিতে পরিণত হয়।

বাংলায় বিশেষত সুন্দরবন অঞ্চলে বনবিবির কিসসা-কাহিনি লোকমুখে বহুদিন থেকেই প্রচলিত ছিল মনে হয়। পরেরদিকে মুসলমান কবি রচয়িতারা এই কাহিনিকেই ‘বোন বিবির কেচ্ছা’ বলছেন। কিন্তু বয়নুদ্দিন, মুনশী মোহম্মদ খাতের বা মোহম্মদ মুনশী কয়েকজন মুসলমান রচনাকার যখন অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন যুগে জহুরানামা লিখলেন তখন কিন্তু বনবিবির কাহিনির সঙ্গে এই দক্ষিণরায় চরিত্র মিশে এক নতুন কিংবদন্তি গড়ে উঠল। বনবিবির জহুরানামা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলে হয়তো এর কারণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

এই জহুরানামা রচয়িতাদের মধ্যে মুনশী মহম্মদ খাতের এর *বোন বিবির জহুরানামা* সর্বাধিক পরিচিত। এই বইটি এখনও চিৎপুরের একটি প্রকাশনীতে 'আদি ও আসল গওসিয়া লাইব্রেরীর বোন বিবী জহুরা নামা' নামে প্রকাশিত হয়। এই কাহিনিগুলিকে কেন্দ্র করেই মূলত বনবিবির পালা নামক গ্রামীন লোকনাটক তৈরি হয়েছে। জহুরানামা বাংলা ভাষায় হলেও আরবি ফারসি ধরনকে এতে এতটাই অনুকরণ করা হয়েছে যে, বইটি পড়তেও হয় উল্টোদিক থেকে। কাব্যের কাহিনিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় – প্রথমটি বনবিবির আবির্ভাব অংশ ও আঠার ভাঁটির দখল নিতে লড়াই। দ্বিতীয়টি ধনামনা ও দুখের পালা।

জহুরানামার কাহিনি : মুনশী মোহম্মদ খাতের সাহেব প্রণীত জহুরানামার শুরুতেই আমরা দেখি কবি বলছেন পূর্বদেশের বাদাবনের লোকজনের 'খায়েস' রাখতেই তিনি এই কেচ্ছা লিখেছেন। বাংলার বনদেবীর সঙ্গে কবি সরাসরি মদিনার সংযোগ ঘটিয়েছেন। মুসলিম এই প্রভাবের সঙ্গে অবশ্য রূপকথার ছোঁয়াও আছে। বেরাহিম নামে এক ফকির। তাঁর বউ ফুলবিবির কোনো সন্তান হয় না। তাই বেরাহিম দ্বিতীয় বিবাহ করতে উদ্যোগী হলে ফুল বিবির কান্না থামে না। শেষে বেরাহিম বলামাত্র তাঁর চাহিদা পূরণ করবেন বলে কথা দিলে ফুল বিবি আর আপত্তি করলেন না। বেরাহিম তাখন গুলাল বিবিকে বিবাহ করলেন। শেষে গুলাল বিবি যখন সন্তানসম্ভবা তখন ফুল বিবি জেদ ধরলেন গুলাল বিবিকে বনবাস দিতে হবে। বেরাহিমের হাজার অনুরোধ সত্ত্বেও ফুল বিবি তাঁর জেদে অনড়। শেষপর্যন্ত বাধ্যহয়ে বেরাহিম গুলাল বিবিকে বনে রেখে এলেন। সেখানেই জন্ম হল বনবিবি আর তাঁর ভাই শাজঙ্গলির।

এরপর বনবিবির প্রতিষ্ঠাপর্ব। পরিবারে অবহেলিত বনবিবি কিন্তু ততদিনে দিনদুনিয়ার মালিক হয়েছেন। এই পর্বেই বনবিবির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে যুক্ত হল দক্ষিণরায়ের কাহিনি। জহুরানামার কবি ভাঙ্গড় শাহার মুখ দিয়ে বলান, "এখানে দক্ষিণ রায় ভাটির ঈশ্বর"।

কিন্তু আঠার ভাটিতে এসে বনবিবি এলাকার ক্ষমতা দখল করতে বদ্ধপরিকর। যবনের আবির্ভাব দেখে দক্ষিণরায়ও তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। কিন্তু দক্ষিণরায়ের মা নারায়ণী এসে বললেন,

... লড়িবারে প্রয়োজন নাহি তোর আওরতের সাথে।।
জিতিলে না লাভ পাবে মরিলে অখ্যাতি হবে
মানে হীন হইবে ভাটিতে

সুতরাং মা নারায়ণী চললেন বনবিবির সঙ্গে যুদ্ধ করতে। সেই ভয়ানক লড়াইয়ে বনবিবির জিত হল। শেষ পর্যন্ত খোদাতালার কৃপায় তিনি জয়ী হয়ে আঠার ভাঁটিকে বনের বিভিন্ন প্রধানদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিলেন। আদেশ জারি হল কেউ কারও সীমানা লঙ্ঘন করতে পারবে না। এতে দক্ষিণরায়ের ভাগে পড়ল কুঁদখালি বা কেঁদোখালি অঞ্চল।

এই সীমানা লঙ্ঘন না করার প্রসঙ্গটি বোধ হয় ইংরেজ আমলের সঙ্গে যুক্ত। ইংরেজ আমলে যখন বন কেটে বসত করা হয় তখন এই সীমানা লঙ্ঘন একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। জমিদারদের ইচ্ছেমতো সীমানা বাড়িয়ে নেওয়ার প্রবণতার প্রভাব পড়ে সাধারণ মানুষের ওপর। তাই কবি যখন লৌকিক বিষয় নিয়ে পালা লেখছেন তখন লৌকিক প্রাসঙ্গিক বিষয় যে কাব্যের মধ্যে এসে পড়বে সেটাই স্বাভাবিক। আর এথেকে কাব্যটির অর্বাচীনতা সম্পর্কে আন্দাজ করা যায় ।

গল্পের পরের অংশটি দুখের কাহিনি। সুন্দরবনের মধু মোমের ব্যবসায়ী ধনা ও মনা দুই ভাই। ধনা মধু ও মোম সংগ্রহ করতে সুন্দরবনের দিকে যাবে। ধনা নৌকো সাজিয়ে রওনা হয়েছে, এমন সময় দেখা গেল একজন লোক কম

পড়েছে। ধনা লোকের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। তাঁর চোখে পড়ল দুখে সাহা গরু চরাচ্ছে। দুখে গরিবের সন্তান। তাঁকে ফিরে এসে বিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধনা জঙ্গলে যাওয়ার জন্য রাজি করল। এরপর তাঁর বিধবা মাকে রাজি করানোর পালা, তিনি প্রথমটায় আপত্তি জানালেও পরে বারবার করে বললেন , দুখে তাঁর একমাত্র সন্তান, তাঁর যেন কোনো ক্ষতি না হয়। ধনা সে বিষয়ে আশ্বস্ত করলে দুখের মা নিমরাজি হলেন।

কিন্তু দুখেকে নিয়ে যাবার জন্য এত প্রচেষ্টা কেন? লোক কি সত্যিই কম পড়েছিল? কেনই বা অনভিজ্ঞ বালককে নিয়ে যাওয়া হল? এসব প্রশ্নের উত্তর হয়তো আন্দাজ করা যায়, যখন জানা যায় সেকালে জঙ্গলে গেলে মানুষ উৎসর্গ করার রীতি ছিল।

যাই হোক সেবারে জঙ্গলে প্রচুর মধু পাওয়া গেল। দক্ষিণরায় স্বয়ং মধু দিলেন। এবার ঘরে ফেরার পালা। ফেরার আগের রাত্রে দক্ষিণরায় স্বপ্নে দেখা দিলেন ধনাকে। যাবার আগে তাঁকে কর দিয়ে যেতে হবে। কর হিসেবে তাঁর দুখেকে চাই। ধনা ইতস্তত করছে দেখে তিনি বললেন নাহলে কাউকে ফিরতে দেবেন না। তখন ধনা রাজি হল ।

ওদিকে দুখেও জেগে উঠেছে দুঃস্বপ্ন দেখে। ধনা তাকে রান্নার কাঠ আনতে যেতে বলল। দুখেও আন্দাজ করেছে কিছু একটা ঘটতে ছলেছে। তাই সে বারবার মিনতি করল আর কাউকে পাঠানো হোক। কিন্তু ধনাও এবার তার প্রতি বিরক্ত। নিরুপায় হয়ে দুখে কুড়ুল হাতে নেমে গেল নৌকা থেকে। আর ধনাও তার নৌকা নিয়ে রওনা হল বাড়ির দিকে।

এদিকে দক্ষিণরায় বাঘের রূপ ধরে হাজির দুখেকে খাওয়ার জন্য। দুখে দেখল সামনে সাক্ষাৎ মৃত্যু। তার মনে পড়ল মায়ের কথা। মা বলেছিলেন বিপদে পড়লে বনবিবিকে সে স্মরণ করে। দুখে তখন বনবিবিকে ডাকতে ডাকতে অজ্ঞান হয়ে গেল। বিনবিবি তখন ছিলেন ভুরকুণ্ডিতে। তাঁর আসন টলে উঠল ভক্তের ডাকে। তিনি ভাই শাজঙ্গলীকে নিয়ে ছুটে এলেন। কোলে তুলে নিলেন দুখেকে আর ভাইকে নির্দেশ দিলেন দক্ষিণরায়কে উচিত শিক্ষা দিতে। শাজঙ্গলী হাতে একটা সোটা নিয়ে দক্ষিণরায়ের পিছু ধাওয়া করলেন। দক্ষিণরায় প্রাণভয়ে বনবাদাড় ভেঙে ছুটে আশ্রয় নিলেন বড়োগাজীর কাছে। শাজঙ্গলী সেখানে উপস্থিত হয়ে রাগে ফেটে পড়লেন বড়োগাজীর উপরে – গাজী হয়ে তিনি একটা কাফেরকে আশ্রয় দেন।

অনেক কষ্টে বড়োগাজী শাজঙ্গলীকে ক্ষান্ত করলেন। এরপর বনবিবি সেখানে উপস্থিত হলে বড়োগাজীর পরামর্শে দক্ষিণরায় তাঁকে মা বলে ডেকে পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইলেন। বনবিবি তাঁকে ক্ষমা করলেন আর আদেশ করলেন দুখেকে দেশে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে। শেষে বনবিবির দয়ায় কুমীরের পিঠে চড়ে দুখে দেশের ঘাটে এসে নামে।

এদিকে বন থেকে সবাই ফিরেছে, ফেরেনি শুধু দুখে। দুখের মা তাই কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে যেতে চলেছেন। এমন সময় মা ডাক শুনে তিনি চমকে উঠলেন। মিলন হল মা ও ছেলের। এরপর দুখে গলায় কুড়ুল বেঁধে বাড়ি বাড়ি বনবিবির মাগন চেয়ে ক্ষীর খয়রাত করে বনবিবির পুজো দিল। দেবীর বরে অগাধ সম্পত্তি লাভ করে নবাব হল সে। আর ধনা তো ভয়ে ভয়ে থাকে। এই বুঝি তাঁর গর্দান যায়। শেষে একদিন দুখে তাকে ডেকে পাঠাল। কাঁপতে কাঁপতে সভায় উপস্থিত হয়ে সে বুদ্ধি করে প্রস্তাব দিল তার মেয়ের সঙ্গে সে দুখের বিয়ে দিতে চায়। অবশেষে বিবাহের মাধ্যমে গল্পের সমাপ্তি।

এই দুই কাব্যকে লক্ষ করলে আশ্চর্যের বিষয় হল একই অঞ্চলে প্রায় একই সঙ্গে পুজিত হন যে দুই দেবদেবী, তাদের কাব্যের দ্বন্দ্বমূলক পার্থক্য। দক্ষিণরায় যতখানি মহিমা নিয়ে রায়মঙ্গলে আবির্ভূত হন, জহুরানামাতে তাঁর ততখানিই

সন্মানহানি ঘটে। সেখানে তিনি রাক্ষসের মতো নিষ্ঠুর হয়ে দুখেকে খেতে চান। বনবিবির কাছে তিনি যারপরনাই পর্যুদস্ত ও পরাজিত হন। দেবমহিমা সেখানে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। অথচ দক্ষিণবঙ্গে দক্ষিণরায়ের প্রতি ভক্তি বা শ্রদ্ধা মানুষের কিছু কম নেই। তাহলে দক্ষিণরায়কে হীন পরাভবের মাধ্যমে বিবিমা এত উঁচু আসনে বসেন কী করে?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে অনেকগুলি প্রেক্ষাপট বিচার করতে হবে। সুজিত সুর তাঁর গবেষণায় দেখাতে চেয়েছেন দক্ষিণরায় সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ। তাঁর পূজাও তাই ওপরতলার আসন থেকে জোর করে চাপানো। অন্যদিকে বনিবিবি মানুষের কাছের দেবী। তাঁকে তাই মানুষ আপন করে নিয়েছে। কিন্তু এই মত বোধহয় সম্পূর্ণ মানা যায় না। কারণ ব্যাঘ্রবাহিনী দক্ষিণরায়ের বংশবদ বলে মানুষ তাঁকে মান্য করে চললেও তিনি শুধুমাত্র ভয় থেকে জাত দেবতা নন। ধপধপিতে এমন কথাও প্রচলিত যে রাতে দক্ষিণরায় স্বয়ং ঘোড়ায় চেপে গ্রাম পাহারা দেন। তাছাড়া অন্যান্য রোগ শোক নিবারণের জন্যও তিনি পূজিত হন আর দক্ষিণরায় জ্ঞানে পুজিত বারাঠাকুর তো বাস্তুদেবতা নামে পরিচিত, তিনি শস্য ও বাস্তুর রক্ষক। এসব থেকে দক্ষিণরায়কে শুধুমাত্র চাপিয়ে দেওয়া দেবতা বলে মনে করা যায় না। আর রায়মঙ্গল কাব্যে কবি দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্য প্রচার করতে চেয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে তিনি অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের ছায়া অনুসরণ করেছেন মাত্র। ভয় বা অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়ে ভক্তের পুজো ও ভক্তি পাবার প্রবণতা মঙ্গলকাব্যের দেবীদের থেকেই চলে আসছে। রায়মঙ্গল সেদিক থেকে এক আঞ্চলিক মঙ্গলকাব্য।

কিন্তু বনবিবির জহুরানামা'তে কীভাবে দক্ষিণরায় প্রবেশ করলেন? দক্ষিণরায়কে নিম্নাসনে বসিয়ে রাখাই বা হল কেন? দক্ষিণ ২৪ পরগণায় লোকশ্রুতিতে যে বনবিবি দুখের কাহিনি অনেকদিন ধরেই মুখে মুখে প্রচলিত ছিল – তা আগেই বলা হয়েছে আসলে জঙ্গলকে ভিত্তি করে জাদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয়, তাদের প্রাণের কোনো ভরসা নেই। কাঠ মাধু বা মোম যাই আনা হোক না কেন বাঘের মতো হিংস্র জন্তুদের সঙ্গে মোকাবিলা করার মতো অস্ত্র সে সময়ে ছিল না। তাই লড়াই যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে অসহায় মানুষের, জাদুবিশ্বাস সেখানে এস পড়বে, এটাই স্বাভাবিক। সেজন্য এঁরা বিশ্বাস করে মন্ত্রের সাহায্যে বাঘকে বশ করে, তবেই জঙ্গলে যাওয়া যায়। (এমনকি এখনো পর্যন্ত)

বাওয়ালি বা মুসলমান ফকির মন্ত্রের সাহায্যে বাঘকে জব্দ করে, এটাই এদের বিশ্বাস। এজন্য বিভিন্ন ধরনের মন্ত্র আছে। মন্ত্রে বিভিন্ন ধরনের দোহাই হিসেবে বিভিন্ন নাম ব্যবহৃত হয় – ১) সরকারি নাম, ২) বাইশ ফকিরের নাম, ৩) বিবিদের নাম, ৪) হিন্দু দেবদেবীর নাম প্রভৃতি। এর মধ্যে যে আট বিবির নাম পাওয়া যায় তারা হলেন ফতেমাবিবি, ফুলবিবি, গুলালবিবি, দুলছায়াবিবি, মাইচম্পাবিবি, খুরসানবিবি, রসুনবিবি, বনবিবি প্রমূখ। আলি মদতের দোহাইয়ের নামে এসব নাম দেখে বোঝা যায় হুকুমে বাওলেদের আদি পীর ফকির বা বিবি এরাই ছিলেন। তাই এদের স্মরণ করে মন্ত্র পড়া হয়। বনবিবির নামেও দোহাই আছে – দোহাই মা বনবিবি আমার এই মালে উপরি পরী প্রেত ভূত ডাকিনী জগিনী হাঁকোর কোমরিনী বাগ ভাল্লুকিনী কামট কোমরিনী আমার মালের মধ্যে যে দিবা পায় দোহাই মা বনবিবি হুকুমে তাঁর জলে জাবে তাঁর গায় দোহাই মা বনবিবি তোমার সাজংলীদের কেটে খাওয়া।

লক্ষণীয় যে এই বিবিদের মধ্যে বনবিবি শেষ ধাপে অর্থাৎ তিনি অনেক অর্বাচীন যুগে তালিকাভুক্ত হয়েছেন। পরবর্তীকালে যখন দুখে সাহার কিংবদন্তি জনপ্রিয় হল, তখন তিনি প্রথম সারিতে চলে এসেছেন। এরপর যখন মুসলমান কবিরা বনবিবিকে নিয়ে জহুরানাম রচনা করতে বসেছেন তাখন মক্কাবাসী হযরত ইব্রাহিমের বিবি হাজেরার বনবাস কাহিনিকে এর সঙ্গে যুক্ত করে কাহিনিতে নতুন মাত্রা এনেছেন। অর্থাৎ কৃষ্ণরাম রায়মঙ্গল লিখতে বসে যেমন বলেছিলেন

উচ্চশ্রেণীর কাব্য লিখেছেন, তেমনি কিসসার কাহিনিকারগণও সচেতনভাবেই বনবিবিকে লৌকিক আসন থেকে উচ্চাসনে তুলে আনলেন। তখন তিনিই হলেন দিন দুনিয়ার মালিক। কিন্তু এর পেছনের কারণ কি?

আসলে বনবিবির জহুরানামা ছিল মুসলমান রচনাকারদের মানসিকতার প্রতিরূপ। হিন্দু দেবদেবীকে নিম্নাসনে বসিয়ে ইসলাম ধর্মকে উচ্চাসনে তুলতে অত্যন্ত সচেতনভাবেই তারা সাধারণ আটবিবির এক বিবিকে নতুন মাত্রার জারিত করেছেন। অর্থাৎ লড়াইটা এখানে শুধু দক্ষিণরায়ের সঙ্গে বনবিবির নয়, হিন্দু প্রাধান্যের সঙ্গে মুসলমান প্রাধান্যের। সাধারণ মানুষের কাছে তারা যতই একসঙ্গে পুজিত হন না কেন কাহিনি যখনই লিখিত হচ্ছে, তখনই তাকে আরও সুগঠিত করার চেষ্টা হয়েছে। রায়মঙ্গলের ক্ষেত্রে লৌকিক দেবতা মঙ্গলকাব্যের প্রাধান্য পেয়েই থেমে যাচ্ছেন, যদিও বড়গাজীর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ স্বধর্ম রক্ষা ও অধিকারের লড়াই বলে ভাবা যেতে পারে, কিন্তু বনবিবির কাহিনি মুসলিম সৃষ্টিকারদের উচ্চমন্যতায় জারিত হয়ে হিন্দু দেবতাকে কাফের বানিয়ে দিয়েছে।

তবে মজার কথা, দক্ষিণরায় কিন্তু লৌকিক দেবতা হয়েও হিন্দু জনসমাজেই পূজাপ্রাপ্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন। অন্যদিকে বনবিবি হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে চব্বিশ পরগণার বিস্তৃত অঞ্চলের মানুষের কাছে পূজিত, কোথাও নৈবেদ্য দ্বারা কোথাও কদমা-সিরনি সহযোগে।

বনবিবির এই লিখিত কিসসা যে শুধু রচনাকারদের ধর্মীয় উচ্চমন্যতার লক্ষণ তা কিন্তু নয়। বরং আখ্যানকে লক্ষ করলেও এই ধর্মীয় প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। রায়মঙ্গলের প্রতিপক্ষে লেখা এই কাহিনিতে যেমন হিন্দু মুসলমানের কোন সদ্ভাব বা সহাবস্থানের কোনো পরিচয় রাখা হয়নি, তেমনই বাংলায় ইসলাম ধর্ম তথা রাজ্যপ্রচারের সূচনায় উভয় শক্তির সংঘর্ষ ঐতিহাসিক সত্য। বনবিবির কাব্যে সেই সত্যই উপস্থিত। দুখেকে বাঁচানোর মধ্যে মাতৃরূপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বটে, কিন্তু অঞ্চলের মালিকানা নিয়ে সংঘর্ষে পূর্বের সরল ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইসলামি দৈবভাব প্রতিষ্ঠা বনবিবির পক্ষে সম্ভব হয়নি। বনবিবি সেখানে অধিকার প্রতিষ্ঠায় বীরাঙ্গনা।

দিন দুনিয়ার মালিক হয়েও বনবিবিকে দক্ষিণরায় ও নারায়ণীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। আঠার ভাঁটির মালিক দক্ষিণরায়কে পরাস্ত করে সেই অঞ্চল দখল করতে হয়। তবেই তিনি স্বমহিমায় প্রকাশ পেতে পারেন। এইভাবে ধর্মীয় মানসিকতাই উঠে এল জহুরানামার মধ্যে।

তবে বনবিবির জহুরানামার জনপ্রিয় হবার পেছনে আরও একটি কারণ আছে। তা হল এই কিসসাকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠা গায়ননির্ভর বনবিবির 'একানি' পালা, নাটকের মত বনবিবির পালা বা দুখে যাত্রা। আধুনিক পালার মতই অঙ্কদৃশ্য ভাগ করে এই অভিনীত হয়। এর কোনো ছাপা বই পাওয়া যায় না। এই সাধারণ যাত্রাপালার মতো খোলা গোলাকার মঞ্চে অভিনীত হয়। দর্শকরা চারদিকে বসেন। বৈশাখ বা মাঘ মাসে যখন বনবিবির পুজো হয় বা জঙ্গলে যাবার আগে যখন জেলে মউলেরা বনবিবির পুজো করে তখনই এই পালা অভিনীত হয়। অনেকে আবার মানত স্বরূপ এই পালাকে ব্যবহার করেন। কখনও এই পালার পরিবর্তে বনবিবির গানের ব্যবস্থা করা হয়।

মুসলমান কিসসাকার কবিরা যে উদ্দেশ্য নিয়েই তাদের কাব্য লিখুন না কেন, বনবিবি কিন্তু গান পালার মধ্য দিয়ে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে ঘরের মেয়ে হয়ে গেলেন। এমনকি এলাকাভেদে দেবীর পোশাক বা পুজোরীতিও বদলে গেল। বাংলার লৌকিক দেবদেবীদের মধ্যে আর কেউ কিন্তু এমন ধর্মনিরপেক্ষ রূপ বজায় রাখতে পারেননি। তাই বনবিবির পালার শুরুতে যখন কোনও হিন্দু পালাকার বন্দনাগান লেখেন তাঁর কলমে আসে এইসব লাইন –

এই পর্যন্ত বন্দনা আমরা অল্পে সাঙ্গ করি ।
মুসলমান বলুন গো আল্লা, হিন্দু বলুন হরি ।।

ভাবে অভিনয়ের মাধ্যমে বনবিবির পালা পরিবেশিত হয় বলে মানুষের কাছে এর আকর্ষণ বেশি। লোক-নাটক একটি প্রাণবন্ত মাধ্যম। তাই মানুষ যখনই এমন একটি মেলোড্রামাটিক জমজমাটি পালা চোখের সামনে দেখছে, তখনই তাঁর প্রভাব অনেক বেশি। বনবিবির পালা দেখেছেন এমন অনেকেই বলেন পালার নানা দৃশ্য বিশেষত ভয়ার্ত দুখের মুখের গান তাঁদের মন ছুয়ে যায় –

কোথা মা বনবিবি, একবার দেখা দাও আমারে,
বিপদে পড়িয়া মা গো তাই ডাকি আজ তোমারে ।

বনবিবি তখন উদ্বিগ্ন স্বরে বলছেন –

কে ডাকলে জঙ্গলে
বোন বিবি বোন বিবি মা বলে
দেখি গিয়ে কোন দুখিনির ছেলে
ডাকল আমায় মা মা বলে
ওরে ভাই শা জঙ্গলি
যেতে হবে কেঁদোখালি
কোন বাছার ওই বিপদ ভারি
তাই তো আমার আসন টলে ।

এইভাবে মাতৃত্বের পরিচিত স্নেহ ভালবাসায় বনবিবি স্থাপিত হয়ে মানুষের অনেক কাছে চলে আসেন, আর দক্ষিণরায় হয়ে ওঠেন খলনায়ক।

আসলে অনুকূল পরিবেশ পরিস্থিতিই একটা সাহিত্যকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যায়। রায়মঙ্গল ও বনবিবির ক্ষেত্রে এটাই হয়েছে। রায়মঙ্গল অনেক দক্ষ হাতের রচনা, কাহিনিও অনেক সংবদ্ধ। তবু লৌকিক দেবতার এই কাহিনি ততটা জনপ্রিয় হয়নি যতটা হয়েছে বনবিবির কাহিনি। অথচ জহুরানামায় ধর্মীয় উচ্চমন্যতার দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে লেখা হয়েছে। কাহিনির বুনটও অনেক পাতলা। তবুও বনবিবির কিংবদন্তির জনপ্রিয়তা, সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযোগ ও দৃশ্যগীতময় প্রয়োগকলার (performance) গুণেই এই কাহিনির পক্ষে জনমানসে উত্তরণ সম্ভব হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থ :

১। *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী,* সম্পাদনা শ্রী সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
২। গাওসিয়া লাইব্রেরীর *বোনবিবির জহুরানামা,* মুনশী মোহম্মদ খাতের, জি. কে প্রকাশনী।
৩। *বাংলার লৌকিক দেবতা,* গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৬৬।
৪। *সুন্দরবনের ইতিহাস,* এ এফ এম আব্দুল জলিল, নয়া উদ্যোগ, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ ২০০০।
৫। *বনবিবির পালা,* সম্পাদনা – সুজিত কুমার মন্ডল, গাংচিল, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০১০।
৬। *হরিদেবের রচনাবলী,* শ্রী পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৬৭।
৭। *বাঘ ও সংস্কৃতি,* শ্রী সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, পুস্তক বিপণি, প্রকাশ বড়দিন ১৯৮০।
৮। *মাটিতে পা রেখে,* সুজিত সুর, সম্পা. অমিত রায়, পাঠশালা প্রোডাকসন্স, ফেব্রুয়ারি, ২০১৪।

নন্দিনী সঞ্চারী : দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কুলপির মির্জাপুর গণেশচন্দ্র শিক্ষায়তনের বাংলা ভাষার সহশিক্ষক।

হিন্দুস্তান সোস্যালিস্ট রিপাব্লিকান অ্যাসোসিয়েশন এবং ভগৎ সিং

এ এক অগ্নিযুগের ইতিহাস। এ এক অগ্নিপুরুষের আখ্যান।
মাত্র বারো বছর বয়সে তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগের রক্তে-ভেজা মাটি
সংগ্রহ করে এনে বুকের মধ্যে দেশপ্রেমের যে আগুন জ্বেলেছিলেন,
মাত্র তেইশ বছর বয়সে সেই আগুন বুকের ভেতর রেখে তিনিই
বরণ করেছিলেন ফাঁসির দড়ি। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তেও তিনি অনমনীয়।
ভগৎ সিং ও তাঁর তিন সহযোদ্ধার অমর আখ্যান শোনালেন **অমিত রায়**।

ভগৎ সিং

অক্টোবর ১৯২৪। একবছর আগে কানপুরে আন্দামান ফেরত শচীন্দ্রনাথ সান্যাল এবং যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জী গঠন করলেন 'হিন্দুস্তান রিপাব্লিকান অ্যাসোসিয়েশন' (এইচআরএ)। সাজাহানপুরের রামপ্রসাদ বিসমিল, আসফাকউল্লা, রাজেন্দ্র লাহিড়ী, চন্দ্রশেখর আজাদ, মন্মথনাথ গুপ্ত এবং আরও অনেকে যোগ দিলেন এই নবগঠিত সংগঠনে। বিজয়কুমার সিংহ এবং ভগৎ

সিংও যোগ দিলেন এই সংগঠনে। জানুয়ারি, ১৯২৫-এ এইচআরএ'র সংবিধান রচিত হল। এর পরেই 'Revolutionary' নামে একটি প্যামপ্লেট বিলি করে তাতে 'সন্ত্রাসবাদ' ও 'নৈরাজ্যবাদ'এর সঙ্গে 'বিপ্লব'এর তুলনা করা হল।

ইতিমধ্যে রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের ইতিহাস ভগৎকে অনুপ্রাণিত করেছে। ভগৎ ধীরে ধীরে মার্কসবাদে দীক্ষিত হচ্ছেন। তিনি মার্কসকে গুরু হিসাবে মানছেন। তিনি বই পড়ে জানছেন যে সামাজিক আসাম্য সৃষ্টি মানুষের অবদান এবং এক শ্রেণির মানুষ তাকে চিরস্থায়ী করে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে। শ্রেণিচেতনা তাঁর মধ্যে জারিত হচ্ছে। জমিদার শ্রেণির সন্তান হয়েও এখন তিনি উপলব্ধি করছেন যে ভারতের জন্য স্বাধীনতার যুদ্ধ মানে শুধু ব্রিটিশদের হাত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা নয়, স্বাধীনতার লড়াই মূলত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সংগ্রাম। তিনি জোরের সঙ্গে বিশ্বাস করতেন যে গরিবি দূর না করে শুধুমাত্র স্বাধীনতা পাওয়ার অর্থ হল নামেই স্বাধীনতা যা আপামর জনগণের কোনো উপকারে আসবে না। তিনি প্রশ্ন তুলছেন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া কীভাবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা সফল হতে পারে? স্বাধীনতার কী অর্থ যদি গরিব মানুষ গরিবই থেকে যায়? তিনি ভাবছেন, কীভাবে এই গরিব ও বড়লোকের মধ্যে অসাম্য দূর করা যায়। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের শিক্ষাকে তিনি করায়ত্ত করছেন। রাজনৈতিক তত্ত্বকে তিনি আর প্রাথমিক বলে মনে করছেন না; এগুলি যে আসলে রাজনীতির পশ্চাদবর্তী ঘটনার ফল, তা মানতে শিখছেন। মার্কসের কাছ থেকে তিনি শিখছেন রাজনৈতিক প্রক্রিয়া মুল কারণ নয়, অর্থনৈতিক শক্তিই হল এর মূল উৎস। তিনি একবার তাঁর মা, বিদ্যাবতী কাউরকে একটি চিঠিতে লিখছেন,

> মা, আমার কোনো সন্দেহ নেই যে আমার দেশ একদিন মুক্ত হবে। কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি, যে বাদামি সাহেবরা সাদা সাহেবদের চেয়ারে বসবে। (অর্থাৎ, পরিস্থিতির কোনো বদল হবে না – লেখক।)

ভগৎ সিং বিশ্বাস করতেন, যদি ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তি ঘটে শুধুমাত্র ক্ষমতার হাতবদল হয় তাহলে দেশের মানুষের ভাগ্য বিড়ম্বনা একই থেকে যাবে। ভারতের মান্ধাতা আমলের ব্যবস্থা, যা অলঙ্ঘ্য প্রাচীরের মতো উন্নয়নের বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তা যদি ভেঙে ফেলা না যায় তাহলে দেশের কোনো উন্নতিই হবে না। এবং তা বদলাতে গেলে একটাই অস্ত্র, তা হল 'বিপ্লব'।

৯ আগস্ট, ১৯২৫। এইচআরএ সাহারানপুর-লক্ষ্ণৌ রেললাইনে অবস্থিত এক জনবিরল স্টেশন 'কাকোরি'তে ৮-ডাউন ট্রেনে ডাকাতি সংগঠিত করে এবং সেই ট্রেন থেকে রেলের নগদ অর্থ লুঠ করে। এই ডাকাতি হয় পরিকল্পনামাফিক। এতে অংশ নেন রামপ্রসাদ বিসমিল, আসফাকউল্লা, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, রোশন সিং, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, শচীন্দ্রনাথ বকসী, চন্দ্রশেখর আজাদ, মুকুন্দী লাল, মুরারী লাল, কুন্দন লাল, বনোয়ারী লাল, মন্মথনাথ গুপ্ত, যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জী এবং আরো অনেকে। এরপর এই ডাকাতির পাণ্ডাদের খোঁজ শুরু হয়। ২৬ সেপ্টেম্বর এই ডাকাতির সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার করা শুরু হয়। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রায় সমস্ত স্বদেশী বিপ্লবীদের ধরা হয় বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন তারিখে। মামলা শুরু হয় যা 'কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলা' নামে পরিচিত। প্রাথমিক ভাবে ২৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয় ৪ জানুয়ারি, ১৯২৬-এ সৈয়দ আইনুদ্দীনের এজলাসে। প্রথমে দু'জন এবং পরে আরো দু'জন রাজসাক্ষী হতে চাইলে তাদের বিরুদ্ধে মামলা তুলে নেওয়া হয়। বাকিদের লক্ষ্ণৌ আদালতে স্পেশ্যাল সেশন জজ হ্যামিলটনের এজলাসে মামলা পাঠানো হয়। বেশ কিছুদিন পর আসফাকউল্লা খান এবং শচীন্দ্রনাথ বকসী ধরা পড়েন এবং তাঁদেরও মামলায় আসামি করা হয়।

৬ এপ্রিল, ১৯২৭ মামলার রায় ঘোষণা করা হয়। সারা আদালত কক্ষ তখন ভেসে যাচ্ছে বিসমিল এবং তাঁর সঙ্গীসাথীদের উচ্চকিত আবৃত্তিতে মৌলনা হসরত মোহনের গজলে –

> সার্ফরোশি কি তামান্না আব হামার দিল মে হ্যায়,
> দেখনা হ্যায় জোর কিতনা বাজুয়ে কাতিল মে হ্যায়।।

সারা আদালত চত্বর কেঁপে কেঁপে উঠছে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিতে। সেদিন আদালতের রায়ে রামপ্রসাদ বিসমিল, ঠাকুর রোশন সিং, আসফাকউল্লা এবং রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর ফাঁসির আদেশ হল। মন্মথনাথ গুপ্ত নাবালক ছিলেন তাই ওনাকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে চোদ্দ বছরের জন্য কারাবাসের সাজা দেওয়া হল। শচীন্দ্রনাথ সান্যালকে আন্দামান সেলুলার জেলে আজীবন কারাবাসে দণ্ডিত করা হল। (ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে উনিই একমাত্র বিপ্লবী যিনি দুবার আন্দামানে বন্দি ছিলেন। কাকোরি রেল ডাকাতির আগে লাহোর ও বেনারস ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়ে ১৯১৫ সালে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে তাঁকে আন্দামানে সেলুলার জেলে পাঠানো হয়। সেখান থেকে তিনি মুক্তি পান ১৯২০ সালে। পরে কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলায় দেশের জেলে কিছুদিন কারাদণ্ড ভোগ করার পরে পুনরায় ১৯৩২ সাল থেকে আবার যখন আন্দামানে রাজবন্দিদের পাঠানো শুরু হয় সেই সময় পুনরায় তাঁকে আন্দামানে প্রেরণ করা হয়।) শচীন্দ্রনাথ বকসী, গোবিন্দচন্দ্র কর, যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জী এবং মুকুন্দী লালের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড আর রাজকুমার সিংহ, সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিষ্ণুচরণ দুবলিশ এবং রামকিষেণ ক্ষেত্রীর দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হল। ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল, প্রেমকৃষ্ণ শর্মার পাঁচ বছর, বনওয়ারীলাল, প্রণবেশকুমার চ্যাটার্জীর চার বছরের কারাদণ্ড হল।

১৯ ডিসেম্বর ১৯২৭। গোরক্ষপুর জেলের ফাঁসির মঞ্চে ফাঁসির দড়িকে চুম্বন করে শেষ বিদায় নিলেন রামপ্রসাদ বিসমিল, ফৈজাবাদ জেলের ফাঁসির দড়িতে শহিদ হলেন আসফাকউল্লা (ব্রিটিশ আমলে সিপাহি বিদ্রোহের পর আসফাকউল্লাই একমাত্র মুসলিম যাঁর ফাঁসি হয়েছিল), ঠাকুর রোশন সিং শহিদ হলেন এলাহাবাদ জেলা জেলের ফাঁসির মঞ্চে। ১৭ ডিসেম্বর, ১৯২৭ – গোন্ডা জেলে ফাঁসি হল রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর। বাকিদের বিভিন্ন জেলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কারাদণ্ড ভোগ করতে পাঠানো হল। শচীন্দ্রনাথ সান্যালকে পাঠানো হল আন্দামান সেলুলার জেলে।

ইতিমধ্যে পাঞ্জাবের লাহোর বৈপ্লবিক কার্যকলাপে উত্তাল হয়ে উঠল। ১৯২৪-এ ভগৎ সিং জলন্ধর থেকে কানপুরে এলেন। ভগৎ সিংয়ের জন্ম ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯০৭। জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা যখন ঘটে তখন তাঁর বয়স ছিল বারো। এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড সেই বয়সেই গভীরভাবে ভগতের মনে দাগ কেটে যায়। জালিয়ানওয়ালাবাগের পরদিন, ভগৎ সিং স্কুলে গেলেন। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরলেন না। তাঁর পরিবার তাঁর জন্য উৎকণ্ঠিত। ওইদিকে কিশোর ভগৎ সেদিন স্কুলে না গিয়ে চলে গেছেন সোজা জালিয়ানওয়ালাবাগের অকুস্থলে। কোনোভবে সেখানে পাহারাদারদের হাত করে তিনি প্রাচিরবেষ্টিত বাগানে ঢুকে পড়েন। তখনও সেই জায়গার মাটি হতাহত মানুষের রক্তে ভেজা। ভগৎ একটা পাত্রে সেই রক্তাক্ত মাটি সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরে আসেন। তাঁকে বাড়ি ফিরতে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁর ছোট বোন বলে, "তুমি সারাদিন কোথায় ছিলে, মা তোমার জন্য খাবার নিয়ে বসে আছে"। ভগৎ তখন খাবার কথা ভাবছিলেন না, ক্ষুধা-তৃষ্ণার বোধ তখন সম্পূর্ণ অবলুপ্ত। তিনি তাঁর হাতের পাত্রটি দেখিয়ে বললেন, "এটার দিকে দেখ। এই পাত্রের মধ্যে ব্রিটিশ যাঁদের মেরেছে, তাঁদের রক্ত রয়েছে। প্রণাম করো"। ওই বয়সেই কতটা সংবেদনশীল ছিলেন ভগৎ! সেই সময় থেকেই বালকমনে ব্রিটিশদের সম্পর্কে সঞ্চিত হচ্ছিল ঘৃণা এবং অদম্য প্রতিশোধস্পৃহা।

ভগৎ সিংহের বাবা, কিষাণ সিং ছিলেন সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মী, কাকা অজিত সিং সরাসরি বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন এবং তাঁর আগুনঝরানো বক্তৃতা বহু মানুষ মুগ্ধ হয়ে শুনত। ভগৎ সিং তাঁর স্কুল জীবনে বন্ধু হিসাবে পেয়েছিলেন ভগবতী চরণ ভোরা এবং সুকদেব থাপার'কে। শিক্ষক হিসাবে পেয়েছিলেন ছবিল দাস এবং অধ্যাপক জয়চাঁদ বিদ্যালংকারকে, যাঁরা ছাত্রদের মধ্যে দেশপ্রেমের বীজ বপন করাকে কর্তব্য বলে মনে করতেন। ১৯২৪। ভগতের বয়স তখন ষোলো। বাড়িতে তাঁর বিয়ে দেবার জন্য কথাবার্তা চলছিল। কিন্তু ততদিনে ভগৎ তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঠিক করে নিয়েছেন। তিনি লাহোরের বাড়ি থেকে পালালেন। কানপুরে এলেন। জয়চাঁদ বিদ্যালংকার মশাই গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থীকে চিঠি লিখে দিয়েছিলেন ভগতের হাতে। কানপুরে তাঁর মাধ্যমে পরিচয় ঘটল কয়েকজন সহযোদ্ধার সঙ্গে যাঁরা 'হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন'এর সদস্য ছিলেন। গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী কানপুর থেকে *প্রতাপ* নামে একটি জাতীয়তাবাদী

সাপ্তাহিক বের করতেন। ভগৎ সিং সেখানে বলবন্ত নামে পত্রিকায় কাজ করতে লাগলেন। এবার তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটল বটুকেশ্বর দত্ত, শিব বর্মা এবং বিজয় কুমার সিংহের। এখানে তাঁর সঙ্গে তৎকালীন কমিউনিস্ট নেতা অজয় ঘোষের পরিচয় হয়। অজয় ঘোষ প্রথম পরিচয়ে ভগৎ সিং সম্পর্কে তাঁর ধারণা লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর বই, *Bhagat Singh and His Comrades*-এ।

> সালটা বোধহয় ১৯২৩ হবে, কানপুরে বটুকেশ্বর দত্ত তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়। খুব সাধারণ একটা ছেলে। রোগা, লম্বা, পরণে নোংরা জামাকাপড়, খুব লাজুক, শান্ত, একেবারে গ্রাম্য একটা ছেলে, ভালোভাবে কথাবার্তা বলতে পারে না, চেহারার মধ্যে কোনো ঝকঝকে ভাব নেই এবং দেখেই মনে হয় নিজের মধ্যে ভীষণভাবে আত্মবিশ্বাসের অভাব আছে।

পরে অজয় ঘোষ আবার ভগৎ সিং সম্পর্কে লিখছেন,

> ১৯২৮-এর একদিন, এক তরুণ যুবক আমার সঙ্গে দেখা করতে আমার ঘরে এল। তাঁকে দেখে আমি অবাক। এ যে ভগৎ সিং! কিন্তু কত পালটে গেছে এই ক'বছরে। এখন তাঁর চেহারায় একটা ঝকঝকে ভাব, মুখে বুদ্ধিমত্তার ছাপ টিকরে বেরোচ্ছে, চোখ দুটি থেকে যেন আগুন ঝরে পড়ছে। এখন তিনি অনেক কথা বলেন। তাঁর কথাবার্তার ধার-যুক্তি এখন যে কোনো মানুষকে মুগ্ধ করতে বাধ্য। আমার মনে হল আমাদের পার্টি এতদিন পরে তাঁর হাত ধরে এক নতুন দিন দেখতে চলেছে।

১৯২৫-এ তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্য তাঁর বাবা তাঁর কাছে চিঠি লিখে ক্ষমা চাইলে ভগৎ সিং ফিরে এলেন লাহোরে। এর একবছরে মধ্যে তিনি তাঁর সমভাবাপন্ন যুবকদের নিয়ে স্থাপন করলেন 'নবভারত সভা' নামে এক বিপ্লবী সংগঠন। এপিল ১৯২৬-এ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হল সোহন সিং যোশের। (সোহন সিং যোশ ১৯২১-এ মোহান্তদের হাত থেকে গুরুদ্বার উদ্ধারের আন্দোলনে বাব্বর আকালি দলের অন্যতম নেতা ছিলেন। মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি তিনবছর জেল খাটেন। নভেম্বর ১৯৩৩-এ জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।)

৮-৯ সেপ্টেম্বর, ১৯২৮ দিল্লীতে ফিরোজ শাহ কোটলা ময়দানে যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজপুতানা এবং বাংলার বিপ্লবীদের এক সভা হল। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বটুকেশ্বর দত্ত, বিজয়কুমার সিংহ, যতীন্দ্রনাথ দাস, যশপাল, চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগবতীচরণ ভোরা, রাজগুরু, মহাবীর সিং এবং ভগৎ সিং। এই অধিবেশনেই দলের নাম পরিবর্তন করে 'হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাব্লিকান অ্যাসোসিয়েশন' রাখা হল। এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য হল সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে 'ফেডারেল রিপাব্লিক অফ ইউনাইটেড স্টেটস অফ ইন্ডিয়া' গঠন করা যেখানে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটাধিকারের অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে সরকার নির্বাচিত হবে। চন্দ্রশেখর আজাদকে চিফ কম্যান্ডার করে এই দলের অংশ হিসাবে 'হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাব্লিকান আর্মি' নামে একটি সেনাবাহিনী গঠন করা হল। এই আলোচনাসভার সিদ্ধান্ত মতে পুলিশের হাত থেকে পরিচয় লোকানোর জন্য ভগৎ সিং ফিরোজপুরে গিয়ে এক চিকিৎসকের সাহায্য নিয়ে তাঁর চুল কেটে ফেললেন এবং গোঁফ দাড়ি সব কামিয়ে ফেললেন। (এই ঘটনার সাক্ষী ছিলেন ভগতের সঙ্গী, জয়গোপাল যিনি পরে বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজসাক্ষী হলে, স্যন্ডার্স হত্যা মামলায় এই ঘটনাটির বিবরণী আদালতে পেশ করেন।)

১৯২৭-এর অক্টোবরে স্যার জন আলসব্রুক সাইমন ভারতবর্ষে এলেন। সাইমন কমিশনের কাজ ছিল সাংবিধানিক সংস্কার করে ভারতকে কতটা ক্ষমতা হস্তান্তর করা যেতে পারে তার পর্যালোচনা করে রিপোর্ট দেওয়া। ব্রিটিশ কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৯১৯ (মন্টেগু-চেমস্ফোর্ড বা মন্টফোর্ড সংস্কার) মোতাবেক প্রতি দশ বছর অন্তর এই কাজ করা বাধ্যতামূলক ছিল। প্রথমদিকে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ব্রিটিশদের বিশ্বস্ত ছিলেন এবং নিজে মনে করতেন ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে তাঁর অহিংস মন্ত্রের প্রয়োগে সামান্য হলেও ভারতীয়রা নিজেরাই নিজেদের শাসন করার অধিকার পাবে। তিনি

মনে করতেন শুধুমাত্র স্বায়ত্ত্বশাসন পেলেই আপাতত চলবে কিন্তু কংগ্রেসের ভেতরেই তখন পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আওয়াজ উঠে গেছে। সাইমন কমিশনের ওপর বয়কট ইত্যাদির চাপ সৃষ্টি করেও পরে ৩১ ডিসেম্বর, ১৯২৯-এ অবশ্য স্বায়ত্ত্বশাসনের অধিকারটুকুও পাওয়া গেল না।

৩০ অক্টোবর, ১৯২৮। সাইমন বোম্বে থেকে লাহোরে এলেন। ভগৎ সিং এবং তাঁর কমরেডরা স্বায়ত্ত্বশাসনের পক্ষে ছিলেন না, তাঁরা চেয়েছিলেন পূর্ণ স্বাধীনতা। তবু গান্ধীজীর সাইমন কমিশন বয়কটের ডাকে তাঁরা সাড়া দিলেন। কমিশনের ভারতে আগমনের বিরুদ্ধে লাহোর রেলস্টেশনের রাস্তায় এক বড়ো মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন লালা লাজপত রাই। ওইদিন, সাইমন কমিশনের সদস্যরা রেলস্টেশনের বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে মিছিলে অংশগ্রহণকারী জনতা এগিয়ে আসে। মিছিলে থেকে শ্লোগান ওঠে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'। (১৯২১-এ কংগ্রেস নেতা তথা উর্দু কবি, মৌলনা হসরত মোহানী এই শব্দবন্ধটির জন্ম দিলেও এটিকে জনপ্রিয় করেন ভগৎ সিং।) ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' শ্লোগান উঠল। ভগৎ সিং এই শ্লোগান তুলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি নতুন শব্দবন্ধ যোগ করলেন, এক নতুন মাত্রা যুক্ত হল স্বাধীনতার লড়াইয়ে। এই শ্লোগান বিপ্লবের ডাক পাঠালো, বিদ্রোহের এক নতুন অর্থ দিল। মিছিল থেকে একইসাথে অবাধ্যতার ঢেউ উঠল, 'সাইমন কমিশন গো ব্যাক', 'আংরেজ মুর্দাবাদ'। মিছিল সমবেত কণ্ঠে আওয়াজ তুলল –

হিন্দুস্তানি হ্যায় হাম, হিন্দুস্তান হামারা,
মুর যাও, সাইমন, যাঁহা হ্যায় দেশ তুমারা।

এই মিছিলের আগেও লালা লাজপত রাইয়ের সঙ্গে ভগৎ সিং অনেক মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন। ভগৎ লালাজীকে তাঁর উগ্র হিন্দুপ্রীতির জন্য বিশেষ পছন্দ করতেন না। লাজপত রাইও তাঁকে 'রাশিয়ার চর' বলে নিন্দা করতেন। তাছাড়া লাজপত বিপ্লবীদের 'দায়িত্বজ্ঞানহীন যুবকের দল' বলে মনে করতেন। লাজপত চাইতেন দুটি ভারতবর্ষ – হিন্দু ভারতবর্ষ এবং মুসলিম ভারতবর্ষ। ভগৎ সিং সম্পূর্ণ অর্থে নাস্তিক ছিলেন। লাজপত রাইয়ের এই মতবাদ কোনদিন তিনি মেনে নিতে পারেননি। ভগৎ সিং মনে করতেন দেশ স্বাধীন হলে দুই সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের ফলেই তা হবে এবং এই দুই সম্প্রদায়ের সম্মিলিত চেষ্টায় জন্ম নেবে নতুন ভারতবর্ষ। মতের অমিল থাকলেও একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে লালা লাজপত রাইকে তাঁর নিষ্ঠা ও দেশভক্তির জন্য অসম্ভব শ্রদ্ধা করতেন ভগৎ।

লালা লাজপত রাইয়ের নেতৃত্বে প্রচুর মানুষ লাহোর রেলওয়ে স্টেশনের রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে শ্লোগান তুলছেন। বিশাল পুলিশবাহিনী মিছিল সরাতে চেষ্টা করছে। লাজপত রাই চিৎকার করে বললেন, "সরকার যদি সাইমন কমিশনকে এই বিশাল বিরুদ্ধতার মিছিল দেখতে দিতে না চান তাহলে কমিশনের সদস্যদের চোখ বেঁধে সরকারি ভবনে নিয়ে যাওয়া হোক"। এরপর পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট, জে. এ. স্কটের আদেশে পুলিশ লাঠি চার্জ করলে লালা লাজপত মারাত্মকভাবে আহত হন এবং এই আঘাতের ফলে অসুস্থ হয়ে কিছুদিন পর তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। এই ঘটনায় আগুনে যেন ঘি পড়ল। সারা দেশে নিন্দার ঝড় বয়ে গেল। গান্ধী-নেহেরু – এঁরা দুজনে এই ঘটনার নিন্দা করে বিবৃতি দিলেও এর বেশি কিছু করার কথা ভাবলেন না। অনেক পরে ১৯৩০-এ লাহোরে যেখানে লালা লাজপত রাইকে মারা হয়েছিল তার অনতিদূরে রবি নদীর তীরে জওহরলাল নেহেরু কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন করে লালাজীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পূর্ণ স্বরাজের দাবি তুললেন। গান্ধীজীও ততদিনে একটু একটু করে বুঝতে শুরু করেছেন যে ব্রিটিশরা কখনোই ভারতীয়দের হাতে কোনোধরনের ক্ষমতা তুলে দেবে না।

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক

১৭ নভেম্বর, ১৯২৮ লালা লাজপত রাই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মারা যাবার আগে তিনি ব্রিটিশ সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলে গেলেন, "এরপরে (লাহোরের ঘটনার পরে) যদি যুবসমাজ দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আক্রমণাত্মক কিছু করে বসে আমি আশ্চর্য হব না"। অন্যদিকে কিন্তু বিপ্লবীরা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। শ্লোগান উঠল 'খুন দা বদলা খুন'। কলকাতায় চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী বাসন্তীর দেবী ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, "দেশের মানুষ এবং যুবকরা কি এখনো বেঁচে আছে? এই দেশের একজন মহিলা নাগরিক হিসাবে আমি পরিস্কার এই ঘটনার জবাব চাই"। ভগতের মনে পরে গেল জালিয়ানওয়ালাবাগের পৈশাচিক নরহত্যার ঘটনা। ডায়ার সেই ঘটনা থেকে রেহাই পেয়েছিলেন কিন্তু স্কটের বেলায় তা হতে দেওয়া যায় না। বিপ্লবীরা লালা লাজপত রাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য লাহোরের পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট স্কটকে মারার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন।

দুর্গাভাবী

১০ ডিসেম্বর, ১৯২৮। বিপ্লবী, ভগবতীচরণ ভোরার স্ত্রী, আরেক শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী, দুর্গাদেবির সভাপতিত্বে এইচএসআরএ'র একটি আলচোনাসভার আয়োজন হল। এই আলোচনাসভাতেই সিদ্ধান্ত হল স্কটকে দুনিয়া থেকে সরাতে হবে। লাজপত রাইয়ের প্রাণের দাম তাঁকে চোকাতেই হবে। ভগৎ সিং বাংলার উদাহরণ টেনে বললেন যে এই ধরনের বেশ কিছু ঘটনা ইতিমধ্যে বাংলার বিপ্লবীরা ঘটিয়েছেন এবং কিছু নিপীড়ক ব্রিটিশকে হত্যা করেছেন। আলোচনার শুরুতে দুর্গাদেবী আহবান জানালেন কে বা কারা স্কটকে হত্যা করতে চায়, তারা যেন হাত তোলেন। এই কথা বলে তিনি নিজেই প্রথমে হাত তুললেন। কিন্তু কমরেডরা কিছুতেই তাঁদের প্রিয় দুর্গাভাবীকে এই কাজ করতে দিতে রাজি নয়। আবার এই সময় তাঁর স্বামী, ভগবতীচরণও তখন লাহোরে উপস্থিত নেই, তিনি গেছেন কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিতে। একান্ত অনিচ্ছায় দুর্গাদেবী নিজের হাত নামালেন। ভগৎ সিং, সুকদেব, রাজগুরু, চন্দ্রশেখর আজাদ এবং ওই আলোচনাসভায় উপস্থিত অন্যান্য বিপ্লবীররা সকলেই এবার হাত তুললেন। ইতিমধ্যে সুকদেব দলের মধ্যে শুধু নয় সারা দেশে বিশেষত একজন দক্ষ কৌশলবিদ এবং দক্ষ সংগঠক হিসাবে পরিচিত। ফলে কেউই চাইলেন না এরকম একটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজে সরাসরি সুকদেব জড়িত থাকুক। তিনি এরপর নিজেই ভগৎ সিং, রাজগুরু, চন্দ্রশেখর আজাদ এবং জয় গোপালকে বেছে নিলেন। এরপর পুরো পরিকল্পনা ছকে ফেলা হল। অপারেশন করবেন ভগৎ সিং, তাঁকে কভার দেবেন রাজগুরু, হত্যাকাণ্ড সারা হয়ে গেলে তাঁদের পালাবার ব্যবস্থার দায়িত্বে থাকবেন আজাদ এবং সর্বকনিষ্ঠ কমরেড, জয়গোপালের কাজ হবে পুলিশ স্টেশনে স্কট কখন আসবেন তার খবর এই তিনজনকে দেওয়া। ১৭ ডিসেম্বর, ১৯২৮ – লালা লাজপত রাইয়ের মৃত্যুর ঠিক একমাস পূরণ হবে। ওই দিনটিকেই বেছে নেওয়া হল স্কট হত্যার জন্য। এই মর্মে ১৫ ডিসেম্বর এই চারজন হত্যাকাণ্ডের একটা মহড়াও দিয়ে নিলেন। ভগৎ সিং লাল কালিতে 'SCOTT KILLED' লিখে একটা পোস্টারও তৈরি করে ফেললেন। তখন কি আর তিনি ভেবেছিলেন যে প্রথমত তাঁর গুলিতে স্কটের বদলে প্রাণ দিতে হবে স্যন্ডার্সকে এবং যার সাহায্য নিয়ে সেদিন তিনি এই পোস্টার লিখলেন, এইচএসআরএ'র কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য,

হংসরাজ ভোরা, যিনি ওই পোস্টারটির চারখানা কপি বানালেন, তিনি বেইমানি করে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় রাজসাক্ষী হবেন!

১৭ ডিসেম্বর, ১৯২৮। স্কট সেদিন ইংল্যান্ড থেকে আগত তাঁর শাশুড়ি-মাকে বাড়িতে নিয়ে আসবেন বলে ছুটি নিয়েছিলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার জয়গোপালের ওপর দায়িত্ব ছিল স্কটের আগমনবার্তা জানান দেবার, অথচ তিনি স্কটকে চিনতেন না এবং সেই কথা কাউকে জানাবার প্রয়োজনও বোধ করেননি। তিনি এই মহান কাজের দায়িত্ব পেয়ে এতোটাই উত্তেজিত ছিলেন যে তিনি এই কথা বলে এই মহতি কাজ থেকে নিজেকে বিযুক্ত করতে চাননি। এই দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পিত হলেও তিনি তারপরেও স্কটকে চিনে রাখার প্রয়োজন বোধ করেননি। তার ফলে যা গণ্ডগোল হবার তাই হল। যথাসময় সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট স্যন্ডার্সকে স্কট বলে ভুল করলেন জয়গোপাল। সকাল ১০-টায় খবর গেল যে স্কটসাহেব অফিসে ঢুকেছেন। পরিকল্পনামাফিক বিপ্লবীরা যথাযথ পজিশন নিলেন। দুপুরবেলা স্যন্ডার্স পুলিশ স্টেশন থেকে বেরোলেন। যখন তিনি তাঁর মটর সাইকেলে চড়তে যাবেন রাজগুরু তাঁর মসার পিস্তল থেকে গুলি চালালেন। ভগৎ সিং চিৎকার করে উঠলেন, "না, না এই লোকটি সে নয়"। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে গেছে। রাজগুরুর এক গুলিতেই স্যন্ডার্স সাহেবের ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেছে। ভগৎ সিং অগত্যা তাঁর রিভলবার থেকে ওই মৃতদেহের ওপর আরো কিছু গুলি উগরে দিলেন। এরপর তাঁরা পরিকল্পনামাফিক কাছেই ডিএভি কলেজে ঢুকে পড়লেন। এই গুলিগোলার আওয়াজ শুনে পুলিশ স্টেশন থেকে পুলিশ ইন্সপেক্টর ফার্ন বেরিয়ে এসেছিলেন কিন্তু আজাদের ছোঁড়া দুটি গুলি তার মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে যেতে তিনি দৌড়ে আবার অফিসের মধ্যে ঢুকে যান। হেড-কনস্টেবল ছানান সিং তাড়া করলেন ভগৎ সিং, রাজগুরু এবং আজাদকে। আজাদ বারেবারে চিৎকার করে তাকে ফিরে যেতে বললেন। বললেন, আমরা কোনো ভারতীয়কে মারতে চাইনা। কিন্তু শেষে নিরুপায় হয়ে রাজগুরু গুলি চালালে সে মারা যায়। সেদিনের সেই দৃশ্যের সাক্ষী ছিলেন অনেকেই। ঊর্দু কবি এবং বিপ্লবী, ফৈয়জ আহমেদ ফৈয়জও ছিলেন সেদিনের ঘটনার সাক্ষী।

চন্দ্রশেখর আজাদ

রাজগুরু, চন্দ্রশেখর আজাদ এবং ভগৎ সিং এই মিশন সম্পন্ন করে ডিএভি কলেজ প্রাঙ্গনে ঢুকে দেয়াল টপকে তাঁদের হস্টেলের কম্পাউন্ডে ঢুকে পড়লেন। এরপর তাঁরা যখন দেখলেন যে কেউ তাঁদের লক্ষ করছে না, তখন ধীরেসুস্থে হেঁটে তাঁরা হস্টেলের দিকে গেলেন। সেখানে আগে থেকেই আজাদ হস্টেলের টয়লেটের দেয়ালে তিনটি সাইকেল হেলান দিয়ে রেখে গিয়েছিলেন। এবার তাঁরা ধীরেসুস্থে খুব স্বাভাবিকভবে সাইকেল চালিয়ে লাহোরের মোজাং রোডের আস্তানায় ফিরে গেলেন। (মোজাং রোডের একটি ভাড়া করা বাড়িতে ছিল বিপ্লবীদের আস্তানা। এই বাড়িটির অবস্থান ছিল একটি

কবরখানার পাশে, জায়গাটা নির্জন এবং পুলিশ ও সাধারণ মানুষের নজরের বাইরে, তাই বিপ্লবীরা এই আস্তানাটি নিরাপদ বলে বেছে নিয়েছিলেন।) পুলিশবাহিনী যখন ডিএভি কলেজের হোস্টেলে রোল কল করছে, হোস্টেল এবং কলেজ তছনছ করছে, শহরের নানা প্রান্তে ব্যাপকভাবে খানাতল্লাশি করছে, তখন মোজাং রোডের বাড়িতে বসে আছেন তিন বিপ্লবী। জয়গোপাল স্কটের আসার খবর দিয়েই বাড়ি ফিরে গেছে। তাঁরা তাঁকে এই ভুল খবরটা দেবার ফলে স্কটের বদলে যে স্যান্ডার্সকে মারা হল তার জন্য কিছু বলারও সুযোগ পেলেন না।

ভগৎ সিং আগে থেকে তৈরি করে রাখা পোস্টারগুলিতে তড়িঘড়ি স্কটের নামের ওপরেই কালি বুলিয়ে স্যান্ডার্স করে দিলেন। সারা লাহোর 'হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাব্লিকান আর্মি'র কম্যান্ডার-ইন-চিফ, বলরাজের নামে পোস্টারে ছেয়ে গেল – 'জে. পি. স্যন্ডার্স মৃত – লালা লাজপত রাই হত্যার প্রতিশোধ'। এই পোস্টারের মুল কথা ছিল 'খুন কা বদলা খুন'। অত্যাচারী শাসকদের এই প্রচারপত্রে সতর্ক করে বলা হল – দেশের নিপীড়িত মানুষকে অত্যাচার করলে এইভাবেই হাতেনাতে তার ফল পেতে হবে। ১৮ ডিসেম্বর, ১৯২৮-এর এই পোস্টারটি 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক' বলে শেষ হয়েছে।

এখন তিন বিপ্লবী মোজাং রোডের বাড়িতে বসে ভাবতে লাগলেন কীভাবে লাহোর ছেড়ে পালানো যায়। এতদিন তাঁরা এই হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা নিয়ে এতটাই উত্তেজিত ছিলেন যে কেউই ভেবে দেখেননি এরপর কী হবে। কিন্তু লাহোর ছেড়ে যেভাবেই হোক পালাতেই হবে। যখন তাঁরা পালানো নিয়ে চিন্তা করছেন, ঠিক সেইসময়ে সুকদেব এলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন দুর্গাদেবীর বাড়িতে যেতে। যেই বাড়িতে দুর্গাদেবী থাকতেন, সেই বাড়ি রাত ১১-টা থেকে সকাল ৫-টা পর্যন্ত পুলিশের নজরে থাকে। তাই ঠিক হল পরদিন সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।

পরদিন ভোররাতে তিনজন বেরিয়ে পড়লেন দুর্গাদেবীর বাড়ির উদ্দেশ্যে। প্রধান সড়ক ছেড়ে তাঁরা ধরলেন ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে পথ। তুষারপাতে তাঁদের সারা শরীর সাদা হয়ে যাচ্ছে। ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে তিন যুবক ফসল মাড়িয়ে চলেছেন। ওইদিকে ভোর হয়ে আসছে। গবাদি পশুর গলায় বাঁধা ঘন্টার ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ফসলের আড়াল থেকে দেখা যাচ্ছে দুরে কুয়ো থেকে জল তোলা হচ্ছে, কেউ কেউ ওই ঠাণ্ডার মধ্যে চান সেরে নিচ্ছেন আবার কিছু চাষী মাঠেও নেমে পড়েছেন। এই ক্ষেতির মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভগৎ সিংয়ের মনে পড়ছে নিজেদের বাড়ির ক্ষেত-খামারের কথা। মনে পড়ছে সেই দিনগুলির কথা যখন বাড়িতে এসে পৌঁছাতো নিজেদের ক্ষেতে চাষ করা গম ও অন্যান্য কৃষিজাত সামগ্রী। যাঁরা তাঁদের ক্ষেতিতে চাষ করত সেইসমস্ত চাষীদের ওপর তাঁর মার খুব দরদ ছিল। কতবার ভগৎ সিং তাঁর বাবাকে বলেছেন যে সব চাষীরা ওই জমিগুলিতে চাষ করে ফসল ফলাচ্ছে তাঁদের জমিগুলি দিয়ে দিতে। ভগতের এই কথায় তাঁর বাবা প্রচণ্ড রেগে যেতেন। কিন্তু ভগৎ সিং বিশ্বাস করতেন, ফসল যার জমি তার।

সকাল পাঁচটার একটু পরে পুলিশ যখন দুর্গাদেবীর বাড়ি থেকে বিদায় নিল, তিন কমরেড তখন বাড়ির দরজায় ঘা দিল। দুর্গাদেবী কিছুক্ষণ দোনামনা করে দরজা খুলে দেখেন সামনেই ভগৎ সিং দাঁড়িয়ে, তাঁর পেছনে রাজগুরু এবং আজাদ। দূরগাদেবীকে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা জানালে তিনি বলেন যে তিনি সবই জানেন স্কটের বদলে যে স্যান্ডার্সকে মারা হয়েছে তাও তিনি বুঝেছেন কিন্তু এর ফলে তাঁদের সাহসিকতাকে অসম্মান করা যায় না। এরপর তাঁরা দুর্গাদেবীকে সুকদেবের কথা বলেন, তাঁদের যেভাবে হোক শহর ছেড়ে পালাতে হবে এবং দুর্গাদেবী যেন তাঁদের সাহায্য করেন। সুকদেবের পরিকল্পনামাফিক কিছুক্ষণের মধ্যে সমস্ত প্রস্তুতি নেওয়া হয়ে গেল। কলকাতায় ভগবতীচরণ ভোরার কাছে টেলিগ্রাম চলে গেল যে দুর্গাদেবী তাঁর ভাইকে নিয়ে কলকাতায় আসছেন। দুর্গাদেবীর সঙ্গে যাবেন ভগৎ সিং এবং রাজগুরু। চন্দ্রশেখর আলাদাভাবে মথুরাগামী এক তীর্থযাত্রীদের দলে ভিড়ে তাদের সঙ্গে ভজন গাইতে গাইতে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে শহর ছাড়লেন। চন্দ্রশেখর পরে ২৫ ডিসেম্বর দিল্লীতে আসেন।

ঘটনা ঘটার পরেপরেই সারা শহর জুড়ে শুরু হয়েছে চিরুনি তল্লাশি। শহর থেকে বেরনোর সমস্ত পথ বন্ধ। কড়া নজর রাখা হয়েছে লাহোর স্টেশনে। বিকেলের দিকে ইউরোপীয় পোশাকে সুন্দর দেখতে রঞ্জিত নামে এক স্মার্ট যুবক

তাঁর স্ত্রী সুজাতা এক সদ্যজাত শিশু সন্তানকে নিয়ে লাহোর স্টেশনে এলেন, লক্ষ্ণৌ যাবার ট্রেনের টিকিট কেটে ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাস কামরায় উঠলেন, সাথে তাঁর গৃহভৃত্য। কোনো বড়ো সরকারি অফিসার যেন বদলি হয়ে বাক্স-প্যাঁটরাসহ শহর ছাড়ছেন। পুলিশ বুঝতেই পারল না, যাকে ধরতে তারা দাঁড়িয়ে আছে, সেই ভগৎ সিং তাদের চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর স্ত্রী সেজেছিলেন স্বয়ং দুর্গাভাবী, কোলে নিজের শিশুপুত্র শচীন। ভৃত্যটি আর কেউ না, তিনি শিবরাম রাজগুরু। প্রথমে ট্রেনে করে লক্ষ্ণৌ, সেখানে তাঁরা একটা হোটেলে উঠলেন, পরদিন সকালে সেখান থেকে তাঁরা কলকাতার দেরাদুন এক্সপ্রেস ধরলেন। ভগৎ সিং কেন না জানি নিশ্চিত ছিলেন যে স্যন্ডার্স হত্যা সম্পর্কে তাঁকে আর রাজগুরুকে কেউ জড়াতে পারবে না। তিনি ঠিকই ভেবেছিলেন ব্রিটিশ পুলিশের হাতে সেইসময় এইচআরএসএ'র পোস্টার ছাড়া আর কোনো প্রমাণ ছিল না।

কলকাতায় ভগৎ সিং

ট্রেন হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পৌঁছাল। স্টেশনে কিছু পুলিশ ছিল বটে কিন্তু তারা তাদের সাধারণ ডিউটি করছিল। স্টেশনে তাঁদের নিতে ভগবতীচরণ ভোরা নিজেই এসেছিলেন। তিনি উৎসুক ছিলেন জানতে যে কে তাঁর স্ত্রীর ভাই, কারণ তিনি ভালোভাবেই জানতেন যে দুর্গাদেবীর কোনো ভাই নেই। তিনি ইতিমধ্যে কলকাতার কাগজ থেকে স্যন্ডার্স হত্যার কথা জেনেছিলেন, সন্দেহ করেছিলেন যে ভগৎ সিং নিশ্চয়ই তাঁর শ্যালক পরিচয়ে কলকাতায় আসছেন। কলকাতায় ভগবতীচরণের মাড়োয়ারি বন্ধু, ছাজ্জু রামের আলিপুরের বাংলোতে থাকার ব্যবস্থা হল। এরপর ভগৎ সিং ট্রামে করে কলকাতা সফর করতে লাগলেন। এখানে তাঁর মানুষে-টানা রিকশা দেখে খুব দুঃখ হয়েছিল। এখানে তাঁর নাম হরি। তিনি বাঙালিদের মতো ধুতি-শাল পরা অভ্যেস করে ফেলেছেন।

ভগৎ সিং কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিলেন। সেখানে আলোচনার বিষয়বস্তু শুনে অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করলেন। উদ্দেশ্য যেখানে ব্রিটিশদের হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়া সেখানে কংগ্রেসের আলোচনার বিষয় হল কতটা স্বায়ত্বশাসনের অধিকার ব্রিটিশদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। শর্তযুক্ত ক্ষমতা কি সত্যি কোনো ক্ষমতা পাওয়া, এই প্রশ্ন ভগতের মনে দেখা দিল। ব্রিটেনের শাসনে থেকে যে কোনো ধরনের ক্ষমতাকে কি সত্যি কোনো ক্ষমতা পাওয়া বলে? তাহলে ভারতবর্ষ কি সত্যি কোনোদিন এই সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্তি পাবে না? এই কংগ্রেস অধিবেশনে দেশের মানুষের আর্থিক উন্নতি ও সার্বিক পরিবর্তন নিয়ে কাউকে কোনো কথা বলতে না দেখে অত্যন্ত বিরক্তিবোধ করে তিনি অধিবেশন ছেড়ে সিনেমা হলে চলে যান এবং সেখানে সৌভাগ্যক্রমে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ওপর নির্মিত চলচ্চিত্র 'Uncle Tom's Cabin' পেয়ে যান।

ভগৎ সিং বরাবরই কংগ্রেসকে বড়লোকেদের পার্টি বলেই মনে করতেন। এঁরা কখনো গরিব চাষী ও শ্রমিকদের কথা বলে না, কীভাবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও দেশের শোষকদের হাত থেকে তাঁরা মুক্তি পেতে পারে সেই কথা তাদের কোনো প্রস্তাবেই আলোচিত হয়নি। এরা যে শুধুমাত্র জমিদারশ্রেণির প্রতিনিধি সেই বিশ্বাসে অটল ছিলেন ভগৎ সিং। কলকাতায় ভগৎ সিয়ের সঙ্গে পরিচয় হল প্রফুল্ল গাঙ্গুলি, জ্যোতিষ ঘোষ, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং যতীন্দ্রনাথ দাসের মতো বিপ্লবীদের। যাঁদের সঙ্গে ভগৎ সিংয়ের আলাপ হল তাঁদের মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলে ভগৎ সিংয়ের ভালো লাগল। সেই সময়ে বাংলার বিপ্লবীরা ব্যক্তিহত্যার পথ থেকে সরে এসেছেন। পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের ব্যক্তিহত্যার নীতি নিয়ে নিজেদের মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্ক হল। ভগৎ সিং বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে এই ব্যক্তিহত্যা শুধুমাত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের একটা পথ, কখনোই তা শেষকথা নয়, শেষকথা হল একমাত্র 'বিপ্লব'। ভগতের খুব ইচ্ছে ছিল কলকাতায় থাকাকালীন বোমা বানানো শেখার। তিনি ত্রৈলোক্যনাথের কাছে বোমা এবং তা বানানোর কৌশল জানতে চাইলেন। ত্রৈলোক্যনাথ ততদিনে ভগতের মধ্যে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের সন্ধান পেয়ে গেছেন, তিনি প্রথম দিকে ফেরালেও পরে ভগৎ সিংকে রিভলবার ও কার্তুজের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কলকাতায় যতীন্দ্রনাথ দাসের কাছে তিনি

অনুরোধ করেন তাঁকে বোমা বানানোর কৌশল শেখাবার জন্য। যতীন তাঁকে বলেন যে যেহেতু তাঁর পার্টি ব্যক্তিহত্যায় বিশ্বাস করে না তাই তিনি বোমা বানানোর কৌশল জানা সত্ত্বেও পার্টি নীতির বিরুদ্ধে গিয়ে ভগতকে বোমা বানানোর কৌশল শেখাতে পারবেন না। অবশ্য পরে যতীন ভেবে দেখলেন যে উচ্চতর কোনো ব্রিটিশ পদাধিকারীকে হত্যা করলে তা একদিকে যেমন সাহসিকতার পরিচয় দেয় অন্যদিকে বিপ্লবী কার্যকলাপে তরুণদের উৎসাহিতও করে। আবার এর ফলে ব্রিটিশ প্রশাসনের মধ্যে একটা ভীতিসঞ্চারও হয়। তিনি তাঁর অবস্থান থেকে সরে এলেন। ভগৎ সিং ও যতীন দাসের মধ্যে বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী হল।

রুশ বিপ্লবের অভিঘাত তখনও বিপ্লবীদের মধ্যে তাজা ছিল। কলকাতায় থাকাকালীন বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা হত। রুশ বিপ্লবের মতবাদ খুব ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হচ্ছিল এবং তা তখন নব্য-বিপ্লবীদের মনে গভীরভাবে গেঁথে বসছিল। এখন তাঁরা মনে করছেন যে গণতন্ত্র শুধুমাত্র তাত্ত্বিকভাবে রাজনৈতিক এবং আইনি সমতার কথা বলে। কিন্তু বাস্তবে এটি অপর্যাপ্ত নয়। যতদিন পর্যন্ত সমাজে অর্থনৈতিক অসাম্য থাকবে, ততদিন পর্যন্ত রাজনীতি এবং আইনি ব্যবস্থায় কখনোই সাম্যাবস্থা আসতে পারে না। যতদিন পর্যন্ত শাসক শ্রেণি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, চাকরি দেওয়া থেকে শুরু করে প্রেস এবং সাধারণ মানুষের মতামত দেবার জায়গাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করবে; যতদিন পর্যন্ত প্রশিক্ষিত সরকারি চাকরিজীবীদের ওপর শাসক শ্রেণির একচেটিয়া অধিকার থাকবে; যতদিন পর্যন্ত নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করার জন্য তাদের হাতে অপর্যাপ্ত টাকাপয়সার জোগান থাকবে; যতদিন পর্যন্ত শাসক শ্রেণি আইন প্রণয়ন করবে; যতদিন পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে আইনজ্ঞরা যাদের টাকার জোর আছে তাদের হয়ে মামলা লড়বে এবং মামলা জেতার জন্য সাধারণ মানুষকে প্রচুর খরচা করতে হবে – ততদিন পর্যন্ত সাম্য কথাটা অর্থহীন। – এটাই বিশ্বাস করতেন বিপ্লবীরা।

ব্রিটিশরাও ইতিমধ্যে বিপ্লবের আঁচ টের পেতে শুরু করেছিল। ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স ব্র্যাঞ্চের অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর, স্যার ডেভিড পেট্রি যিনি ভারতীয় পুলিশ বিভাগে ১৯০০ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত কাজ করেছেন, তিনি বলশেভিক বিপ্লবীদের সম্পর্কে লন্ডনে সরকারি মহলকে সতর্ক করেছিলেন। তৎকালীন গভর্নর জেনারেলের স্বরাষ্ট্র সচিব, স্যার জেমস ক্রেরারও বলেছিলেন ‘এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের পরিবেশ কমিউনিজমের মতবাদ এবং অনুশীলনে দূষিত হচ্ছে’।

কিছুদিনের মধ্যে ভগৎ সিং নিশ্চিত হলেন যে বাংলার বিপ্লবীরা পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের বোমা বানানোর কৌশল শেখাবেন। এরপরই তিনি কলকাতা ছেড়ে আগ্রার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

সার্ফরোসি কি তামান্না আব হামারে দিল মে হ্যায়

৮ এপ্রিল, ১৯২৯। নয়া দিল্লীর লেজিস্লেটিভ অ্যাসেম্বলিতে বেলা সাড়ে বারোটার সময় স্যার জর্জ শুস্টার ‘পাব্লিক সেফটি বিল’এ যে ভাইসরয়কে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে ঘোষণা করতে উঠবেন। এই বিলে যে কোনো সন্দেহজনক ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক করার ক্ষমতা দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে শিল্পে শ্রমিকদের ধর্মঘটকে নিষিদ্ধ করে ‘ট্রেড ডিসপিউটস বিল’ পাস হয়ে গেছে। বেলা এগারোটা একটু আগে খাঁকি জামা ও শর্টস পরে ভিজিটার্স পাশ হাতে দোতলায় অতিথিদের গ্যালারিতে ঢুকলেন ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্ত। গ্যালারিতে সেদিন বেশ ভিড়। বিভিন্ন গণ্যমান্য অতিথিদের মধ্যে বসেছিলেন স্যার জন সাইমন, যাঁর বিরুদ্ধে কিছুদিন আগে বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিলেন ভগৎ সিং। কাউন্সিল কক্ষে সেদিন উপস্থিত অন্যান্য জাতীয় নেতাদের মধ্যে মতিলাল নেহেরু, মহম্মদ আলী জিন্নাহ, এন. সি. কেলকার এবং এম. আর. জয়াকার। শুস্টার যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেই জায়গাটিকে লক্ষ করে পরপর দুটি বোমা ছোঁড়েন ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্ত। তাঁদের শুস্টারকে হত্যা করার উদ্দেশ্য ছিল না, ছিল ব্রিটিশ সরকারকে বিপ্লবীদের শক্তি সম্পর্কে জানান দেওয়া। সারা অ্যাসেম্বলিতে তখন হইচই পড়ে গেছে। ভগৎ এবং বটুকেশ্বরের ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’ এবং সাম্রাজ্য কা নাশ হো’ শ্লোগানে কেঁপে উঠছে অ্যাসেম্বলি চত্বর। এরপর তাঁরা অ্যাসেম্বলিতে প্রচারপত্র ছড়িয়ে দিয়ে নিজেরা স্বেচ্ছায় ধরা দিলেন।

বটুকেশ্বর দত্ত

৭ মে, ১৯২৯ দিল্লীর এডিএম আদালতে ভারতীয় পেনাল কোডের ৩০৭ নং ধারা এবং এক্সপ্লোসিভ অ্যাক্টে মামলা নথিভুক্ত হল, এবং শুনানি শুরু হল জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে। ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্তের হয়ে মামলা লড়লেন আসফ আলী। জুন মাসের ১২ তারিখে এক সপ্তাহের কম সময়ে মামলার রায় ঘোষিত হলে উভয়কে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল। এরপর জুনের ১৪ তারিখে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হিসাবে ভগৎ সিংকে মিয়ানওয়ালি জেলে এবং বটুকেশ্বর দত্তকে লাহোর বোরস্টাল জেলে নিয়ে যাওয়া হল। জেলে যাবার পরদিন থেকে দু জায়গাতে ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর, নিজেদের মধ্যে নেওয়া পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজনৈতিক বন্দির মর্যাদার দাবিতে অনশন ধর্মঘট শুরু করলেন। এরপর ১০ জুলাই, ১৯২৯ লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হওয়ার কিছুদিন আগে ভগৎ সিংকে লাহোর জেলে নিয়ে আসা হল। তখনও ভগৎ সিং অনশন ধর্মঘট চালিয়ে গেলেন। এই জেলে তাঁর সঙ্গে দেখা হয় উধম সিংয়ের, যিনি তাঁকে বলেছিলেন যে একদিন তিনি লন্ডনে যাবেন এবং জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের অন্যতম অপরাধী হিসাবে তৎকালীন পাঞ্জাবের লেফটেন্যান্ট গভর্নর, মাইকেল ও ডায়ারকে হত্যা করবেন। (এই কথা তিনি রেখেছিলেন ভগৎ সিং শহিদ হয়ে যাবার নয় বছর পর, ১৩ মার্চ, ১৯৪০-এ লন্ডনের কক্সটন হলে ডায়ারকে হত্যা করে।) ভগৎ সিংহের অনশন ধর্মঘটে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিভিন্ন জেলের অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দিরাও অনশন ধর্মঘটে যোগ দিলেন। সেইসময়ে সুদূর আন্দামানে সেলুলার জেলেও বাবা সোহন সিং এবং অন্যান্য গদর শিখ বন্দিরাও একই দাবিতে অনশন করছিলেন। সারা দেশে জেলের ভেতরে রাজনৈতিক বন্দিদের ওপর অত্যাচারের নানা কাহিনি ঘুরতে লাগল এবং তার সঙ্গে যখন যুক্ত হল তাঁদের অনশনের খবর তখন নানা জায়গায় সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে লাগল। মতিলাল নেহেরু জেলের ভেতরে রাজবন্দিদের দুর্দশা নিয়ে সরকারের নিন্দা করলেন, জওহরলাল নেহেরু জেলে গিয়ে ভগৎ সিং এবং অন্যান্য ধর্মঘটিদের সঙ্গে দেখা করলেন। মহম্মদ আলী জিন্নাহ সেন্ট্রাল অ্যাসেম্বলিতে ভারতীয় রাজবন্দি এবং ইউরোপীয় সাধারণ বন্দিদের মধ্যে যে আকাশ পাতাল পার্থক্য করা হয়, তাই নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। কিন্তু রাজবন্দিদের দাবি মেনে নিতে সরকার অনড়। বন্দিরাও অনশন ধর্মঘট তুলে নিতে রাজি নয়। নিজেদের তেজ অক্ষুণ্ণ রাখতে বিভিন্ন সলিটারি সেল থেকে ভেসে আসে গান – *কাভি উও দিন ভি আয়েগা, কে যাব আজাদ হাম হোঙ্গে*। এরপর কখন না জানি কোনো একজনের শুরু করা সেই গান সমবেত সঙ্গীতে রূপ নিয়ে নেয়।

যতীন্দ্রনাথ দাস, যাঁর সঙ্গে ভগৎ সিংহের পরিচয় হয় কলকাতায় এবং যিনি পরে এইচআরএসএ'তে যোগ দিয়ে বিপ্লবীদের বোমা তৈরি করতে শেখান, তিনিও তখন ভগৎ সিংদের সঙ্গে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামি হিসাবে লাহোর

জেলে বন্দি। তিনি মনে করতেন, অনশন ধর্মঘট এক সাংঘাতিক লড়াই; গুলির যুদ্ধে বা ফাঁসির দড়ি গলায় নিয়ে মৃত্যুর থেকেও এটি অত্যন্ত কঠিন। তিনি তাঁর কমরেডদের বোঝানোর চেষ্টা করলেন, যে দাবিতে অনশন ধর্মঘট করা হয়, তা না পেয়ে কোনো কারণে মাঝপথে যদি অনশন ছেড়ে দিতে হয় তাহলে তা বিপ্লবীদের মর্যাদার পরিপন্থী হয়। তাঁর সাবধান বাণীতে কেউ কান দিলেন না, সবাই অনশন করবেনই এই জেদ বহাল রাখতে দেখে যতীন নিজেও অনশনে যোগ দিলেন এবং অবশেষে ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯। দীর্ঘ ৬৩ দিন অনশন ধর্মঘটে থেকে শহিদ হলেন যতীন্দ্রনাথ দাস। সুভাষচন্দ্র বসু অত্যন্ত আঘাত পেলেন যতীন দাসের মৃত্যু সংবাদে। তিনি যতীনের মরদেহ কলকাতায় নিয়ে আসার জন্য ৬০০ টাকা পাঠালেন।

যতীন দাসের মৃত্যুর খবরে সারা দেশ যেন মর্মান্তিক এক আঘাতে চুপ করে গেল, সারা দেশ শোকস্তব্ধ। বিকেল ৪-টের সময় বোরস্টাল জেল থেকে যতীন দাসের মরদেহ নিয়ে শোকমিছিল শুরু হলে সারা লাহোর শহর যেন ভেঙে পড়ল। শোকমিছিল স্টেশনের পথে এগোতে শুরু করলে যতীন দাসকে শ্রদ্ধা জানিয়ে একে একে দোকানপাট বন্ধ হতে শুরু করল। এরপর যে যে স্টেশন দিয়ে যতীনের শবদেহবাহিত ট্রেনটি লাহোর থেকে কলকাতার দিকে এগোতে লাগল, প্রায় সমস্ত স্টেশনে প্রচুর মানুষ যতীন দাসকে শ্রদ্ধা জানাতে কাপড় দিয়ে মাথা ঢেকে মাথা নত করে দাঁড়িয়েছিল। মরদেহ কলকাতায় এসে পৌঁছালে সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী সেদিনের শেষযাত্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষের সমাগম হয়েছিল। বেসরকারি মতে মরদেহ যখন হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছাল তখনই সেখানে অন্তত পক্ষে ছয় লক্ষ লোকের জমায়েত হয়েছিল। কোনো বড়ো রাজনৈতিক দলের নেতা নয়, সেইসময়ে জনসংখ্যার নিরিখে এই জনসমাগম একজন বিপ্লবীর কাছে কতটা সম্মানের তা উপলব্ধি করলে গায়ে কাঁটা দেয়।

যতীন্দ্রনাথ দাস

যতীন দাসের মৃত্যুতে পাঞ্জাব লেজিস্লেটিভ অ্যাসেম্বলি থেকে দুজন পাঞ্জাবি নেতা, মহম্মদ আলম এবং গোপীচাঁদ ভার্গব পদত্যাগ করেন। মতিলাল নেহেরু সেন্ট্রাল অ্যাসেম্বলিতে মুলতুবি প্রস্তাব আনলেন এবং সরকারকে দ্বর্থহীন ভাষায় নিন্দা করলেন। জওহরলাল নেহেরু তখন কংগ্রেসের সভাপতি। তিনি এক বিবৃতিতে বললেন,

> As a matter of fact, I am not in favour of the hunger strike. I told to many young men who came to see me on this subject but I did not think it worthwhile to condemn the fast publicly. (Kuldip Nayar, *Without Fear*, Harper Collins Publishers India, 2012, p.97)

এর আগে সমস্ত জেলগুলিতে রাজবন্দিদের ন্যায্য দাবিতে যে অনশন ধর্মঘটের ঢেউয়ে সারা দেশের যুবসমাজ আন্দোলিত হচ্ছিল, তা কখনই গান্ধীজী মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। কংগ্রেস যখন তাদের বুলেটিনে সেন্ট্রাল অ্যাসেম্বলি হলে বিলি করা ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্তের হ্যান্ডবিল ছাপতে চেয়েছিল, তাতেও প্রবল আপত্তি জানান গান্ধীজী।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালীন সমগ্র আদালত চত্বর 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে কেঁপে উঠত। বিপ্লবীরা আদালত কক্ষে প্রবেশ করতেন সমবেত কণ্ঠে দেশাত্মবোধক গান গাইতে গাইতে –

সার্ফরোসি কি তামান্না আব হামারে দিল মে হ্যায়
দেখনা হ্যায় জোর কিতনা বাজুয়া-ই-কাতিল মে হ্যায়...
ওয়াক্ত্ আনে দে বাতা দেঙ্গে তুঝে ইয়ে আসমান
হাম আভি সে কেয়া বাতায়ে, কেয়া হামারে দিল মে হ্যায়।

আদালতের বিচারে ভগৎ সিংরা জানতেন কী রায় হবে। সবটাই যে সাজানো, মিথ্যে মামলা। তাঁরা কাঠগড়াকে বেছে নিয়েছিলেন তাঁদের রাজনৈতিক মঞ্চ হিসাবে। একদিন তাঁরা সেখানে কাকোরি ট্রেন ডাকাতিতে যুক্ত বিপ্লবীদের অভিবাদন জানিয়ে বক্তব্য রাখলেন। ২১ জানুয়ারি, ১৯৩০। লেনিনের জন্মদিনে বিপ্লবীরা প্রত্যকে আদালতে এলেন লাল স্কার্ফ জড়িয়ে। বিচারক তাঁর আসন গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে শ্লোগান উঠল – 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক, 'সংগ্রাম দীর্ঘজীবী হোক', 'লেনিনের নাম চিরঅক্ষয় হোক', 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক' এবং 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'। ক্রমশ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার খবর ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এটাই তো ভগৎ সিংরা চাইছিলেন। কানাডা, জাপান এবং আমেরিকা থেকে মামলা লড়ার জন্য এইচএসআরএ'র তহবিলে অনুদান আসতে লাগল। এমনকি পোল্যান্ড থেকেও এক ভদ্রমহিলা অনুদান পাঠালেন। ভারতীয়দের মধ্যে মতিলাল নেহেরু, রফি আহমেদ কিদোয়াই এবং যুক্তপ্রদেশের একটি ছোট রাজ্যের রাজা কলাকারার মাঝেমধ্যে আদালতে উপস্তিত থেকে বিপ্লবীদের প্রতি সহমর্মিতা পোষণ করতেন। ট্রাইব্যুন্যাল গঠনের পরে একদিন ১২ মে, ১৯৩০ আদালত কক্ষে ট্রাইব্যুনালের প্রধান কোল্ডস্ট্রিমের সামনে শ্লোগান উঠল 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'। কোল্ডস্ট্রিম শ্লোগান থামানোর আদেশ জারি করলেন। কিন্তু স্লোগান আরো বেড়ে গেল। এবার কোল্ডস্ট্রিম ক্ষেপে গিয়ে পুলিশকে আদালত কক্ষ খালি করতে নির্দেশ দিলেন। আদালত কক্ষ থেকে সবাইকে, এমনকি প্রেসের সাংবাদিকদেরও বের করে দেওয়া হল। এরপর কোল্ডস্ট্রিম পুলিশকে নির্দেশ দিলেন (যা ট্রাইব্যুনালের অন্যতম সদস্য বিচারপতি, হিল্টন সই করলেন) প্রত্যেক বন্দিকে হাতকড়া পরিয়ে আদালত থেকে বের করে নিয়ে যেতে। বিচারকদের নির্দেশে পুলিশ আসামিদের কাটরায় যেখানে ভগৎ সিংরা বসে ছিলেন তাঁদের হাতকড়া পরাতে গেলে, বিপ্লবীরা আপত্তি জানান, এরপর উভয়পক্ষে মারপিট বেঁধে যায়। ওই কাটরা থেকে পুলিশ তাঁদের বের করে এনে আদালতের মধ্যেই বিচারপতিদের সামনে বেধড়ক লাঠি দিয়ে পেটায়। অনেক বিপ্লবী মারাত্মক ভাবে আহত হন। বিচারপতি কোল্ডস্ট্রিম এবং হিল্টন অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকেন।

এই ঘটনার পর থকে ভগৎ সিংরা আদালতে সাজানো মামলায় হাজির হওয়া থেকে বিরত হলেন। কোল্ডস্ট্রিমের নির্দেশে এই কাজ ঘটায় তাঁকে অপসারিত হতে হয়, ট্রাইব্যুনালের অপর বিচারপতি ভারতীয় আঘা হায়দার সেদিন আদালত কক্ষের ঘটনাটির বিরুদ্ধে বলায় তাঁকেও সরিয়ে দেওয়া হয়। এখন বিচারপতি হিল্টনকে ট্রাইব্যুনালের প্রধান করে নতুন বিচারক হিসাবে নিযুক্ত করা হয় উইউরোপীয় বিচারপতি জে. কে. টাপ এবং ভারতীয় বিচারপতি আব্দুল কাদিরকে। সেদিন আদালত চত্বরে বিপ্লবীদের পুলিশ দিয়ে মারার ঘটনার নির্দেশ জারি করা অন্যতম বিচারপতি হিল্টনকে ট্রাইব্যুনালের প্রধান করাতে আপত্তি জানিয়ে বিপ্লবীরা আদালত বয়কট প্রক্রিয়া জারি রাখেন। ইতিমধ্যে সাহারানপুর এবং লাহোরে পুলিশ প্রচুর বোমা, পিস্তল এবং কার্তুজ উদ্ধার করেছে। সুধুমাত্র ম্যাকলয়েড রোডে ভগবতীচরণের বাড়ি থেকেই উদ্ধার হয়েছে বাইশটি বোমা। ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ, জয়গোপাল এবং হংসরাজ ভোরা তাঁদের বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী হতে রাজি হয়ে গেলে অভিযুক্তদের

অনুপস্থিতিতেই বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত এগোতে থাকে। ফণীন্দ্রনাথ ঘোষের বক্তব্য আবদ্ধ থাকে কীভাবে বিভিন্ন স্থানীয় বিপ্লবীরা মিলে এইচএসআরএ গঠন করে তার মধ্যে। অন্যদিকে জয়গোপাল স্যন্ডার্স হত্যায় লাহোরে মোজাং রোডের গোপন ডেরায় কীভাবে বিপ্লবীরা মিলিত হয়ে স্কট হত্যার পরিকল্পনা করেন, স্কট হত্যার পরে যে পোস্টার লাহোর শহরের দেয়ালে সাঁটা হয় সেটা কে লিখেছিলেন থেকে শুরু করে তার আগে কীভাবে তাঁরা পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লুঠ করে সমস্ত ঘটনার বিবরণী পেশ করেন। ৫ মে, ১৯৩০-এ শুরু হয়ে ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০-এ শুনানি শেষ হল। পুরো বিচারপ্রক্রিয়া এখানে একপাক্ষিক এবং রায় যেন পূর্বনির্ধারিত। শেষ পর্যন্ত ৭ অক্টোবর ট্রাইব্যুনাল মামলার রায় দিল। এই রায়ে অজয় ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ সান্যাল এবং দেশ রাজ প্রমাণাভাবে ছাড়া পেলেন, কিশোরীলাল, মহাবীর সিং, বিজয় কুমার সিংহ, শিব বর্মা, ডঃ গয়া প্রসাদ, কমলনাথ তিওয়ারী এবং জয়দেবের যাবজ্জীবন এবং কুন্দনলালের সাত বছরের জন্য আন্দামানে দ্বীপান্তর এবং ভগৎ সিং, সুকদেব ও রাজগুরুর ফাঁসির আদেশ হল। অন্তিম রায়দানের দিনে কোনো অভিযুক্তই আদালতে হাজির হননি। বিকেলে জেলের ভেতরেই তাঁদের হাতে লিখিত আদেশ এসে পৌঁছালো।

মাই রঙ দে মেরা বাসন্তী চোলা

ভগৎ সিং, সুকদেব এবং রাজগুরুর ফাঁসির আদেশে সারা দেশের মানুষ বিশেষত যুবসমাজ উত্তাল হল। লাহোরের রাস্তায় দুই লক্ষ লোকের বিক্ষোভ মিছিল হল এই রায়ের বিরুদ্ধাচারণ করে। লাহোর সহ বিভিন্ন শহরে হরতাল পালিত হল। 'ভগৎ সিং, সুকদেব, রাজগুরু জিন্দাবাদ' শ্লোগানে উত্তাল হল সারা দেশ। গান বাঁধা হল তাঁদের নিয়ে –

> ভগৎ সিং কে খুন কা আসার দেখ লেনা
> মিটা দেঙ্গে জালিম কা ঘর দেখ লেনা।

জেলের বাইরে থাকা ভগৎ সিংয়ের কমরেডরাও চুপচাপ বসে ছিলেন না। তাঁরা তখন ছক কষছেন কীভাবে জেলের দেয়াল ভেঙে ভগৎ সিং, সুকদেব ও রাজগুরুকে উদ্ধার করা যায়। বিশ্বনাথ বৈশম্পায়ন, সুখ দেশরাজ এবং ভগবতীচরণ ভোরা এই বড়ো ঘটনাটি ঘটানোর দায়িত্বে আছেন। কিন্তু এই ছক আর দিনের আলো দেখতে পেল না। রবি নদীর তিরে বোমার পরীক্ষা করতে গিয়ে একটি বোমা ফেটে গেল এবং সেখানেই সঙ্গে সঙ্গে ভগবতীচরণ ভোরার মৃত্যু ঘটে।

সবার চোখ তখন গান্ধীজির দিকে। গান্ধীজী যদি তাঁদের বাঁচাতে পারেন। সামনেই গান্ধীজীর সঙ্গে ভাইসরয় আরউইন'এর চুক্তি সই হবার কথা। এই সুযোগে সবাই আশা করল যে গান্ধীজি যদি আরউইনকে অনুরোধ করেন তাহলে হয়তো মাত্র ২৩ বছর বয়সে ভগৎ সিং এবং তাঁর কাছাকাছি বয়সের অন্যান্য তরুণদের, বীর বিপ্লবী সুকদেব এবং রাজগুরুর প্রাণরক্ষা হতে পারে। অবশ্য এটা জানা কথা যে গান্ধীজী মোটেই বিপ্লবীদের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন না। তিনি তখন আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে তাঁর অহিংস তত্ত্বকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা দিতে ব্যস্ত। সশস্ত্র বা সহিংস বিপ্লব যদি কোনোভাবে সফল হয় তাহলে তা তাঁর অহংকে তীব্রভাবে আহত করবে। তিনি যেভাবেই হোক তাঁর পথই যে শ্রেষ্ঠ পথ তা সমগ্র পৃথিবীর কাছে প্রমাণ করে ছাড়বেনই। তিনি তো তখনও ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার কথা ভাবছেনই না, কোনমতে ধরাকরা করে ইংরেজদের করুণা বর্ষণে তাঁদের ছত্রছায়ায় থেকে যেটুকু স্বায়ত্বশাসনের অধিকার পাওয়া যায়, সেই চেষ্টায় প্রণিপাতরত। গান্ধীজীর সঙ্গে ভগৎ সিংদের ফাঁসি কার্যকরী হবার চারদিন আগে ১৯ মার্চ, ১৯৩১-এ যেদিন গান্ধী-আরউইন চুক্তি নিয়ে আলোচনা হয় সেদিনে সম্পর্কে আরউইন বলেন,

> আলোচনার শেষে (এর সঙ্গে চুক্তির কোনো সম্পর্ক নেই) তিনি (গান্ধীজী) ভগৎ সিংদের প্রসঙ্গ তোলেন। তিনি তাঁদের ফাঁসির আদেশ ফিরিয়ে নেবার ব্যাপারে কোনো সওয়াল করেননি। তিনি শুধু কিছুদিনের জন্য ফাঁসি বিলম্ব করতে বলেছিলেন। তিনি শুধু বলেছিলেন যে, যে দিনটিতে তাঁদের ফাঁসি হবার কথা সেইদিন করাচিতে (কংগ্রেসের) নতুন সভাপতির আসার কথা। কিন্তু সবাই যদি সেদিন ভগৎ সিংদের নিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে..... আমি তাঁকে বলি আমি অধীর আগ্রহে এই মামলার খুঁটিনাটি পরীক্ষা করেছি কিন্তু এমন কিছু পাইনি যাতে আমার

বিবেক তাঁদের মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে সাড়া দিতে পারে।..... তিনি আমার এই যুক্তির জোরকে প্রশংসা করে আর (এই সম্পর্কে) কিছু না বলে ফিরে গেলেন। (Kuldip Nayar, *Without Fear*, Harper Collins Publishers India, 2012, p. 150-51 – অনুবাদ লেখকের।)

৭ মার্চ, ১৯৩১-এ দিল্লীতে গান্ধীজী এক জনসভা করতে এলে সেখানে তাঁকে ভগৎ সিংদের ফাঁসির জন্য দায়ী করে লিফলেট বিলি করা হয়। ২০ মার্চ, ১৯৩১। দিল্লীর আজাদ ময়দানে এক জনসভায় সুভাষচন্দ্র বসু ভগৎ সিংদের ফাঁসির আদেশ রদ করার দাবি তোলেন। পরবর্তীতে কংগ্রেসের ভেতরেই ব্যাপকভাবে সমালোচিত হলেন গান্ধীজী। ২৩ মার্চ, ১৯৩১। অভাবনীয়ভাবে নির্ধারিত দিনের ছয়দিন আগেই ভগৎ সিংদের ফাঁসি হয়ে গেল। যেদিনটি আসলে নির্ধারিত ছিল সেই ২৯ মার্চ, ১৯৩১ করাচিতে কংগ্রেসের নবনির্বাচিত সভাপতি বল্লভভাই প্যাটেলকে নিয়ে এক শোক মিছিল করা হল। সুভাষচন্দ্র বসু খেয়াল করলেন যে কংগ্রেসে উপস্থিত তরুণ-যুবকদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকে হাতে কালো রঙের রিস্টব্যান্ড পরেছে এবং তাঁদের স্থির বিশ্বাস যে গান্ধীজী ভগৎ সিংদের বাঁচাবার জন্য যথেষ্ট সচেষ্ট হননি। তিনি যদি চুক্তি থেকে পিছিয়ে আসতেন তাহলে আরউইন বাধ্য হতেন ভগৎ সিংদের ফাঁসির আদেশ রদ করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করতে। কংগ্রেস সম্পর্কে সাধারণ মানুষ এবং কংগ্রেস কর্মীদের বিরূপ ধারণা পালটাতে কংগ্রেস থেকে নানারকম চেষ্টা করা হল কিন্তু সাধারণ মানুষের ধারণা যে খুব একটা বদলালো সেকথা বলা যায় না।

ভগৎ সিং, সুকদেব এবং রাজগুরু

গান্ধীজী সম্পর্কে ভগৎ সিংয়েরও উঁচু কোনো ধারণা ছিল না। ফাঁসির আদেশ হয়ে গেছে ১৯৩০-এর ৭-ই অক্টোবর কিন্তু তা কার্যকর করবে কতদিনে? জেলের ভেতরে বসেই ভগৎ সিং বুঝতে পারছিলেন যে নভেম্বর ১৯৩০-এ গোল টেবিল বৈঠকের মাধ্যমে লন্ডন ভারতীয়দের সঙ্গে (পড়ুন গান্ধীজীর সঙ্গে) একটা রফায় আসতে চাইছিল। কিন্তু তারা চাইছিল না যে ভগৎ সিংয়ের লাশের ওপর বসে ওই বৈঠক হোক। তাই ব্রিটিশ রাজশক্তি কংগ্রেস এবং গান্ধীজীকে খুশি করতে নানা

পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছিল। তাই ভগৎ সিংদের ফাঁসির আদেশ কার্যকরী করতে বিলম্ব হচ্ছে। লন্ডনের গোল টেবিল বৈঠক অবশ্য সেবার কংগ্রেস এবং অন্যান্য দল বয়কট করেছিল। তখন সামনে পড়েছিল শুধু গান্ধী-আরউইন চুক্তি।

২৩ মার্চ, ১৯৩১। বিকেল তখন প্রায় চারটে। এইসময় বন্দিরা সাধারণত সেলের বাইরেই থাকে, সন্ধ্যা নামলে পরে তাঁরা যে যার কুঠুরিতে ফিরে যায়। ওয়ার্ডেন ছারাত সিং হুকুম দিলেন, সবাই যে যাঁর সেলে ফিরে যাও। বন্দিরা অবাক। কিন্তু ছারাত একবগগা। বললেন, "ওপরওয়ালার হুকুম"। সবাই যে যার কুঠুরিতে বন্দি হল। জেলের নাপিত বরকত প্রত্যেক কুঠুরিতে গিয়ে ফিসফিস করে খবর দিল যে আজ রাতেই ভগৎ সিং, সুকদেব আর রাজগুরুর ফাঁসি হবে। বন্দিরা সবাই জানতেন যে ওঁদের মৃত্যু অবধারিত কিন্তু তা যে এমন আচমকা ঘটতে চলেছে তা কেউই ভাবতে পারেননি। হেড ওয়ার্ডেন ছারাত সিং এই ১৪ নম্বর সেলের 'ফাঁসিকা কোঠি'তে থাকা ভগৎ সিংকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন। ছয়মাস আগে ভগৎ সিংদের ফাঁসির আদেশ হয়েছে। ভগৎ সিং একা সেলে দিন গোণেন আর পড়াশুনা করেন। তাঁর কাছে লুকিয়েচুরিয়ে অনেক বই আসে। ছারাত সিং দেখেও না দেখার ভান করেন। এক গোপন উৎস, দ্বারকা দাস লাইব্রেরি থেকে তাঁর বইয়ের জোগান আসে। এনে দেন তাঁর ভাই কুলবীর। তাঁর পড়ার নেশার সঙ্গে তাল রাখতে পারে না লাইব্রেরি। কী মারাত্মক ক্ষিদে তাঁর বই পড়ার! তিনি তাঁর নির্জন কুঠুরিতে বসে পড়ে ফেলেছেন, Karl Liebknecht-এর *Militarism*, লেনিনের *Left-Wing Communism*, বার্ট্রান্ড রাসেলের *Why Men Fight* এবং সিনক্লেয়ারের *The Spy.* ভগৎ সিংয়ের উকিল, প্রাণনাথ মেহতা ফাঁসি হবার ঘন্টা দুয়েক আগে কোনোভাবে তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা করার অনুমতি পেলেন। ভগৎ সিং তাঁকে দেখে জিজ্ঞাসা করেন যে বইটি আনার কথা বলা হয়েছিল, তা তিনি সঙ্গে করে এনেছেন কিনা। মেহতা তাঁর দিকে বাড়িয়ে দেন *The Revolutionary Lenin.* বইটি পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ভগৎ সিং তা গোগ্রাসে গিলতে থাকেন। মেহতা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর শেষ কী কথা বলার আছে? বই থেকে চোখ না সরিয়ে ভগৎ সিং বলেন, "শুধু দুটি বার্তা – 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক' এবং 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক'। মেহতা যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি এখন কিরকম অনুভব করছেন, ভগৎ সিং উত্তর দেন, "সবসময়ের মতোই খুশি"। শেষে যখন মেহতা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁর কোনো শেষ ইচ্ছে আছে কিনা, ভগৎ সিং বলেন, "হ্যাঁ, আমি এই দেশেই আবার জন্ম নিতে চাই যাতে আমি দেশের সেবা করতে পারি"। ভগতের সঙ্গে দেখা করে মেহতা সুকদেব ও রাজগুরুর সঙ্গেও দেখা করেন। রাজগুরু তাঁকে বললেন, "আমরা আবার শিগগিরি দেখা করব"। সুকদেব শুধু মেহতাকে মনে করিয়ে দেন যে তিনি যেন মনে করে জেলারের কাছ থেকে তিনি সুকদেবকে ক'মাস আগে যে ক্যারাম বোর্ডটি দিয়েছিলেন তা ফেরত নিয়ে যান। মেহতা তাঁদের সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে যাবার ঠিক পরেই তাঁদের কাছে খবর আসে যে আগামিকাল সকালে নয়, আজ সন্ধ্যা সাতটায় তাঁদের ফাঁসি হবে। ভগৎ সিং তখন মন দিয়ে সদ্য হাতে পাওয়া বইটি পড়ছিলেন। খবরটি শুনে আক্ষেপ করে শুধু বলেন, "তোমরা কি আমাকে বইটির একটা পরিচ্ছদও শেষ করতে দেবে না?"

জেলের ঘড়িতে সন্ধ্যা ছ'টার ঘন্টা বাজল। সমস্ত সেলের বন্দিরা কান খাড়া করে আছে। ভেসে এল ভারী বুটের আওয়াজ। প্রথমে তাঁদের কানে ভেসে এল সেই পরিচিত গান – সার্ফরোশি কি তামান্না আব হামারা দিল মে হ্যায়...। এরপরেই আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে জোর আওয়াজ উঠল, ''ইনকিলাব জিন্দাবাদ'' এবং "হিন্দুস্তান আজাদ হো"। সারা জেলের সমস্ত বন্দিরা সমবেত কণ্ঠে গান ধরল, "মাই রঙ দে মেরা বাসন্তী চোলা..."।

তিনজন বীর বিপ্লবী হাতে হাতকড়া বাঁধা পেছনে পাহারাদার নিয়ে চলেছে ফাঁসি মঞ্চের দিকে। তাঁরা তিনজন একসাথে গাইছেন,

কাভি উও দিন ভি আয়েগা
কে যাব আজাদ হাম হোঙ্গে
ইয়ে আপনি হি জমিন হোগি
ইয়ে আপনা আশমান হোগা

শহীদো কি চিতাও পর
লাগেঙ্গে হরবার মেলে
ওয়াতন পর মরনে ওয়ালো কা
ইয়েহি নাম-ও-নিশান হোগা।

ফাঁসির আগে তিনজনকে ওজন করা হল। দেখা গেল প্রত্যেকের ওজন বেড়েছে। তাঁদের শেষ স্নান সেরে ফেলতে বলা হল। স্নানের পর তাঁদের কালো রঙের পোশাক পরানো হল। তাঁদের মুখ খোলা। ছারাত সিং ভগতের কানে কানে 'ওয়াহে গুরু'র নাম নিতে বললেন। ভগৎ সিং বললেন, আমি জীবনে কোনোদিন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিনি। বরং বেশিরভাগ সময় আমি মানুষের গরিবির জন্য তাঁকে গালাগালি করেছি। এখন আমি যদি তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, তিনি আমাকে বলবেন, এটা একটা কাপুরুষ যে তার শেষের সময় আগত বলে আমার কাছে ক্ষমা চাইছে।"

ফাঁসির মঞ্চে তিনজন আলাদা আলাদা কাঠের তক্তায় দাঁড়ালেন পাশাপাশি। ভগৎ সিং ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়ালেন। এবার তাঁর মায়ের শেষ ইচ্ছামতো জীবনের শেষ শ্লোগান তুললেন, "ইনকিলাব জিন্দাবাদ।" ফাঁসুড়ে একে একে তিনজনের গলায় ফাঁসির দড়ি পরালো। এখন তাঁদের প্রত্যেকের হাত-পা বাঁধা। তাঁরা ফাঁসির দড়িকে চুম্বন করলেন। ফাঁসুড়ে তাঁদের জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের মধ্যে আগে কে যেতে চাও? সুকদেব বললেন যে তিনিই আগে যেতে চান। এরপর ফাঁসুড়ে একে একে তিনজনের গলার ফাঁসির দড়িতে টান দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পায়ের তলায় কাঠের তক্তাটিকে লাথি মেরে সরিয়ে দিল। পরপর পাশাপাশি তিনজন শহিদ বহুক্ষণ ধরে দড়িতে ঝুলতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত জেলের একজন ডাক্তার একে একে তাঁদের দেহগুলিকে দড়ি খুলে নামিয়ে এনে মাটিতে শোয়ালেন। এরপর নিয়ম অনুযায়ী দেহ শনাক্তকরণের পালা। একজন জেল আধিকারিক এই তিনজনের বীরত্বে এতটাই মুগ্ধ ছিলেন যে তিনি এঁদের শনাক্ত করতে রাজি হলেন না এবং সঙ্গে সঙ্গে সাসপেন্ড হলেন। একজন জুনিয়ার অফিসার এঁদের শনাক্ত করলেন। এরপর দুজন ব্রিটিশ অফিসার, তাঁদের মধ্যে একজন জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট, তাঁরা মৃতদের সার্টিফিকেটে সই করলেন।

এরপর এই মৃতদেহগুলিকে নিয়ে কী করা হবে তা নিয়ে চিন্তায় পড়লেন জেল কর্তৃপক্ষ। জেলের বাইরে তখন অপেক্ষায় প্রচুর মানুষ। জেলের ভেতরে এঁদের দাহ করা হলে সেই ধোঁয়া ওপরে উঠে সবার নজর টানবে। এরপর যদি বড়ো কোনো গোলামাল হয় তা সামলানো খুব মুশকিল হবে। অনেক ভেবে তাঁরা জেলের পেছনের দেয়ালে গর্ত করে একটা ট্রাকে মাল তোলার মতো মৃতদেহগুলিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলল তারপর সেনা পাহারায় অত্যন্ত গোপনে সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে প্রথমে রবি নদীর তীরে নিয়ে গেল, সেখানে নদীর জল অগভীর থাকায় মৃতদেহগুলি দাহ করার জন্য ফিরোজপুরে শতদ্রু নদীর তীরে নিয়ে গেল। এরপর তারা দেহগুলিতে আগুন ধরিয়ে দিল। কাছেই গন্ধা সিংওয়ালা গ্রাম। সেখান থেকে মানুষজন দেখতে পেল যে নদীর তীরে আগুন জ্বলছে। তাঁরা ছুটে গেল সেইখানে। তাঁদের দেখেই সেনারা দৌড়ে নিজেদের গাড়িতে উঠে লাহোরের দিকে পালিয়ে গেল। এরপর গ্রামের লোকেরাই তাঁদের বীরেদের মর্যাদার সঙ্গে শেষকৃত্য সম্পন্ন করল।

সারা লাহোর এবং পাঞ্জাবের অন্যান্য শহরে ভগৎ সিংদের ফাঁসির খবর ছড়িয়ে পড়তে সারা শহর যেন রাস্তায় নেমে এল। পরদিন বড়ো বড়ো মিছিল বেরোতে শুরু করল। সারা শহর জুড়ে হরতালের চেহারা। সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। সমস্ত স্কুল কলেজ বন্ধ। দুপুরে সরকারিভাবে জানানো হল যে ভগৎ সিং, সুকদেব ও রাজগুরুকে যথাযথ সম্মানের সঙ্গে হিন্দু ও শিখ প্রথায় দাহ করা হয়েছে। নিলাগোম্বাদ থেকে এক বিশাল শোক মিছিল শুরু হল। হাজার হাজার হিন্দু, মুসলমান, শিখ – তিন মাইল লম্বা সেই মিছিলে যোগ দিল। পুরুষদের হাতে কালো ব্যান্ড বাঁধা, মহিলাদের পরণে কালো শাড়ি, মুহুর্মুহু শ্লোগানে কেঁপে উঠছে শহর – 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' এবং 'ভগৎ সিং জিন্দাবাদ'। এই বিশাল মিছিল

আনারকলি বাজারে এসে থামল। সেখানে ভগৎ সিংহের পরিবার ফিরোজপুর থেকে তিন শহিদের পবিত্র ভস্ম সংগ্রহ করে এনেছেন। তিনঘন্টা পর তিনটি কফিন মালা দিয়ে সাজিয়ে আবার বিশাল মিছিল শুরু হল।

ওয়ার্ডেন ছারাত সিং কোনোমতে তাঁর বিদ্ধস্ত মন নিয়ে নিজের শরীরটাকে টানতে টানতে বাড়ি ফিরলেন। তাঁর কর্মজীবনের তিরিশ বছরে অনেককে ফাঁসিতে যেতে দেখেছেন, কিন্তু কখনোই তাঁর এ্তো মন খারাপ হয়নি। এই ক'দিনের মধ্যে তিনজনের প্রতি কি ভীষণ মায়া পড়ে গিয়েছিল! বাড়ি ফিরে এই প্রথম কান্নায় ভেঙে পড়লেন ছারাত সিং।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

1. Aggarwal, S. N., *The Heroes of Cellular Jail*, Rupa, 3rd Impression, 2018.
2. Ghosh, Durba, *Gentlemanly Terrorists*, Cambridge University Press, First South Asia Edn., 2018.
3. Nayar, Kuldip, *Without Fear – The Life and Trial of Bhagat Singh*, Harper Collins, 2012.
4. Singh, Bhagat, *Why I am an Atheist*, Srishti, Delhi, 2020.

- নিবন্ধটিতে ব্যবহৃত ছবিগুলি আন্তর্জাল থেকে সংগৃহীত।

অমিত রায় : ঘাটাল রবীন্দ্রশতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধাপক এবং বিভাগীয় প্রধান। 'আন্তর্জাতিক পাঠশালা পত্রিকার প্রধান সম্পাদক।

শতবর্ষে চলচ্চিত্র : শত জলঝর্ণার ধ্বনি

একশো বছরের বাংলা ছবির এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।
হীরালাল সেন থেকে শুরু করে কতভাবে এইভাবে দশকওয়ারি বিষয় বিশ্লেষণে
আর তার উত্থানপতনের বিভিন্ন বাঁকবদলের কাহিনির
পর্যায় পরম্পরা আলোচনা করলেন **অনিশ রায়**।

॥ এক ॥

একুশ শতকের এই দশক শতবর্ষ আর সার্ধ শতবর্ষের মিলন-আঙিনা যেন। তবু, সেই উজ্জ্বল ঘটনা-ক্রিয়ার মুগ্ধ আলাপচারিতার মধ্যেই ঘটে গেল দুটি দুর্ঘটনা। বেশ আড়ম্বরের সঙ্গেই। আজি হতে শতবর্ষ আগে ঘটে যাওয়া অর্জন এবং বিস্মরণের ঐতিহাসিক পুনরাবৃত্তিতে।

এক॥ রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর নোবেল প্রাপ্তি

দুই ॥ ভারতীয় চলচ্চিত্রের ভাব-মহিমা সূচনা

দুটো অর্জনই আমাদের গর্বিত করে। মহত্তর প্রত্যয়কে চিন্তার সাধ্য-সীমায় আনে। আরো অহং জাগে, যখন দেখি এই দুটির সাথেই মিশে আছে বাঙালির মেধা-ঘাম-অশ্রু-রক্ত এবং বাঙালির বিশ্বসাধনার কথকতা। তাহলে, নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগে 'দুর্ঘটনা' এবং 'বিস্মরণ' এমন ঘাতক-শব্দ ব্যবহারের কারণ কী? উত্তরে এন. সি. চৌধুরীর বহুখ্যাত শব্দবন্ধ প্রথম অভিব্যক্তি হিসেবে ধার নিলাম-"আত্মঘাতী বাঙালি"।

হায় বাঙালি, হে বাঙালি, আসুন, দায় এড়িয়েও স্বীকার করি 'দুর্ঘটনা' মারাত্মক; কেননা, ওই নোবেল প্রাপ্তিটুকুই সেদিন থেকে এখনো হয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের বৃহত্তর পরিচিতি। আমরা আজও এমন সত্যদ্রষ্টা ঋষিতুল্য কবি-মানুষটির সর্বব্যাপী জীবনবোধকে বিস্মৃতির অতলে ডুবিয়ে রেখেছি। আবার এই আমরা, ক-জনই বা মনে রেখেছি বা স্বীকৃতি দিয়েছি ভারতীয় চলচ্চিত্রের আদিপুরুষ হীরালাল সেনকে? যাঁর আত্মবিসর্জিত কর্মসাধনার মধ্য দিয়েই এদেশে চলচ্চিত্র নামক আধুনিকতম শিল্প-সন্তানের জন্মলাভ ঘটেছে। সুতরাং বলতে পারি, এই দুটি প্রাপ্তি যেমন আমাদের অন্তঃসারশূন্যতাকে প্রকট করে, তেমনি আমাদের ইতিহাস-ঘাতক রূপকেও স্পষ্ট করে।

॥ দুই॥

২৮ ডিসেম্বর, ১৮৯৫ সালে প্যারিসের হোটেল ডি ক্যাফেতে ল্যুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয় বিশ্বের প্রথম চলচ্চিত্র শুরু করেন। অবশ্য অনেকেই বলেন, ১৮৮৯ সালে আমেরিকায় এই শিল্পের প্রথম পদক্ষেপ ঘটেছিল। এসব বিতর্কের বিষয়, তেমন মনে করলে তো বলতে হয়, ১৬৬১ সালেই ক্রিচার ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহয্যে যিশুর যে জীবনচক্র তৈরি করেছিলেন, সেখানেই চলচ্চিত্রের আদি সূত্রপাত ঘটে গেছে। আসলে এসব-ই ছিল শুরুর আগের প্রস্তুতি। তাই আগস্ট ল্যুমিয়ের ও লুই ল্যুমিয়ের, এই দুই ভাইয়ের প্রয়াসকেই চলচ্চিত্র শিল্পের প্রস্তাবনা বলে মনে করা হয়। যাই হোক, ল্যুমিয়ের কোম্পানির এক চিত্রগ্রাহক ১৮৯৬ সালের ৭ জুলাই মুম্বই-র ওয়াটসন হোটেলে ভারতীয় উপমহাদেশের মাটিতে প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শনটি করেন। তখন অবশ্য

চলচ্চিত্রকে বায়োস্কোপ বলা হত। প্রথম প্রদর্শনে টিকিটের দাম মহার্ঘ (১ টাকা) হলেও পরে সস্তায় বায়োস্কোপ প্রদর্শনী শুরু হয়।

এই ঘটনার ১৮ বছরের মধ্যেই, অর্থাৎ ১৯১৩ সালের ৩ মে দাদা সাহেব গোবিন্দ ফালকের নির্বাক ছায়াছবি 'রাজা হরিশচন্দ্র'-র হাত ধরে উপমহাদেশের মাটিতে চলচ্চিত্র শিল্প তার গৌরবোজ্জ্বল যাত্রা শুরু করে। এই বক্তব্যেই অবশ্য সেই ঐতিহাসিক বিতর্ক; না, বলা ভালো ইতিহাস অস্বীকারের সত্যটি নিজস্ব অস্তিত্ব প্রকট করে তোলে। কেননা, প্রকৃত প্রস্তাবে দাদাসাহেব ফালকের এমন সাড়ম্বর সূচনার বহু পূর্বেই চলচ্চিত্র বিষয়টিকে ভারতের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এক বঙ্গ সন্তান; তিনি চির শ্রদ্ধেয় অথচ আজও অস্বীকৃত হীরালাল সেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'দ্য রয়েল বায়োস্কোপ কোম্পানি' (১৮৯৮)-ই বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের সূতিকাগার। সুতরাং এই বাক্যটিকেই সবচেয়ে গাঢ়, জোড়ালো এবং উচ্চস্বরে বলা যায় – শতবর্ষে ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রাণ-পুরুষ হলেন হীরালাল সেন। কিন্তু অদ্ভুতভাবে এদেশে তিনি আজও ব্রাত্য। বাংলা তথা বাঙালির প্রতি আরো আর অনেক ঘটনার মতো এ-ও এক বড়ো বঞ্চনার নির্মম সাক্ষ্য। সবচেয়ে বড়ো কথা, এ এক ভয়ঙ্কর আত্মপ্রতারণা। এদেশের ইতিহাস চিরকাল বাঙালিকে পশ্চাতে রাখার ঘৃণ্য প্রয়াস চালিয়েছে, মানুষকে ভুল ব্যাখ্যা শুনিয়েছে। আর বাঙালি সব দেখে, সব বুঝেও চিরকাল পাশ কাটিয়ে গেছে; কিংবা সাফল্যের বলয়ে প্রবেশ করার দুর্মর লোভে সেই কপট-কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়েছে। না-হলে আজ এদেশের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হত। লেখা হত চলচ্চিত্র শিল্পেরও নতুন ইতিহাস। সত্যিই, এই ইতিহাস-বিকৃত ইতিকথা নির্মাণ যন্ত্রণার। তবু সেই স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতির পর্ব থেকে কয়েক পা সরে এসে সীমিত অক্ষরমালায় হীরালাল সেনের শিল্পিত-অবয়ব দানের প্রয়াস রাখা যাক।

হীরালাল সেন, মানিকগঞ্জ জেলার বগজুরী গ্রামের বাসিন্দা, এদেশের প্রথম বায়োস্কোপ কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। প্রতিষ্ঠার দিন ৪এপ্রিল, ১৮৯৮; প্রতিষ্ঠানের নাম 'রয়াল বায়োস্কোপ কোম্পানি'। সহযোগী ছিলেন ভাই মতিলাল সেন। দুই ভাই চলচ্চিত্রে অনুপ্রাণিত হন প্রফেসর স্টিফেন্সের প্রদর্শনী থেকে। হীরালাল ছিলে একজন চিত্রগ্রাহক। তিনি ইউরোপিয়ানদের পরাজিত করে আলোকচিত্রের প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ হয়েছিলেন।

হীরালাল সেন, এদেশে প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রের নির্মাতাই শুধু নন; তিনিই প্রথম তথ্যচিত্র নির্মাতা, প্রথম বিজ্ঞাপন বিষয়ক চলচ্চিত্রের নির্মাতা, প্রথম রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের-ও নির্মাতা। হীরালাল সেনের সৃষ্টিশীল কর্মজীবন ব্যাপ্ত ছিল ১৯১৩ সাল পর্যন্ত। যার মধ্যে তিনি ৪০টি–র বেশি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। বেশিরভাগ ছবিতেই তিনি ক্যামেরাবদ্ধ করেন অমরেন্দ্রনাথ দত্তের কলকাতার ক্লাসিক থিয়েটারে মঞ্চস্থ বিভিন্ন থিয়েটারের দৃশ্য।

১৯০১ আর ১৯০৪-এর মধ্যে ক্লাসিক থিয়েটারের পক্ষে তিনি অনেকগুলি ছবি নির্মাণ করেন; সীতারাম, মৃণালিনী, আলিবাবা, হরিরাজ, সরলা, ভ্রমর, বুদ্ধদেব, দুটি প্রাণ, সুরেন্দ্রনাথের শোভাযাত্রা, পঞ্চম জর্জের দিল্লি আগমন ইত্যাদি। তিনি ১৯০৩ সালে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি নির্মাণ করেন, — 'আলিবাবা ও চল্লিশ চোর'; এটি নির্মিত হয়েছিল ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত ওই নামের থিয়েটারের ওপর ভিত্তি করে। তবে এ ছবি সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। সম্ভবত এর কোনো প্রদর্শন হয়নি। তাঁর সৃষ্ট তথ্যচিত্রের মধ্যে আছে— চিৎপুর রোড, ধলেশ্বরী নদীতে স্নান, মল্লিক বাড়ির বিয়ে ইত্যাদি। তাঁর তথ্যচিত্র 'Anti Partition Demonstration and Swadeshi Movement at the Town Hall, Calcutta on 22nd September, 1905'-কেই ভারতের প্রথম রাজনৈতিক চলচ্চিত্র বলে মান্যতা দেওয়া হয়। এ ছবির বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল—"আমাদের নিজেদের স্বার্থে খাঁটি স্বদেশী সিনেমা"। ছবির শেষে 'বন্দে মাতরম্' গানটি রাখা হয়েছিল। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তিনি কতগুলি বিজ্ঞাপন বিষয়ক আর কিছু সংবাদমূলক চলচ্চিত্র-ও নির্মাণ করেন। তাঁর সৃষ্ট 'জবাকুসুম হেয়ার ওয়েল' এবং 'এডওয়ার্ড টনিক'-ই সম্ভবত এদেশের প্রথম 'অ্যাড ফিল্ম'।

'রয়াল বায়োস্কোপ কোম্পানি' শেষ ছবি বানায় ১৯১৩ সালে। তারপর-ই হীরালাল পারিবারিক দুর্যোগ এবং ব্যাপক আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হন। (এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বিখ্যাত 'প্যাথে কোম্পানি' একসময় হীরালাল সেনকে গড়ের মাঠে তাঁবু

খাটিয়ে তাদের ছবি দেখানোর প্রস্তাব দিয়েছিল; কিন্তু হীরালাল সেই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। যে সুযোগটি কাজে লাগিয়ে বিপুল মুনাফা অর্জন করেন দুঁদে পারসি ব্যবসায়ী জামসেদজি ফ্রামজি ম্যাডান।) পারিবারিক ও আর্থিক সমস্যার মোকাবিলা করতে করতে হীরালাল সেন ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে, ভাই মতিলাল সেনের বাড়িতে রাখা তাঁর সমস্ত ফিল্ম এবং নথি আগুনে পুড়ে যায়। সেই আগুনে হীরালাল সেন নামটিও পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। এই দেশ, তাঁর স্বজাতি বাঙালি তাঁকে বে-মালুম বিস্মৃতির অতলে ডুবিয়ে দেয়। (দাদা সাহেব ফালকে পেলেন এদেশীয় চলচ্চিত্রের আদি পুরুষের মর্যাদা)। ২০১৭ সাল, অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর শতবর্ষে দাঁড়িয়েও আমরা এই বিস্মৃতির কলঙ্ক কি গায়ে মেখে বসে থাকব?

যাই হোক, সে-কথা আজ আড়ালেই চলুক। আজ না হয় স্মরণ করি, শতবর্ষে চলচ্চিত্রের দুর্গম পথ অতিক্রমের মধুর স্মৃতি। প্রয়াস রাখি তার বিবর্তন পথের রূপরেখা নির্মাণের। অবশ্যই তা হবে অযোগ্যের অক্ষম প্রয়াস। তবু, বলে যাই কিছু কথা।

॥ তিন ॥

চলচ্চিত্র জীবন ও সমাজের প্রতিচ্ছবি। সেলুলয়েডে বন্দি করে রাখা মানুষের জীবন চিত্রায়ন সর্বদাই মানুষকে করেছে আকৃষ্ট। এদেশের মানুষের কাছে চলচ্চিত্রের আবেদন তুলনায় অনেক বেশি এবং সুদূরপ্রসারী। এদেশে চলচ্চিত্র শতবর্ষ পূর্ণ করেছে। এই শতবর্ষে ঘটে গেছে যুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, স্বাধীনতা, দেশভাগ, খাদ্য-সংকট, উদ্বাস্তু সমস্যা, একের পর এক রাজনৈতিক পট পরিবর্তন, বিশ্বায়নের বাজারনীতি ইত্যাদি ইত্যাদির মতো ঘটনা। রাষ্ট্রিক, সামাজিক এবং মানসিক ক্ষেত্রে বিচিত্র ভাঙনের সূত্র ধরে এদেশের চলচ্চিত্র ভাবনা-ও ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। তার শরীরেও পরিবর্তনের চিহ্ন হয়েছে স্পষ্ট।

আগেই বলেছি, বাংলায় চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দান করেন, জে. এফ. ম্যাডান। ১৯১৩ সালে বম্বেতে 'রাজা হরিশচন্দ্র' মুক্তি পেলে সেই প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াসে জোয়ার আসে। ম্যাডান কোম্পানির প্রযোজনায়, প্রিয়নাথ গাঙ্গুলি ও জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিকল্পনায় তৈরি হয় প্রথম বাংলা পূর্ণ দৈর্ঘ্য নির্বাক চলচ্চিত্র 'বিল্বমঙ্গল' (১৯১৬)। ১৯১৭ সালে, ফালকের 'রাজা হরিশচন্দ্র', রুস্তমজী ধোতিওয়ালার নির্দেশনায় বাংলা টাইটেল সহ দেখানো হয়।

তবে সম্পূর্ণ বাঙালি অংশগ্রহণে, বাঙালির মূলধনে, বাঙালির মেধায় ও পরিশ্রমে, বাঙালি চিত্রগৃহে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র হিসেবে ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের (ডি.জি.) 'বিলেতফেরৎ'-ই (১৯২১) প্রথম নাম। তখন ছিল নির্বাক চলচ্চিত্রের যুগ। এই যুগে চলচ্চিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে ইন্দো-ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানি, তাজমহল ফিল্মস, অরোরা ফিল্মস কোম্পানি, ইন্ডিয়ান সিনেমা, গ্রাফিক আর্টস, ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ক্রাফট্ প্রভৃতি সংস্থা। প্রায় শতাধিক চলচ্চিত্র এদের দ্বারা নির্মিত ও পরিবেশিত হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ইন্দো-ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানি। কারণ এর কর্ণধার ছিলেন ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় ওরফে ডিজি এবং নীতীশচন্দ্র লাহিড়ী। এরা নির্বাক যুগের একটি বড়ো অধ্যায়। বাংলা সিনেমায় চ্যাপলিনের ম্যানারিজম, কৌতুকভঙ্গি এবং কিটনের ক্যারিক্যাচার ধীরেন্দ্রনাথ-ই প্রথম আমদানি করেন। তিনিই প্রথম এই দেশের শিক্ষিত মহিলাদের চলচ্চিত্র জগতে নিয়ে আসেন, যা তৎকালীন সময়ে বৈপ্লবিক উদ্যোগ বলা যায়। এভাবে তাঁর হাত ধরেই এদেশীয় সিনেমা একটা সমাজ স্বীকৃত শিল্প মাধ্যম হয়ে ওঠে।

এই যুগে চলচ্চিত্রে স্মরণীয় পদার্পণ শিশিরকুমার ভাদুড়ির। তাঁর তত্ত্বাবধানে তাজমহল ফিল্ম কোম্পানি সাহিত্য-কে নিয়ে আসে চলচ্চিত্রের ঘরে। সিনেমায় অভিনব ব্যঞ্জনা সৃষ্টির এক যুগান্তকারী প্রয়াস শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথের 'মানভঞ্জন' এবং শরৎচন্দ্রের 'আঁধারে আলো' সেই প্রয়াসের গৌরচন্দ্রিকা। শ্রদ্ধেয় চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের মতে, রবীন্দ্রনাথের 'মানভঞ্জন' গল্পটি চলচ্চিত্র শুরুর আগেই চলচ্চিত্র শিল্পের ভবিষ্যদ্ভাবী প্রস্তাবনা ছিল।

নির্বাক পর্বে সিনেমা সংক্রান্ত দুটি আইন জারি হয়—(১) সিনেমাটোগ্রাফি অ্যাক্ট অব ইন্ডিয়া (১৯১৮); (২) বেঙ্গল অ্যামিউজমেন্ট ট্যাক্স অ্যাক্ট। প্রথমটিতে সিনেমার সেন্সরশিপ হয়; দ্বিতীয়টিতে টিকিটের দামে ট্যাক্স বসে। যদিও এই সময়ের সিনেমা যাত্রাসুলভ মনোরঞ্জনের মাধ্যম ব্যতীত অন্য বিশেষত্বের চিহ্ন তুলে ধরতে সক্ষম হয়নি। তবে সম্ভাবনার বীজটি কিন্তু রোপিত হয়েছিল।

॥ চার ॥

১৯২৮ সাল। আবার জে.এফ. ম্যাডানের এক যুগান্তকারী উদ্যোগ। এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেসে দেখানো হয় হলিউডের ইউনিভার্সাল কোম্পানির 'মেলোডি অব লাভ'। ভারতের মাটিতে প্রদর্শিত প্রথম সবাক ছবি। শুরু হল টকি–র যুগ।

অতঃপর, ১৯৩১ সালে বাংলা ভাষায় প্রথম সবাক চলচ্চিত্র 'জামাইষষ্ঠী' মুক্তি পায়। পরিচালক অমর চৌধুরী, প্রযোজনায় ম্যাডান কোম্পানি। বলা যায়, এখান থেকেই শুরু হল বাংলা তথা ভারতীয় সিনেমার ঐহিত্য নির্মাণের ধারাবাহিক প্রবাহ। টকি সিনেমাকে আরও জীবন্ত করার কাজটি শুরু করেছিলেন বীরেন্দ্রনাথ সরকার। তাঁর 'নিউ থিয়েটার্স কোম্পানি' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। বাংলা সিনেমায় তিরিশ এবং চল্লিশের দশকে এই কোম্পনির প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি।

এই যুগে চলচ্চিত্র পরিচালনায় এলেন দিকপাল ব্যক্তিবর্গ – দেবকীকুমার বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নরেশচন্দ্র মিত্র, চারু রায়, নীতিন বসু প্রমুখ। কিছুদিন পর এলেন বিমল রায়, নিমাই ঘোষ, মধু বসু, উদয়শঙ্কর, অজয় করের মতো যুগ-নিয়ন্ত্রণকারী পরিচালকবর্গ। এখানে একটি কথা বলতেই হয়, ১৯৩২ সালে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাঁর নাটক 'নটীর পূজা'কে চলচ্চিত্রায়িত করার উদ্যোগে মহড়া শুরু করেছিলেন। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাঁর ডাক আসায় তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন; এবং কাজটি পরিণতি লাভ করে না। এ আমাদের বড়ো পরিতাপের বিষয়।

যুগটি শুধুমাত্র পরিচালনায় নক্ষত্র-প্রতিম ব্যক্তিদের জন্যই চিহ্নিত হয়ে থাকে না; এ যুগ মহান অভিনেতাদেরও মহৎ শিল্প অধ্যায় হিসেবে মর্যাদার দাবিদার। এ সময়েই এসেছিলেন পাহাড়ী সান্যাল, কে. এল. সায়গল, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, ছবি বিশ্বাস, অমৃতলাল বসু, কাননবালা দেবী, নিভাননী, ছায়াদেবীর মতো তাবড় অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ।

এঁদের দ্বারা নির্মিত এবং অভিনীত চলমান চিত্র-শিল্পের সঙ্গে রাইচাঁদ বড়াল, কৃষ্ণচন্দ্র দে, পঙ্কজ মল্লিক, শচীন দেব বর্মন, কমল দাশগুপ্ত, দিলীপ রায়, অজয় ভট্টাচার্যের মতো বিখ্যাত সঙ্গীত স্রষ্টাগণ।

তৈরি হল একের পর এক জনপ্রিয় সিনেমা। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, দেনা-পাওনা, কপালকুণ্ডলা, নৌকাডুবি, দেবদাস, মুক্তি, বিদ্যা, সাথি, শেষ উত্তর, পরিচয়, আলিবাবা, উদয়ের পথে, ছিন্নমূল, কল্পনা, ভুলি নাই, নতুন ইহুদি, শহর থেকে দূরে, মানে না মানা, পরিণীতা, কুমকুম, তটিনীর বিচার, ডাক্তার, শাপমুক্তি, নর্তকী, উত্তরায়ণ, যোগাযোগ, প্রিয় বান্ধবী, দুই পুরুষ, সাত নম্বর বাড়ি, বিরাজ বৌ, পথের দাবী, চন্দ্রশেখর, অরক্ষণীয়া, অঞ্জনগড়, সন্দীপন পাঠশালা, দেবী চৌধুরাণী, পুতুল নাচের ইতিকথা, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, মেজ দিদি, বিদ্যাসাগর, দত্তা, বাবলা, পণ্ডিতমশাই, বসু পরিবার, ৪২ (বিয়াল্লিশ), নীলদর্পণ, হানাবাড়ি, পল্লীসমাজ, মহাপ্রস্থানের পথে প্রভৃতি। যতগুলো এই মুহূর্তে মাথায় এল বললাম।

বোঝা যাচ্ছে, নিশ্চয়ই, ১৯১৭-২০ সাল, ৩/৪ বছরের চলচ্চিত্রে যে প্রচলিত পৌরাণিকতা ও ধর্মমূলকতার আবরণ ছিল, তিরিশ এবং চল্লিশের দশকে তা কাটিয়ে ফেলল। তার জায়গায় নিয়ে এল সাহিত্যের জোয়ার। যে পথের পথিকৃৎ অবশ্যই ছিলেন নির্বাকযুগের জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯২০ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত এই প্রবণতা ধারাবাহিকভাবে অক্ষুণ্ন থাকে। আর যোগ্য পরিচালক এবং অভিনেতার শিল্পিত অংশ গ্রহণে বাংলা চলচ্চিত্র শৈশবদশা কাটিয়ে ফেলল। পরিপুষ্ট হল।

তবু, বেশ বড়ো-সড়ো একটা 'কিন্তু' থেকেই গেল। কেননা, মূলত শহুরে মধ্যবিত্তের জন্য, মধ্যবিত্তের দ্বারা নির্মিত এই ছবিগুলি হল মধ্যমানের। সাহিত্যের জোয়ারে সরাসরি ভাসল তা। এগুলি হয়ে উঠল আদি-মধ্য-অন্ত যুক্ত সাহিত্য ন্যারেটিভের ফটোগ্রাফড্ ভার্সান মাত্র। সঙ্গে সেন্টিমেন্ট সম্বলিত সঙ্গীত বহুলতায় বাংলা সিনেমা হয়ে উঠল মধ্য-মন ও মধ্য-মেধা তুষ্টির-ই উতরোল অবলম্বন। তখনও বাংলা সিনেমা বিনোদনের বাইরে কিছু ভাবার বাতিক তৈরি করতে সক্ষম হয়নি।

যদিও যুগের অভ্যন্তরেই যুগসন্ধির বেলা নেমে আসে। বাংলা সিনেমায় এই সন্ধি-র প্রস্তাবনা যে সিনেমাগুলির মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়, সেগুলি— প্রমথেশ বড়ুয়ার 'মুক্তি' (১৯৩৭), বিমল রায়ের 'উদয়ের পথে' (১৯৪২) ও 'অঞ্জনগড়' (১৯৪৮), উদয়শঙ্করের 'কল্পনা' (১৯৪৮), নিমাই ঘোষের 'ছিন্নমূল' (১৯৫০)। এগুলি সম্পর্কে দু-একটি বাক্য না বললে অপরাধ হবে।

সব দেশে সব কালে শিল্প, সংস্কৃতি ও সমাজে মহাক্রান্তি আসে কোনো মহান প্রতিভাকে আশ্রয় করে। কিন্তু সেই প্রতিভা আগমনের একটা পূর্ব প্রস্তুতি বা পটভূমি থাকে। এই পটভূমি হিসেবেই উল্লিখিত সিনেমাগুলি নির্দেশ করতে পারি। মানছি যে, এ দেশীয় চলচ্চিত্রে শুদ্ধ চিত্রভাষা, দৃশ্যবস্তু নির্ভরতা, অনন্য শিল্পভাষা প্রতিষ্ঠা বেশ বিলম্বিত। কিন্তু আজকের মন নিয়ে স্মৃতিপথে দূরের অভিজ্ঞতায় গেলে এসবের চকিত দৃষ্টান্তে প্রথম বিস্ময় আদায় করে নেয় প্রমথেশ বড়ুয়ার 'মুক্তি' (১৯৩৭)। সিনেমাটির সূচনা অংশটুকু স্মরণ করি। নায়ক একজন শিল্পী। জীবনযাপনে স্ত্রী-র সঙ্গে দুস্তর ব্যবধান। একটি 'সিকোয়েন্সে' পরিচালক সেই সুদূরতা ব্যক্ত করছেন। একটার পর একটা দরজা খুলে এগোয় নায়ক। বন্ধ-দরজার মুখগুলি কী অসামান্য তাৎপর্যে গল্প-মুখটি প্রসারিত করে দেয় দর্শক চেতনায়। হতে পারে—এ দৃশ্যপুঞ্জ পরিচালকের সচেতন শিল্পসিদ্ধ বোধে উৎসারিত নয়; হতে পারে- হঠাৎ-ই উদ্ভাবন; হতে পারে — কোনো বিদেশি ফিল্মের প্রভাবে নিষ্পন্ন। তবু, চলচ্চিত্রে নিজস্ব ভাষার সন্ধানক্রিয়ায় একে উপেক্ষা করার মতো উন্নাসিকতা দেখাব কীভাবে?

চল্লিশের দশকে রাজনীতি ও সংস্কৃতির ওঠা-নামার বিক্ষুব্ধ বিচলন চলচ্চিত্রকেও বুঝিয়েছিল পুরোনো সঞ্চয় নিয়ে কেনা বেচা আর চলবে না। আর সেই বুঝে ওঠার নান্দীপাঠ প্রথম শোনা গেল বিমল রায়ের 'উদয়ের পথে' (১৯৪৪) সিনেমায়। ১৯৪৪-এ এদেশীয় চলচ্চিত্র ভাবনায় ডি-সিকা ছিলেন না, ভিসকান্তি ছিলেন না, এমনকি কুরোশোয়া-ও ছিলেন না। এবং 'উদয়ের পথে'-তে কোথাও এঁদের বাস্তব চেতনার-ও কোনো ছাপ ছিল না। তবু এই সিনেমা 'রোমান্টিক রিয়ালিস্ট মেলোড্রামা'। যদিও এই 'রিয়ালিজম্'-কে বলা যায়, মধ্যবিত্তের দৃষ্টিতে দেখা মজুর-জীবন-বিলাস। 'উদয়ের পথে' আসলে শিল্পপতির শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকের প্রতিবাদ এবং ধনী কন্যা ও গরিব ছেলের প্রণয় আখ্যান। এই সিনেমা আজকের উন্নত দৃষ্টি নিয়ে দেখলে অল্প আয়াসেই এর বহু শৈথিল্য চোখে পড়বে; ফিল্মিক যুক্তিক্রমেও মন সায় দেবে না। তবু 'উদয়ের পথে' বাংলা সিনেমার ইতিহাসে একটা মাইলস্টোন। তৎকালে অসম্ভব জনপ্রিয়-ও হয়েছিল এই সিনেমা। কেন? কারণ : (১) এই সিনেমা প্রথম বা ছায়াছবিতে সমকালীন বাস্তবতার ছাপ জুড়ে দেয়, (২) বিষয়বস্তুর নতুনত্ব এবং উপস্থাপনায় সাহসিকতার পরিচয় রাখে, (৩) আনকোরা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দিয়ে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করানো হয়, (৪) নায়ক কল্পনায় নতুন মাত্রা সংযোজন করে; কেননা, প্রচলিত ব্যর্থ প্রণয়ীর সকরুণ স্রোতে ভাসা প্রতিরোধহীন নায়ক ভাবনার বিপরীতে সেই প্রথম সিনেমার নায়ক এক প্রবল সতেজ আপসহীন ব্যক্তিত্ব নিয়ে দাঁড়ায়, (৫) এই প্রথম চলচ্চিত্রের মাধ্যমে এদেশীয় সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথের ছবির সঙ্গে কার্ল মার্কসের ছবি দেখা যায় (নায়ক অনুপের ঘরের দেওয়ালে), (৬) এই ছবির গুরুত্বপূর্ণ দিক হল জ্যোতির্ময় রায়ের চিত্রনাট্য এবং সংলাপ। এই ছবির সংলাপ সিনেমা নিরপেক্ষ থেকেও বছরের পর বছর মানুষের মুখে মুখে ফিরেছে।

সত্যিই, বাংলা তথা ভারতীয় ফিল্মে 'উদয়ের পথে' একটা নতুন পথের দিশা দেখিয়েছে। উল্লেখ্য, 'উদয়ের পথে' সিনেমায় পরিচালক বিমল রায় বাস্তবতার যে উজ্জ্বল উদ্ধার চেয়েছিলেন, তা আরো খানিকটা পরিশীলিত রূপ পায় সুবোধ

ঘোষের 'ফসিল' গল্প অবলম্বনে নির্মিত 'অঞ্জনগড়' (১৯৪৮) সিনেমায়। এখানে মজুর জীবনের বাস্তবতা অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন পরিচালক বিমল রায়।

ফিল্মে স্বাবলম্বন অর্জনের এই উদ্যোগ পর্বে এক উজ্জ্বলতম কাজ, অসামান্য একটি শিল্পকীর্তি উদয়শঙ্করের 'কল্পনা' (১৯৪৮)। কারণ, এই প্রথম আমরা সিনেমা মাধ্যমের সচেতন পরীক্ষায় এক এমন সৃজনের পরিচয় পাই যার প্রতিটি ফ্রেমে, প্রতিটি শটে আধুনিক শিল্পী মনের অভিজ্ঞান রয়েছে। এই মন আপন দেশ-কালের তীক্ষ্ণ, ধারালো বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন, নিজেদের সাংস্কৃতিক দ্বান্দ্বিকতা সম্পর্কে সচেতন, শিল্পের দায়ে সেই দ্বান্দ্বিক বাস্তবকেই আধেয় বস্তুতে রূপান্তরিত করার সংকল্পে অবিচল। এই মন দেশের প্রতি দায় মানে, শিল্পের স্বদেশকে সন্ধান করে চিরায়তে ও লোকায়তে। 'কল্পনা' একটি সুঠাম ফিল্ম, যা একজন শিল্পীর জীবন ও কল্পনা ও স্বপ্ন, তার সাধনা ও সিদ্ধির উপাখ্যান। যার সঙ্গে নানা মাত্রায় জড়িয়ে আছে সমাজ ও সংস্কৃতির বাস্তব মর্মবস্তু। আরো একটি কথা, এই ফিল্মে পরিচালক বাণিজ্যিক ফিল্মের পরিচালকদের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে বিদ্ধ করেন। শিল্পিত চলচ্চিত্রের পক্ষ নিয়ে এই অবলোকনে তিনি ধরিয়ে দেন 'চলচ্চিত্র প্রমোদপণ্য নয়'; ষাটের দশকের আগে এই কথাটা এদেশে কোনোভাবেই প্রতিষ্ঠা পায়নি। সুতরাং, বলা যায়, 'কল্পনা' সামগ্রিকভাবেই ভারতীয় চলচ্চিত্রের একটি বড়ো ধাপ। শিল্পী মকবুল ফিদা হোসেনের কথায়—"অতীতে তৈরি আগামী প্রজন্মের রচনা।"

আমাদের চলচ্চিত্রে আধুনিকতা বিকাশের ক্ষীণ ধারায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিমাই ঘোষের 'ছিন্নমূল' (১৯৫০)। দেশভাগের বিপর্যয়ে মানুষের শিকড় ছেঁড়া অস্তিত্বের সংকট নিয়ে নির্মিত এই ছবি। জনপ্রিয় সিনেমার খতিয়ানে এই সিনেমার নাম উচ্চারিত হওয়ার কথা নয়; কিন্তু জনপ্রিয়তার বাইরে এসে ভারতবর্ষের সিনেমার ইতিহাসে এই 'ছিন্নমূল'-ই এদেশের প্রথম নিও-রিয়েলিষ্টিক ফিল্ম। হ্যাঁ, ইতালীয় কীর্তির সঙ্গে পরিচিত হবার আগেই এই আঙ্গিক এখানে আশ্রিত। এই সিনেমায় নিমাই ঘোষ কোনোরকম পেশাদার কুশীলব ছাড়া, গানের প্রয়োগ ছাড়াই, মানুষের দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রুর দলিলচিত্র পেশ করেন। আঁকাড়া বাস্তবকে পর্দায় তুলে আনেন শিয়ালদা স্টেশন ও মিলিটারি ব্যারাকের প্রান্ত থেকে। অভিনেতাদের সঙ্গে মিশিয়ে দেন সাধারণ মানুষকে। কোনো কৃত্রিম আলো নয়, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আলোর নির্ভরতায় এই ছবি গৃহীত হয়। কোনো নিটোল শিল্পায়ন নয়, বিষয়ের তীব্রতায় গোটা প্রকল্পটি নিয়ন্ত্রিত হয় ভিন্ন মেজাজে। সিনেমার সর্বাঙ্গে সেই দুঃসময়ের চিহ্ন লেগে আছে। প্রতিটি দৃশ্যপুঞ্জ আজও স্নায়ুর সমতা ছিন্নভিন্ন করে। বাস্তব ও বিষয়ের এমন সমানুপাত রক্ষা করার মতো দুঃসাহস হয়তো পৃথিবীতে কোনো কাহিনি চিত্রকার-ই দেখাননি। যাঁরা ছবিটি দেখেছেন, তাঁরা কোনোদিন-ও কি ভুলতে পারবেন সেই বৃদ্ধার আর্ত প্রতিরোধের প্রত্যয়ী স্বর-টি "স্বামী, শ্বশুরের ভিটা ছাইড়্যা মুই যামুনা। যামুনা। যামুনা।" জানেন তো, সেই বৃদ্ধা কোনকালেই অভিনেত্রী ছিলেন না।

'ছিন্নমূল' আরেকটি কারণে গুরুত্বের দাবি রাখে। এই সিনেমার সহকারী পরিচালক এবং একটি চরিত্রে অভিনয়ে ছিলেন ভারতীয় সিনেমার প্রবাদপ্রতিম শিল্পী ঋত্বিক ঘটক। এমনকি এই ছবির সঙ্গে পরোক্ষে যুক্ত ছিলেন ভারতীয় সিনেমার শ্রেষ্ঠ শিল্পী সত্যজিৎ রায়; চিত্রনাট্য রচনায় সহায়কের ভূমিকা নিয়ে।

কিন্তু, সেন্সরের অনেক বাধা পেরিয়ে ছবিটি মুক্তি পাওয়ার পরে বাঙালি দর্শক ছবিটিকে গ্রহণ করেনি। যাদের নিয়ে এই ছবি, সেই উদ্বাস্তুরাও ছবিটি থেকে বিমুখ থাকে। আর্থিক দিক থেকে বিপর্যস্ত হয়ে নিমাই ঘোষ এক বুক ক্ষুব্ধ অভিমান নিয়ে চলেন গেলেন সুদূর মাদ্রাজে। আর কোনোদিন বাংলায় ছবি করেননি। একবার অনেক দুঃখে বলেছিলেন—"ছিন্নমূল আমায় ছিন্নমূল করেছে"। বাঙালি দর্শক সমাজে এ এক লজ্জা ও কলঙ্কের চিহ্ন হয়ে আছে। অবশ্য এরও পরে আরো কলঙ্ক রচিত হবে ঋত্বিক ঘটকের প্রতি বাঙালির নির্মম উদাসীনতায়।

যাই হোক, নিমাই ঘোষ এ বঙ্গে দর্শক পাননি, এদেশে পুরস্কার পাননি, কিন্তু যা পেয়েছিলেন তা পুরস্কারের অধিক। রাশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক পুদভ্‌কিন এই ছবির উচ্চ প্রশংসা করেন। ছবির স্বত্ব কিনে নিয়ে রাশিয়ায় গিয়ে রুশভাষায় ডাব করে একশোটি প্রিন্ট দিয়ে সিনেমা হলে প্রদর্শন করেন। এবং স্তালিনের জীবদ্দশায়, রুশ সংবাদপত্র

'প্রাভদা'-য় 'ছিন্নমূলের' উচ্চসিত প্রশংসা করে 'রিভিউ' লেখেন। 'ছিন্নমূল' সম্পর্কে বিদগ্ধ সমালোচক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় বলেছেন –"তরুণ নিমাই ঘোষ প্রায় ভগীরথের মতো উদ্ভাবনী প্রতিভায় জল এনে দিলেন সিনেমার খরাতপ্ত বঙ্গ ভূমিতে। আমরা বুঝলাম আমাদের ছায়াছবি যৌবনের দ্বারপ্রান্তে।"

॥ পাঁচ ॥

এই পর্বে এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটে যায় যে, ইতিহাস তা নথিভুক্ত করতে বাধ্য হয়। প্রথমত, ১৯৪৭ সালে সত্যজিৎ রায়, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, আর পি গুপ্ত, বংশী চন্দ্রগুপ্ত ও অন্যান্যরা প্রতিষ্ঠা করলেন কলকাতার প্রথম ফিল্ম সোসাইটি। উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃত চলচ্চিত্র রুচির উদ্‌বোধন।

দ্বিতীয়টি, জাঁ রেনোয়ার এবং পুদভ্‌কিনের মতো দুজন মহান চলচ্চিত্র স্রষ্টার কলকাতা সফর এই রুচি তৃষ্ণার সূচিমুখ উন্মুক্ত করে তুলল। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবেই জাঁ রেনোয়ারের কথা বলতে হয়। 'দ্য রিভার' ছবির শুটিংয়ে এসে বাংলার অপরূপ রূপে তিনি মুগ্ধ হন; এবং এখানকার জিজ্ঞাসু তরুণদের ঘনিষ্ট সঙ্গ দেন। যে তরুণরা চলচ্চিত্রে আধুনিক মনের আলো বিকিরণ করতে উৎসুক ছিলেন। এই মহৎ পরিচালকের ব্যক্তিত্বের প্রভাব সত্যজিৎ রায়, সুব্রত মিত্র, বংশীচন্দ্র গুপ্ত, তপন সিংহদের মতো প্রতিভার সংকল্পকে দিশা দিল। এবং সত্যিই ভারতীয় সিনেমায় এক ক্রান্তিকালের উদ্যোগ শুরু হল। রেনোয়ার-ই এই সকল তরুণকে বোঝালেন—"হলিউডের প্রভাব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিজেদের দেশি রুচি কখনো যদি গড়ে তুলতে পারেন, আপনারা তাহলে একদিন মহৎ ফিল্মের জন্ম দিতে পারবেন।" তিনি মনে করিয়ে দেন যে, শ্রেষ্ঠ মার্কিন ছবি বলতে গ্রিফিথ, চ্যাপলিন এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন পরিচালকের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে বুঝতে হয়। কিন্তু তার বাইরে হলিউডে বাজার চলতি ও গতে বাঁধা চিন্তারই পুনরাবৃত্তি। কলকারখানার উৎপাদনের মতোই ফিল্ম-উৎপাদনও সেখানে হয়ে উঠছে যান্ত্রিক। সৃজন-কল্পনা খেলাবার জায়গা সেখানে কম। রেনোয়ার বুঝিয়েছিলেন, ভালো ফিল্ম করার জন্য, বাস্তবের মর্ম শিল্পিত করার পক্ষে দৈন্য ভালো। তাঁর এই উপদেশ এদেশীয় তরুণ চলচ্চিত্রকারদের মনের জমি তৈরি করে দিয়েছিল। রেনোয়ার ও পুদভ্‌কিনের আগমন ঋত্বিক ঘটককেও চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতি অস্বাভাবিক উদ্দীপনা দান করেছিল।

তৃতীয়ত, ১৯৫২ সালে বোম্বাই, দিল্লি, কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল ভারতের প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। এই অভিজ্ঞতা কলকাতার শিক্ষিত দর্শক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সম্পূর্ণ নতুন চেতনার আলোড়ন নিয়ে এল। বিস্মিত বাঙালি দর্শক দেখল নিও-রিয়ালিস্ট রীতিতে তোলা ডি-সিকার 'বাই-সাইকেল থিভস্', রসেলিনির 'ওপেন সিটি রোম' এবং ভিসকান্তির ছবি; আরো কিছুদিন পর কুরোশাওয়ার 'রশোমন'। একটা স্থির বোধ কাজ করলো এই পরিবেশে যে, ফিল্মের নিজস্ব ভাষা বাস্তবের উপলব্ধিকে অমোঘ শিল্পরূপ দিতে পারে; যা দাবি করে দর্শকের নান্দনিক সংবেদন। সুতরাং চলচ্চিত্রের জন্য জীবন অন্যরকম আঙ্গিক চাইল। বিদগ্ধ সমালোচকের কথায়—"এই পরিস্থিতিতেই সম্ভব হয়েছিল একদিকে সত্যজিৎ-ঋত্বিকের মতো অসামান্য ও বিপরীতমুখী প্রতিভার উত্থান ও অন্যদিকে উত্তম-সুচিত্রা রোমান্টিক মেলোড্রামার অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তা। 'পথের পাঁচালী' দিয়ে আমাদের ভোর হল"। (সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়)

॥ ছয় ॥

দু-একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত ব্যতীত বাংলা চলচ্চিত্র যখন গতানুগতিকতার বদ্ধ ঘেরাটোপে আত্ম-অনুকরণের পুনরাবৃত্তিতে আত্মসত্তাই ধূসর করে তুলেছে—তখনই এক বিস্ফোরক ঘটনা ঘটে গেল বিস্ফোরক প্রতিভার হাত ধরে। সেই প্রতিভার নাম সত্যজিৎ রায়। চলচ্চিত্রে শিল্পসত্য জয়ের অঙ্গীকার নিয়েই তিনি আবির্ভূত হলেন। বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রকে তিনি একাই বিশ্বের দরবারে অবিস্মরণীয়তায় প্রতিষ্ঠা করে দিলেন। সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা প্রতিভা উন্মোচিত হয়েছিল, বলা যায়, জাঁ রেনোয়ার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য এবং ডি-সিকার 'বাই-সাইকেল থিভস' সিনেমার প্রভাবে। এই দুটি সংঘটন-ই তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে চলচ্চিত্র পরিচালনার কাজে উৎসাহী করে তোলে। এরপরই তাঁর অভাবনীয় ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে বিভূতিভূষণের

কালজয়ী উপন্যাস ‘পথের পাঁচালি’-র চলচ্চিত্রায়ন হয়। অভাবনীয়; কেননা, তিনি এ-সময়ে একেবারেই পূর্ব-অভিজ্ঞতাবিহীন কিছু যুবককে একত্রিত করে এই দুরূহ কাজে হাত দেন। এঁদের মধ্যে ক্যামেরাম্যান সুব্রত মিত্র এবং শিল্প নির্দেশক বংশীচন্দ্র গুপ্ত সারা বিশ্বেই স্বনামে স্বীকৃতি।

১৯৫৫ সালে সত্যজিতের ‘পথের পাঁচালি’ মুক্তি পাওয়ার পর এর প্রতিক্রিয়া ছিল উৎসাহব্যাঞ্জক। *The Times of India*—য় বলা হয়— “It is absurd to compare it with any other Indian Cinema... 'Pather Panchali' is pure cinema”। এই সিনেমা এবং সত্যজিৎ রায়ের একক প্রতিভাতেই এদেশের চলচ্চিত্র প্রকৃত শিল্প-প্রাণের স্পর্শ পেল। বুঝতে শিখল তার উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব। সত্যজিৎ রায়-ই এদেশীয় চলচ্চিত্রে পূর্ব–লালিত ধারণাকে বদলে দিলেন। এদেশের দর্শক প্রথম অনুভব করল যে, সিনেমার একটা নিজস্ব ভাষা আছে; তা সাহিত্যের ফোটোগ্রাফড ভার্সান নয়। তারা এ-ও বুঝল, সিনেমা শুধু বিনোদন নয়, তা দিয়ে বৃহত্তম শিল্পসৃষ্টিও সম্ভব। ‘পথের পাঁচালি’ শিক্ষিত ভারতীয় সমাজে একটা আলোড়ন নিয়ে এল। সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের ভাবনায় ‘পথের পাঁচালি’তে যখন অপু পাঠশালায় যাওয়ার জন্য চোখ মেলল, আমাদের সিনেমা দেখারও চোখ ফুটল। যেন দৈবানুগ্রহ। সত্যজিৎ রায়ই পথপ্রদর্শক, তিনিই প্রথম পথিক, রৌদ্রে, সিন্ধুর উৎসবে চলচ্চিত্রের অধিকার বর্ণনা করে গেলেন। আসলে এই সিনেমায় সত্যজিৎ রায় বাস্তবতার যে মর্মার্থ ব্যাখ্যা করেন, তা দিয়েই আমরা সিনেমার বর্ণপরিচয়ে অভ্যস্ত হয়ে উঠি। ছবি যে সংলাপের নয়, শব্দের নয়, এমনকি অক্ষরাশ্রয়ী সাহিত্যের শিল্পভূমি পেরিয়ে দৃশ্যাশ্রয়ী শিল্পবিগ্রহের পদপ্রার্থী — সত্যজিৎ রায় ছাড়া আমরা কোনওদিন কি বুঝতাম? এই যে কাহিনি নিরপেক্ষভাবে দৃশ্য স্বয়ম্ভর হয়ে উঠতে পারে — এই ঐতিহাসিক উপলব্ধির জন্যই ‘পথের পাঁচালি’ চিরস্মরণীয়। এই সিনেমাতেই সত্যজিৎ রায় অপরিসীম ঔদ্ধত্যে নিজের সবর্ণ, সগন্ধ ফুল ফোটাতে পেরেছিলেন। শুধু দৃশ্যপ্রেক্ষিত দান করে তাকে সম্মুখবর্তী করেছিলেন বলেই নয়; ভাবনার কুম্ভকে ছারখার করে কথকতার ইমেজকে তুলনারহিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বলেও নয়; বিশ শতকীয় আধুনিক চেতনায় শিল্পকে বিষয়ের ভারমুক্ত করেছিলেন বলেই। সিনেমায় বিষয়ের গুরুত্ব নগন্য— এমন ভেবেছিলেন আপলিনেয়ার। তাতে আখ্যানের ক্ষতি অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু যা পেলাম, তা হল — দেখা এবং অকিঞ্চিৎকরভাবে দেখা। এই দেখার কাজে দৃশ্য হয়ে ওঠে মূক প্রকৃতি ও আলোর খেলা। ‘পথের পাঁচালি’ সেই আলোকেই আদরণীয় করে তুলেছে। আর এখানেই সত্যজিৎ সমগ্র সত্তায় স্ব-কৃত চেতনার রূপকার হয়ে উঠেছেন। ‘পথের পাঁচালি’ থেকে ‘আগন্তুক’ পর্যন্ত তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিতে এই চেতনাই বিচিত্রপথে প্রবাহিত হয়েছে।

সত্যজিৎ রায় নির্মিত চলচ্চিত্রগুলি শিল্পমাত্রার সমস্ত উচ্চ প্রকোষ্ঠকে ছুঁয়ে গেছে। এগুলির নিবিষ্ট দর্শক হলে উপলব্ধ হয়, সুস্থির ও বিকাশশীল মণীষার আলোয় সত্যজিৎ আপন দেশ-কালের, স্বদেশের ইতিহাসের ‘অন্তর্গত সত্য’ নিজের সৃষ্টির ভুবনে শিল্পিত করে তুলেছিলেন। তিনি চলচ্চিত্রকে শুধু শিল্পশ্রী-ই দান করেননি, তাকে করে তুলেছেন সমাজ-মনেরই চলমান ভাষ্য। আর এই শিল্পভাষ্যকে স্থিতধী ধ্যানমগ্নতায়, কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণতায়, বিষয় ও আঙ্গিকের নব উদ্ভাবনী কল্পনায় সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে চালিত করে গেছেন। আর এই শিল্পভাষ্যের বৈচিত্র্যময় প্রয়োগের দুর্বার প্রতিভায় তিনি আজও আমাদের কাছে উজ্জ্বল আলোক-সূর্য হয়ে আছেন।

সত্যজিৎ রায়ের পরেই জীবনের মর্মসন্ধানী শিল্পদৃষ্টির বিচারে বংলা চলচ্চিত্রে এলেন বিস্ফোরক প্রতিভা ঋত্বিক ঘটক। ঋত্বিকের পরিবারে ছিল উন্মুক্ত শিল্পচর্চার আবহ। ৪৩-এর মন্বন্তর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ৪৬-এর দাঙ্গা, সর্বোপরি ৪৭-এর খণ্ডিত স্বাধীনতায় প্রাপ্ত ‘উদ্বাস্তু’ উপাধি—এই নিয়ে ঋত্বিককে বাধ্য হয়ে সপরিবারে ঢাকা ছেড়ে চলে আসতে হয় কলকাতায়। দেশভাগ তথা বঙ্গভাগকে ঋত্বিক মনে করতেন বাঙালির ‘স্থায়ী ট্রাজেডি’। আর এই স্থায়ী যন্ত্রণার অনুভূতি থেকে তিনি কখনো সরে আসতে পারেননি। তাঁর শিল্পও পারেনি; এমনকি তিনি দর্শককেও মুক্ত থাকতে দেননি। এই আবেগদীপ্ত ভাবালুতার জন্য তাঁর চলচ্চিত্রের কাহিনি ও উপস্থাপনা কখনো কখনো বাস্তবতার সীমা ছাড়িয়ে মেলোড্রামার

স্তরে পৌঁছে গেছে। অবশ্য তা নিয়ে তাঁর ভ্রূক্ষেপও ছিল না; তিনি বলতেন — "আমি চলচ্চিত্রের প্রেমে পড়িনি। চলচ্চিত্রকে জীবন সংগ্রামের একটা হাতিয়ার বলেই মনে করি।"

ঋত্বিকের পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্রের সংখ্যা মাত্র ৮টি। এক্ষেত্রে রাশিয়ান পরিচালক তারকোভস্কির মতো তিনিও প্রাচ্যদেশে হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি ছবির সূবাদেই হয়ে উঠেছেন আধুনিক চৈতন্যের নির্বিকল্প অংশ।

ঋত্বিকের সিনেমা সম্পর্কে বলতে গেলে একটা সাধারণ ঘটনা সবার আগে চোখে পড়ে, তা হল রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি। রবীন্দ্রনাথের কোনো কাহিনি নিয়ে কাজ না-করলেও তাঁর সিনেমার পরতে পরতে জড়িয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ। বিশেষ করে তাঁর সিনেমায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যবহার বিধ্বংসীপ্রায়। বলা যায়, মিথিক্যাল পুনর্নির্মাণের মতো। এমনভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যবহার ভারতীয় সিনেমায় আগে এবং পরে, কখনোই দেখা যায়নি। রবীন্দ্রনাথকে ঋত্বিক তাঁর সমস্ত ভাবনার উৎস বা প্রতিমেরু বলে মনে করতেন। একদা বলেছিলেন — "রবীন্দ্রনাথকে ছাড়া আমি কিছুই প্রকাশ করতে পারি না।"

ঋত্বিক এবং তাঁর শিল্প মূলত আবেগতাড়িত। জীবন ও শিল্পে শৃঙ্খলাময় বিন্যাস দীর্ণ করে তিনি শিল্পীর সৃজন উল্লাস অনুভব করেন। তাঁর প্রতিভার 'স্ব-ধর্ম' হলো বিস্ফোরণ। শিল্প ভাবনায় সত্যজিতের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলেন তিনি। প্রতিভার মারাত্মক বিস্ফোরণে তিনি সিনেমার সাজানো প্রচ্ছদ, তার ব্যাকরণকে ছিন্নভিন্ন করে দেন। অথচ অব্যর্থ অভিঘাতে তাঁর প্রতিটি সৃষ্টি আমাদের সংবেদন বিদ্ধ করে। আমরা পারি না উদাসীন থাকতে। তা সত্তার মূল ধরে টান দেয়। রক্তের ভিতর জাগায় তুমুল প্রতিক্রিয়া।

ঋত্বিকের রচনাকর্ম যে-সব ত্রুটির জন্য অতিখ্যাত (অসংযম, এলোপাথাড়ি ফ্রেম, অমসৃণ ন্যারেটিভ, এডিট জার্কস, পদে পদে কো-ইন্সিডেন্স, গল্পাংশ আরোপিত, ক্ষণভঙ্গুর, নড়বড়ে ইত্যাদি ইত্যাদি)— ছিন্নরেখ সেইসব পর্যায়ে আসলে একজন শিল্পীর আত্মার দার্শনিক অবস্থানকেই মূর্ত করে। ঋত্বিক মূলত দার্শনিক ও ইতিহাসকার। মেধার সর্বতোমুখী প্রকাশে তাঁর সিনেমাই প্রথম 'সেরিব্রাল প্রতিমা' হয়ে ওঠে। অত্যন্ত সচেতনভাবেই সাহিত্যাশ্রয়ী চলচ্চিত্রবোধকে বিসর্জন দিয়ে তিনি ঐতিহ্যাশ্রয়ী সন্দর্ভধর্মিতা আরোপ করেন। হলিউড শাসিত রৈখিক কাহিনি-বিন্যাস, ঘটনার ঘনঘটা, দৃশ্যাড়ম্বর তাই স্বাভাবিকভাবেই অস্বীকৃত হয়ে যায় তাঁর সৃষ্টিকর্মে। ফরাসি 'ন্যুভেল ভাগ'-র প্রধান সারথি জাঁ লুক গোদার যখন সিনেমার পর্দায় পরিসংখ্যান, রাজনীতি, দর্শন, কাব্য ও ব্যক্তিগত সংস্কার অন্তর্ভুক্ত করে সিনেমাশিল্পকে বর্ণনাধর্মের অভিশাপমুক্ত করেন— প্রায় তার সামান্য আগে-পরে প্রাচ্যদেশে এই কাজটি সুচারুভাবে করেন ঋত্বিক। যা প্রচলিত সিনেমা-প্লটের মায়াজাল ছিন্ন করে অনভ্যস্ত অভিনবত্বে বক্তব্যধর্মী হয়ে ওঠে। আর এই কারণেই তাঁর বৃহত্তর জীবননিষ্ঠ নন্দনভাবনা সার্বিক মেধায় ধারণ করতে আমরা অক্ষম থেকেছি।

একুশ শতকের শিল্পচেতনা যখন আমাদের বলে দিচ্ছে, ন্যাচারলিস্টিক অবরোহন নয়, বরং বাস্তবতার উচ্চতর ও কৃত্রিম আরোহণ আধুনিক স্রষ্টার অন্বিষ্ট—তখন দেখি, ঋত্বিক অনেক আগেই আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার দ্বারা জারিত হয়ে দেখিয়েছিলেন শিল্প আপাত সত্যের প্রতিরূপ নয়, বরং অধিকতর এক প্রতিমেরু; যা আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারে প্রকৃত সত্যের কাছাকাছি। অর্থাৎ, আজ অন্তত তিনি প্রমাণ করতে পেরেছেন মেলোড্রামাও একটা ফর্ম। দেশভাগের অতি প্রত্যক্ষ বাস্তবতাকে তাই তিনি বাস্তববাদের সমাধিমৃত্তিকা হিসেবেই মেলোড্রামাটিক আঙ্গিকে তুলে ধরেন। তাঁর সিনেমার বহু আলোচিত 'মাদার আর্কিটাইপ্যাল'-র ভাববীজও এই বাস্তব-ভাঙা বাস্তব-চেতনার ঊর্ধ্বসীমায় অবধারিত হয়ে পড়ে। জার্মান কবি-নাট্যকার ব্রেখটের চেতনার উত্তরধারক হয়ে তাই তিনি বলেন — "প্রতিমুহূর্তে আপনাকে হ্যামার করে বোঝাব যে যা দেখছেন তা একটা কল্পিত ঘটনা, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে যেটা বুঝাতে চাইছি আমার থিসিসটা বুঝুন — সেটা সম্পূর্ণ সত্যি...। যদি ভালো বোধ করেন তবে বাইরে গিয়ে বাস্তবকে বদলাবার কাজে নিযুক্ত হন।" 'নাগরিক' থেকে 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' — প্রতিটি সৃষ্টিতেই ঋত্বিক সমকালীনতার সীমা মুছে, কিংবদন্তি আর ইতিহাসের নিয়ত সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে বাস্তববাদের পাহারা অতিক্রম করে গেলেন। আর উত্তর প্রজন্মের জন্য একইসঙ্গে রেখে গেলেন যন্ত্রণা ও জয়মন্ত্র।

মনস্বিতার এই মৌলিক অভিজ্ঞান এবং সর্বার্থ-সার্থক বিকাশেই তাঁর সিনেমা 'এপিক' বিস্তার লাভ করে। বিশ্ব-চলচ্চিত্রে এ-ই তাঁর শ্রেষ্ঠ দান। এখানেই ঋত্বিক একক, অনন্য। এখানেই তিনি সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়, চলচ্চিত্র-অতিরিক্ত এক পরাক্রান্ত সংস্কৃতির উপস্থাপক।

এই সময়ের খুব গুরুত্বপূর্ণ আরেক নাম মৃণাল সেন। যাঁর শিল্পদৃষ্টি গঠিত হয়েছিল গণনাট্য আন্দোলনের অভিজ্ঞতায়। তাই স্বাভাবিকভাবেই তার ফিল্মে জীবনমুখী রাজনীতি মনস্কতা ও মানবিক অভিব্যক্তিগুলি 'মাস'কে (mass) অবলম্বন করে প্রসারিত হয়। তিনি সমকালের জটিল বাস্তবকে তুলে ধরেন মানবিক আবেগ-অনুভূতির প্রতিক্রিয়া বৈশিষ্ট্য সুনির্দিষ্ট এবং সুস্থিরভাবে চিহ্নিত করে। তবে মৃণালের শিল্প নির্মাণের ধারা এক-পার্বিক নয়; মোটা দাগে তা ত্রিপার্বিক।

প্রথম পর্ব 'রাতভোর' থেকে 'ইচ্ছাপূরণ' পর্যন্ত। এ পর্বের শ্রেষ্ঠ নির্মাণগুলি 'বাইশে শ্রাবণ', 'আকাশ কুসুম', 'ভুবন সোম'। বোঝা যায়, আত্মবিকাশের এই পর্বে তিনি যে বিষয়গুলি ধরেন, তাকে নিঃসন্দেহে বাংলা তথা ভারতীয় জীবনের যাবতীয় দুর্দৈবের মূল বলা যায়। 'ভুবন সোম'–এ যেন ফুটে ওঠে 'অবসিত গরিমা বুর্জোয়াতন্ত্রের প্রতি ঠাট্টা'। অর্থাৎ এই পর্বে মৃণালের ছবি সাংস্কৃতিক হানাদারি তৈরি করে না। দ্বিতীয় পর্বের উল্লেখযোগ্য সিনেমা 'ইন্টারভিউ', 'কলকাতা ৭১', 'কোরাস', 'পদাতিক', মৃগয়া' ইত্যাদি। এ পর্বের সিনেমায় মৃণাল গতানুগতিকতা ভাঙলেন। ফর্ম এবং আঙ্গিক নিয়ে ওলটপালট করলেন। এগুলিতে তৎকালীন রাজনীতি, সময়ের অস্থিরতা ও অবক্ষয়কে তুলে ধরলেন নিপুণ সমাজতাত্ত্বিকের পর্যবেক্ষণে। আর এ পর্বের প্রতিটি ছবিতে আমরা পেয়েছি এক 'অ্যাংরি ইয়ং ম্যান'–র ইমেজ। এই ছবিগুলিতে কলকাতার পরিসর দক্ষিণপন্থার বাস্তবতা ধারণ করে আছে। তাই 'কলকাতা ৭১'–র যুবকটি যখন সমুদ্র-অরণ্য-প্রান্তরের মধ্য দিয়ে দৌঁড়ায়, তখন বুঝতে পারি মৃণালের অধৈর্য ক্রঁফো–র 'ফোর হানড্রেড ব্লোজ' কে বড়ো ব্যক্তিগত অনুভূতির স্তরে পৌঁছে দিতে চাইছে। তৃতীয় পর্বে 'একদিন-প্রতিদিন', 'খারিজ', 'আকালের সন্ধানে', 'মহাপৃথিবী', 'অন্তরীণ' 'খণ্ডহর' ইত্যাদি ছবিতে মৃণাল ফিরে আসেন গল্পের পথে। অন্তর্মুখী, শান্ত, সমাহিত হয়ে। এগুলিতে তিনি মধ্যবিত্ত সমাজকে, তার নীতিবোধকে, তার ভঙ্গুর আদর্শকে অনুবীক্ষণে ফেলে যেন পর্যবেক্ষণ করেন।

সত্যিই, এত স্ব-বিরোধ, নিজেকে অনিঃশেষ পাল্টে নেওয়ার এত আবেগ আর কার মধ্যে আমরা দেখেছি? মৃণাল সেন সম্পর্কে সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় জাঁ পল সার্ত্র প্রসঙ্গ টেনে বলেন, মৃণালও বস্তুত 'সেলফ কনশাসলি কনটেমপোরারি'। আসলে মৃণাল সময়ের মধ্যে থেকেই সময়কে ছুঁতে চেয়েছেন। তিনি যেভাবে জীবনকে দেখেছেন, সে জীবন চূড়ান্তভাবেই জীবন্ত সময়ের গতিচিত্র। তিনি মূলত সেই জীবন পরিসরে স্ব-শ্রেণির ব্যর্থতা ও বিচ্যুতির-ই সমালোচক। কিন্তু এই সূত্রেই বলতে হয়, যা কিছু সাকার, তা-ই মৃণালের অবলম্বন।

বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রে সুবর্ণরথের এক বর্ণময় সারথি তপন সিংহ। তিনি বহু আলোচিত কিন্তু অনালোকিত। আসলে তপন সিংহকে দেখার চোখ সেদিনের শিল্পবোদ্ধাদের ছিল না। কারণ, আমাদের শিল্পবোধ যেমন একদেশদর্শী, তেমনি যুক্তি ও শৃঙ্খলার পারম্পর্যহীন। তাই ইউরোপীয় 'আর্ট' সিনেমার ভাষা শৈলীকেই চলচ্চিত্র নিমার্ণের শিখরপ্রদেশ ভেবে সত্যজিৎ এবং ঋত্বিককে 'মানদণ্ড' হিসেবে বিবেচনা করে বসেছিলাম আমরা। তপন সিংহের মতো শিল্পীও আমাদের বিচারে গৌন, অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়েছিলেন।

সতীর্থ সত্যজিৎ এবং হার্দ্য ঋত্বিকের সঙ্গে তাঁর চলচ্চিত্র ভাবনার প্রধান পার্থক্য এই যে, তিনি নব্যতার ভাষা ও পরিশীলিত শিল্প-টেকনিকের সঙ্গে একপেশে আপোস না করে এক অভিনব বিবর্তনরেখা অঙ্কন করতে চান। তিনি আজীবন বিশ্বাস করেছেন যে, সিনেমা যেহেতু একটা বাণিজ্য ব্যবস্থা, তাই তাকে যদি সুন্দরের অভিযানে যেতেও হয় সেই অভিযান বাণিজ্য সমর্থিত হতেই হবে। যদি সিনেমা স্বয়ংশাসিত হয়ও, তবু তাকে গল্পের উপর নির্ভরশীল থেকে যেতে হবে। তবে সেই গল্প বলা হলিউডি মার্কা হবে না, তা হবে আমাদের কথকতার ধরনে। তপন সিংহের ধারণা ছিল ছবির কোনো অধিকার-ই নেই বিমূর্ত হওয়ার; তাকে আলো-শব্দ-চিত্র দিয়ে বিচিত্র স্বাদের গল্প বুনে যেতে হবে। আসলে তপন সিংহের

মধ্যে ছিল স্বাদেশিয়ানা বা বাঙালিয়ানার মুদ্রা। বলা ভালো, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালিয়ানার বিস্তৃত মনোপরিসর। তাই যে মধ্যবিত্ত দারিদ্র-দুঃখ চেনে অথচ দীনতামুক্ত, যে মধ্যবিত্ত শব্দের সৌজন্যে হৃদয়ের উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য আকুল— তপন সিংহ তাদেরই প্রতিনিধিত্ব করেন। তাই তো সৃষ্টি হয় 'নির্জন সৈকতে', 'গল্প হলেও সত্যি', 'জতুগৃহ', 'ক্ষণিকের অতিথি', 'কাবুলিওয়ালা', 'ক্ষুধিত পাষাণ ', 'হাটে-বাজারে', 'ঝিন্দের বন্দি', 'বাঞ্ছারামের বাগান', 'হুইলচেয়ার', 'এক ডক্টর কি মওত' ইত্যাদি সিনেমা। এই সিনেমাগুলি থেকেই বোঝা যায় তিনি মধ্য-সিনেমার পথিক নন, বরং আমাদের ঐতিহ্য-সম্পৃক্ত মূল কাহিনি পথেরই এক সফল পদাতিক; মধ্যপন্থী নন, বরং একটি সাম্যাবস্থা। তার শিল্পরা কথা বলে, কিন্তু কোলাহল করে না; তার চরিত্ররা সংলাপমুখর, কিন্তু অতিশয়োক্তিপ্রবণ নয়।

এরকম অপ্রত্যাশিত কাহিনি নির্বাচনকে স্বাভাবিক প্রত্যাশার মধ্যে বুনে দেওয়া যে কত বড়ো কৃতিত্ব তা আজ বাংলা ছবির পতিত, কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত আবহাওয়ার মধ্যে বসবাস করে মর্মে মর্মে অনুভব করা যায়। সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়, তপন সিংহ-কে গৌণ, অকিঞ্চিৎকর ভেবে একদা যে পাপ আমরা করেছি, আজ তার প্রায়শ্চিত্ত করছি হতাশাগ্রস্ত দৈন্যে এবং তৃতীয় প্রজন্মের কাছে উপহাসিত হওয়ার লজ্জিত আশঙ্কায়।

ভেবে দুঃখ পেতে হয়, বারীন সাহার মতো পারঙ্গম পরিচালক মাত্র দুটি ছবি, 'তেরো নদীর পারে' এবং 'শনিবার' করে ফিল্ম জগৎ ছেড়ে গেলেন!

১৯৫৫-৬৪, পর্বটাকে বাঙালির চলচ্চিত্র চেতনার শ্রেষ্ঠ যুগ বলা যেতে পারে। সত্যজিৎ-ঋত্বিক-মৃণাল-তপনের সাথে সাথে এই সময় চলচ্চিত্রে এসেছিলেন বারীন সাহা, রাজেন তরফদার, অসিত সেন, পার্থপ্রতিম চৌধুরীর মতো বহুমাত্রিক প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ববর্গ। যাঁরা একঝাঁক শিল্পসমৃদ্ধ ছায়াছবি নির্মাণ করে বাঙালি তথা ভারতীয় দর্শকের চলচ্চিত্র চেতনাকে বেশ-কিছুটা উন্নত করে তোলেন। ১৯৬৫-৭৪, এমকি ৮০-র গোড়া পর্যন্ত আগের দশকেরই ধারা বজায় থাকল। এই সময় বাংলা চলচ্চিত্রে শিল্প-জনরুচি তৈরিতে সক্রিয় ছিলেন তরুণ মজুমদার, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, গৌতম ঘোষ, অপর্ণা সেন, নব্যেন্দু সেনের মতো শক্তিমান পরিচালকবৃন্দ। এ পর্বে রাজা মিত্র, অশোক বিশ্বনাথন ও বিপ্লব রায়চৌধুরীর কথা না বললে অপরাধ সীমা ছাড়ায়। এই প্রতিভা-সমূহের বিচিত্র ও বহুকৌণিক রশ্মিচ্ছটায় বাংলা চলচ্চিত্র এমন এক শিল্প পর্যায়ে উন্নীত হয় যে, বিশ্বের মানুষ চিরকালই এদেশের চলচ্চিত্র শিল্পকে সমীহের দৃষ্টিতে দেখবে।

এই শিল্পচেতনাঋদ্ধ ধারার পাশাপাশি বাংলা সিনেমার জনপ্রিয় ধারাটিও রুচিসিদ্ধ ভাবনায় অসাধারণ সাফল্যের সাথে তার গতিপথ নির্দিষ্ট করেছে। ১৯৫৫ সালটি যেমন 'পথের পাঁচালি' নামক শিল্প-সন্তানের জনক, তেমনি 'সাড়ে চুয়াত্তর'-র মতো জনরুচিরঞ্জনেরও ধারক। দুই ধারা যেন জীবন-সমাজের দো-রঙা পাখির মতো এদেশের সাংস্কৃতিক আকাশে ডানা মেলে দিল। এই ধারাকে ঐতিহ্য আর আধুনিকতার মেলবন্ধনে পুষ্ট করে চলেন অজয় কর, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, অসিত সেন, সলিল সেন, দীনেন গুপ্ত, নির্মল দে, অরুন্ধুতী দেবী প্রমুখ। এবং অগ্রদূত, অগ্রগামী, যাত্রিকের মতো দলগুলি। এঁদের ছবির সুবাদে আমরা এদেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের উত্থান ও প্রতিষ্ঠার সাক্ষ্য থেকেছি; যেমন— তুলসী চক্রবর্তী, রবি ঘোষ, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অনিল চ্যাটার্জী, জ্ঞানেশ মুখার্জী, সুপ্রিয়া দেবী, মাধবী মুখোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। আর অবশ্যই উত্তমকুমার ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। পেয়েছি ভারতের কিংবদন্তী জুটি উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেনকে। আবার এই সিনেমাগুলির সূত্র ধরে আমরা পেয়েছি সলিল চৌধুরী, নচিকেতা ঘোষ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুধীন দাশগুপ্তের মতো আরো ভারত-বিখ্যাত সুরকারদের। তৈরি হয়েছে শাপমোচন, সপ্তপদী, পলাতক, সাত পাকে বাঁধা, হারানো সুর, দ্বীপ জ্বেলে যাই, বালিকাবধূ, যদুবংশ, দাদাঠাকুর, অ্যান্টনী ফিরিঙ্গি, সন্ন্যাসী রাজা, উত্তর ফাল্গুনী, দাদার কীর্তি, দখল, দূরত্ব, পরমার মতো অসংখ্য অসংখ্য সিনেমা।

॥ সাত ॥

সমুদ্র মন্থনে অমৃতের সাথে বিষও ওঠে। বাংলা চলচ্চিত্রে ৭০ দশক থেকেই এই বিষের অভ্যুত্থান দেখা যায়, যখন রঙিন অতিনাটকীয় হিন্দি বাণিজ্যিক ছবি বাংলার শহরাঞ্চল ছাড়িয়ে মফঃস্বল ও পাড়াগাঁয়ে অবাধে প্রবেশ করল। বোধ হয় সেই থেকেই সাধারণ বাঙালি চলচ্চিত্র দর্শকের নিম্নগামিতার সূচনা হল।

১৯৭৭ সাল, রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গে এক বিরাট পরিবর্তন হল। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করা গেল, এই বছরেই বাঙালি দর্শক সবচাইতে বেশি দেখল 'বাবা তারকনাথ' সিনেমা। হ্যাঁ; সত্যজিৎ রায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি' কিংবা বিমল ভৌমিকের 'দিবারাত্রির কাব্য' সিনেমাকে অবলীলায় ম্লান করে সেইদিন রমরমিয়ে বাজার মাত করলো 'বাবা তারকনাথ'। সেই থেকেই বোধহয় চলচ্চিত্র রুচির অবক্ষয়ে সিলমোহর পড়ল। সেই থেকেই বাঙালি দর্শকের ভেতরে একটা সুস্পষ্ট বিভাজনরেখা দেখা দিল।

৮০-র দশকের মাঝামাঝি থেকে ৯০-এর শুরু পর্যন্ত বাংলা চলচ্চিত্র একটা প্রতিভাশূন্য এবং দ্বান্দ্বিক জটিলতায় ধোঁয়াশামগ্ন হল। এই সময়ে গৌতম ঘোষ, নব্যেন্দু সেন, তপন সিংহ, তরুণ মজুমদার, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, ঋতুপর্ণ ঘোষ বিশেষ প্রয়াসে বাংলা চলচ্চিত্রকে শিল্পমাত্রায় স্বতঃপ্রবাহিত রাখার প্রয়াস চালিয়ে গেছেন সাধ্যমতো। (কিন্তু, এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে সত্যজিৎ রায় জীবনের শেষ ছবি 'আগন্তুক'-এ প্রোটাগনিস্ট মনমোহন মিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়ে দিলেন যুগের অমোঘ সত্য —"দেশে এখন সবকিছুই নিম্নগামী"।) এইসময় রুচির বদল দেখা দিয়েছিল দর্শক সমাজে। তারা সিনেমাকে দেখতে শুরু করল জনমনোরঞ্জনের উপাদান হিসেবে। অঞ্জন চৌধুরী ও সুখেন দাসের মতো পরিচালক পেল বিপুল জনপ্রিয়তা। মেজ বৌ, ছোট বৌ, ত্রয়ী, গুরুদক্ষিণা, প্রতিশোধ, অমরসঙ্গী, শত্রু ইত্যাদি সিনেমা হল এই সময়ের চিহ্নায়ক। এমনকি বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না, রাজার মেয়ে পারুল, বাবা কেন চাকর ইত্যাদি যাত্রা পালা মার্কা নিম্নরুচির সিনেমা এদেরই উত্তরাধিকারীগণ বহন করে চলল। 'বাবা কেন চাকর' সিনেমাকে ব্যাপক দর্শক-প্রীতি লাভ করতে দেখে সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় বলেন—"অবশেষে আমাদের রুচি সংক্রান্ত মৌতাতের অবসান হল"। বোঝা যায়, বটতলার চটচটে ঐতিহ্য এখনো বঙ্গসংস্কৃতির একটা সমৃদ্ধ শাখা।

এরপর পুরো ৯০ দশক জুড়ে এক বিচিত্র মিশ্র জগাখিচুড়ি মার্কা সিনেমা তৈরি হতে লাগল। অতীতে বাঙালির সিনেমা সাহিত্যরসাশ্রিত যে নিটোল গল্প সম্বলিত ছিল — তার জায়গায় এসে গেল ঐতিহ্যহীন, পরিচয়হীন, ভালগার নাচ-গান আর হিংস্রতায় ভরা এক বীভৎস বিনোদনের ছবি। একুশ শতকেও তার জয়ধ্বনি সর্বব্যাপী। এই ধারার কীর্তিমান ব্যক্তিত্ববর্গ হলেন—স্বপন সাহা, সুজিত মণ্ডল, হরনাথ চক্রবর্তী, রাজা চন্দ, রাজ চক্রবর্তী প্রমুখ। এদের তৈরি সুজন সখি, সাথি, পাগলু, এমএলএ ফাটাকেষ্ট, খোকাবাবু, চ্যালেঞ্জ, বস্, রংবাজ ইত্যাদি ছবিগুলিই আজ রমরমিয়ে প্রেক্ষাগৃহ ভরায়। সিনেমা হয়ে ওঠে তাৎক্ষণিক উল্লাসের উগ্র পানপাত্র। তবু বলব, সিনেমা যদি দেশের আর্থিক সহায়তা করে থাকে, তবে এই জাতীয় সিনেমাগুলি তার উপযুক্ত রোজগারী কল।

এই ধারার একটা ভিন্নমুখ অতি সম্প্রতি নিজস্ব পরিচিতি নির্মাণ করেছে। কিছু এমন সিনেমা বর্তমানে তৈরি হচ্ছে, যেগুলি মেধাবী চতুরতা ও বিনোদনের দ্বৈত-মশলায় 'প্যারালাল' সিনেমার নামে আসলে বেশ চিত্তরঞ্জনী প্রসাদ বিতরণ করে চলেছে। রঙ-চঙা কন্টিনেন্টাল প্যাকেজে। এদের মধ্যে সৃজিৎ মুখার্জী, বাপ্পাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, অগ্নিদেব চ্যাটার্জী, সুব্রত সেন প্রমুখ যথেষ্ট খ্যাতনামা। আশ্চর্য হতে হয়, অঞ্জন দত্তের মতো প্রতিভাকেও যখন দেখি, এই দলে নাম লিখিয়েছেন। এঁদের সিনেমার এক বিশেষ রূপ আছে। সিনেমাগুলিতে আছে অসঙ্গত যৌনতার সুড়সুড়ি। আছে স্মার্টনেসের নামে বিকৃত শহুরে রুচির দেদার সমাবেশ। হলিউড এবং বলিউডের নির্লজ্জ অনুকরণ। কৃত্রিম ভঙ্গিসর্বস্ব নতুন মাত্রার বেলেল্লাপনা। আছে সুক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের নামে মনোবিকারের হুটোপুটি। উদ্দীপনার প্রবল প্রতিস্রোতে এগুলি সামাজিক ও শৈল্পিক দায়বোধের

ধার ধারে না। এর মধ্যে নেই মহত্তম দূরদৃষ্টির অভিক্ষেপ। নেই ঐতিহাসিক পুনর্মূল্যায়ণের আকাঙ্ক্ষা। অবশ্য এগুলি 'আলট্রা মডার্ন' শ্রেণির নাগরিক সমাজে ও উদ্দীপনাগ্রস্ত যুবসমাজের কাছে বেশ উপভোগ্য; এবং এর মার্কেটিং ভ্যালু বেশ উচ্চমাত্রার।

এখন কথা হল, বাজার চলতি যে সিনেমাগুলি আজকাল জনপ্রিয় হয়ে থাকে, সেগুলিকে কেবলমাত্র বাংলা সিনেমারই কলঙ্ক বলতে চাই না, সত্যজিৎ চৌধুরীর ভাষায় বলতে হয়, সেগুলো আদপে কোনো সিনেমাই নয়, তা কোনোরকম আলোচনার যোগ্যই নয়, যে বাঙালি দর্শকের আনুকূল্য পায় এই ছবিগুলি, তারা কারা? অর্ধ-শিক্ষিত, অশিক্ষিত, নিরক্ষর নয়তো কুশিক্ষিত শিল্পজ্ঞানহীন দর্শকের দল। এই দর্শকদের নেই সাহিত্যচর্চার পটভূমি, নেই শিল্পানুরাগের প্রকাশ; সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, ভালো আর মন্দকে চিনবার শক্তি-ও এদের নেই। তাই অপর্ণা সেনের 'যুগান্ত' দর্শক পায় না, কমলেশ্বরের 'মেঘে ঢাকা তারা' ফ্লপ হয়, বুদ্ধদেবের 'কালপুরুষ' হাতে গোনা লোক দেখে, কৌশিক গাঙ্গুলীর 'অপুর পাঁচালি'-র ক-জন খবর রাখে? হায়, মাত্র একশো বছরেই এই শিল্পমাধ্যম তবে কি শুধু ভোগ্যবস্তুতে পরিণত হল? জানি না, আগামি একশো বছরে এই মাধ্যম থাকবে কি না। থাকলেও তার চেহারা কেমন হবে, বলা মুশকিল। কিন্তু থাকবে মানুষ। থাকবে দর্শক। থাকবেই। তারা কোন সিনেমা দেখবেন, তাদের রুচি-প্রগতি কোন পথে এগোবে, তা সমাজবিজ্ঞানীর অনুসন্ধানের বিষয়। শুধু বলবো, আজকের অধিকাশ বাংলা সিনেমা ও চারপাশের দর্শকের যে চেহারা, তাতে উদ্বুদ্ধ হওয়া যায় না, বরং বিষণ্ণই হতে হয়।

তবে প্রতিকার আছে। এই শতকেই যদি একটা চলচ্চিত্র সংস্কৃতি গড়ে তোলা যায়। তবে সেক্ষেত্রে প্রথম কাজটাই হল— শিক্ষা, শিক্ষা এবং শিক্ষা; যথার্থ শিক্ষা। ব্যাপক মানুষকে শিক্ষা দিতে হবে। ফরাসি পরিচালক জাঁ লুক গোদারের ভাষা পৌঁছে দিয়ে এদেশের সকল সিনেমা-আমোদী মানুষকে বোঝাতে হবে— "a film is a film, is a film" |

॥ আট ॥

সবশেষে রাবীন্দ্রিক চেতনায় জেগে উঠে বলতে চাই, মানুষের অন্তহীন পরাভবকে চরম ভাবা সত্যিই পাপ। তাই বলব, বাংলা সিনেমার সার্বিক ঐতিহ্য বা পরিচিতি কিন্তু ৮০ এবং ৯০ দশকের বিকৃতির মধ্যেই আবদ্ধ নয়। এর মধ্যেই সব শেষ হয়ে যায়নি। যে অর্থে সত্যজিৎ, ঋত্বিক, মৃণাল, তপন সিংহ, বারীন সাহাদের পরে আসেন গৌতম ঘোষ, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, অপর্ণা সেন, ঋতুপর্ণ ঘোষ, তেমনি অল্প কয়েক বছরে বাংলা সিনেমায় দেখি বেশকিছু উজ্জ্বল মুখ। তাঁরা হলেন—সুমন মুখোপাধ্যায়, কৌশিক গাঙ্গুলি, কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, সুমন ঘোষ, অনীক দত্ত প্রমুখ। তৈরি হয় হারবার্ট, পদক্ষেপ, চতুরঙ্গ, শুন্য এ বুকে, ভূতের ভবিষ্যৎ, মেঘে ঢাকা তারা, নোবেল চোর, শব্দ, অপুর পাঁচালি, সিনেমাওয়ালার মতো অসাধারণ সিনেমা। যে সিনেমাগুলি রুচিসন্ধানী দর্শক থেকে শুরু করে ওয়াই-জেনারেশনের সফ্ট টেকনিকধর্মী মনকেও আকৃষ্ট করে চলেছে।

এই তো চাই। সিনেমার স্মার্ট পরিবেশনেও থাকবে জীবনের সারসত্য। থাকবে বৌদ্ধিক দ্বন্দ্ব, থাকবে শিল্পরসদৃষ্টি এবং পুনর্মূল্যায়ণের দাবি। এই সিনেমাগুলি দেখে বা পরিচালকদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মনে আশার সঞ্চার হয়। এ প্রত্যয়ও বোধহয় জাগে যে, বাঙালি তার চলচ্চিত্র ঐতিহ্যের যথার্থ উত্তরাধিকারে আবারও শিল্পমাত্রার মহান শৃঙ্গে আরোহন করবে। তাই হে বাঙালি দর্শক, আসুন, আমরা সেই বিশেষ দিনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করি। ঋত্বিক ঘটকের সেই মারাত্মক ঐতিহাসিক মন্তব্য মনে আছে তো—"আমার সিনেমা ফ্লপ নয়, দর্শক ফ্লপ"। সেই মন্তব্যের সত্য-সংঘটনের পরে আজ সলজ্জ অথচ দীপ্র উচ্চারণে সংকল্প করি—না, এবার দর্শক আমরা; আর ফ্লপ করবো না।

যাই হোক, চলচ্চিত্র হল পৃথিবীর আধুনিকতম শিল্পমাধ্যম। আর এই মাধ্যমকে শুরু থেকেই বাঙালি আপন কল্পনায় স্থান দিয়েছিল। একদা এই চলচ্চিত্র-ই হয়ে উঠেছিল পরাধীন জাতির রুদ্ধ-কণ্ঠের ঝংকৃত বাণী। উত্তরকালে এই শিল্প-ই হয়েছিল খণ্ডিত দেশের যন্ত্রনাদগ্ধ হৃদয়ের চিত্রবাণীমূর্তি। এবং জাতির প্রাণসত্তার বাধাহীন চলমানতার প্রতীক। তার

প্রতিবাদের, তার অধিকারের, তার সংকটের, তার অস্তিত্বের, তার মর্যাদার শিল্প সরাৎসার। আজ তা বিনোদন ও নান্দনিক সহাবস্থানে বঙ্গীয় রুচি নির্মাণের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। বলতে দ্বিধা নেই, আজ বঙ্গ–চলচ্চিত্র বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিচিত্র পথ সৃষ্টি করে জাতীয় মনকেই সহযাত্রী করে তুলেছে। বর্তমানে সিনেমাকে বাদ দিয়ে বঙ্গ সংস্কৃতি ও বঙ্গ-মনের মানচিত্র অঙ্কন করতে যাওয়া কষ্ট কল্পনা। হলেও তা হবে খণ্ডিত। তাই বলবো বাংলা চলচ্চিত্রের শতবর্ষ পেরিয়ে, ২০১৭ সাল, অর্থাৎ এদেশের সিনেমার আদিপুরুষ হীরালাল সেনের মৃত্যু-শতবর্ষের পর এই মাধ্যম নিশ্চই হয়ে উঠবে বঙ্গসংস্কৃতি তথা বঙ্গ-মনেরই রুচি-স্বীকৃত চলমান ইতিভাষ্য — এই স্বপ্নই না-হয় দেখি।

গ্রন্থঋণ :–

(১) বাংলা চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি — রজত রায়।
(২) অনভিজাতদের জন্য অপেরা — সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়।
(৩) সিনেমা নাটক গান – অভিজিৎ বিশ্বাস।
(৪) ফিল্ম নিয়ে — সত্যজিৎ চৌধুরী।
(৫) চলচ্চিত্র সমাজ ও সত্যজিৎ রায় — অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়।
(৬) সত্যজিৎ, ঋত্বিক, মৃণাল ও অন্যান্য — ধীমান দাশগুপ্ত।
(৭) ঋত্বিকতন্ত্র — সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়।

অনিশ রায় : সহকারী শিক্ষক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের গবেষক।

দুগগা দুগগা

.....

অরণ্যসূক্ত : পালামৌ

জঙ্গল আর নদীতে ঘেরা নিস্তব্ধ অরণ্যের সৌন্দর্য।
এখানে যেমন সুন্দর প্রকৃতি, তেমনই সুন্দর সব নাম ...
নদীর নাম কোয়েল, পাহাড়ের নাম হুলুক।
পালামৌতে অরণ্যদেবতার আহ্বান।
এখানেই হয়েছিল অরণ্যের দিনরাত্রি ছবির শ্যুটিং।
এক নিবিড় ভ্রমণের দিনলিপি লিখলেন **চৈতালী ব্রহ্ম**।

১.

ভীষণ থকে গেছি জানেন, কার্বন ডাই অক্সাইড, বাতাসে ধূলিকণার মাইক্রনের হিসেব, গাড়ির পেট্রোলের ক্রমবর্ধিত দাম, অবধারিত রাস্তা জ্যামের নিত্তনৈমিত্তিকতা, বড়ো শাহরিক হ্যাজার্ড। আর পারছি না ট্রাম বাস মেট্রো, গাড়ি, কলেজ খাতা পরীক্ষা মোবাইল ইন্টারনেটের ঘেরাটোপের বন্দিত্ব। আমাকে পালাতে হবে। চলুন, পালাবেন আমার সঙ্গে কয়েকদিনের জন্য? টিকিট কাটছি কিন্তু, ক্রিয়াযোগা এক্সপ্রেসের স্লিপার ক্লাস। চলবে তো? ওহ, এসে গেছেন? আসুন, আলাপ করিয়ে দিই, আমার ছেলে বাবু, বন্ধু পল, বুবু, তার মিষ্টি বউ, আমার বোন, আপনি আপার বাঙ্কে উঠতে পারবেন তো? এই দেখুন ট্রেনটা দেরি করে ছাড়ল আবার। ১০টা ১০-এর ট্রেন পৌনে এগারোটায় ছাড়ছে। নির্ঘাৎ কাল লেট করবে ঢোকাতে। এই বুবু, বাবু, ওঠ ওঠ, রাঁচি এসে গেছে। রাইট টাইম, ৭-টা ২০। ভালো টেনেছে রাতে। পল, ড্রাইভার ফোন করেছে? কী বললি? গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে আছে? চল চল, ছয় ঘণ্টা লাগবে কিন্তু মারোমার পৌঁছোতে।

আপকা নাম ক্যা হ্যায়? নীরজ? আচ্ছা নাম হ্যায়। চলো ভাইয়া, যাতে ওয়াক্ত সবই রেশন লেনা পড়েগা। দেশি মুর্গা মিলতা হ্যায়? চলো আগে যাঁহা পে বজার মিলেগা, ওহিপে খরিদারি কর লেঙ্গে। পহলে ইয়ে তো বতাও কাঁহা পে আচ্ছা নাশতা মিলেগা? ইস দুকান মে? এই সবাই নাম, ব্রেকফাস্ট ব্রেক। আমি কিন্তু ইডলি খাবো, তোরা পুরি খাবি? ভাইয়া ইয়ে চিজ ক্যা হ্যায়? "ধুসকা"? কিসসে বন্তি হ্যায়? চাওল অউর চানা দাল সে? এক কিসম কা পুরি হি হ্যায় তব তো। খাও খাও। পেঁড়াটা দারুণ। পল, নিয়ে নে গোটা বারো। যেতে যেতে দেখুন কেমন একটা মন্দির, জগন্নাথের। ব্যাস, হই হই করে নেমে পড়ল সবাই। আপনিও নামবেন? দেরি হয়ে যাবে কিন্তু মারোমার পৌঁছতে। বাবু, দ্যাখ দ্যাখ লাল গোল আলু, যা নেমে খেতের চাষীর কাছ থেকে নিয়ে আয় তো কয়েক কিলো। বুবু ওটা কী আনলি? মুলো আর কপি? বাহ। তুই রান্না করবি কিন্তু। আমি পারবো না। দেখুন জঙ্গল শুরু হয়ে গেছে। বুবু পাগলিটা যেখানে সেখানে নেমে যাচ্ছে ভালো লাগলেই। রাস্তায় বসে পড়ে ছবি তুলতে লেগেছে দ্যাখো। এখানেই তিনটে। মাঝে ভাত খেলাম যে হোটেলে, নিরামিষ মিলের দাম নিলো ১০০ টাকা থালি। জঘন্য খানা। ভাবা যায়? কলকাতায় এর চেয়ে ঢের ভালো থালি ৪০ টাকা ম্যাক্সিমাম। নীরজ ভাইয়া, আউর কিতনা দূরি হ্যায়? চার তো বাজ চুকে। ঘনে জঙ্গল মে তো ঘুস চুকে হাম। কিসিসে পুঁছনা পড়েগা মারোমার ফরেস্ট বাংলো কিধার। কোই দিখতা ভি নহি, সুনসান একদম। কোই ফোন কা টাওয়ার ভি নহি বি এস এন এল কে সিবা। আরে আগে দেখো, ওহি তো মার্ক কিয়া হুয়া হ্যায়, "মারোমার বন বিভাগ"।

লোহারডগা হয়ে অবশেষে পৌঁছনো গেল তাহলে। লম্বা লম্বা পিলারের উপরে কাঠের ট্রি হাউজ, যা আদতে আগে কাঠের খাম্বার উপরেই দাঁড়িয়ে ছিল। মাওবাদীরা নাকি কয়েক বছর আগে পুড়িয়ে দেওয়ায় আবার নতুন করে করা হয়েছে, তবে এবার পিলার সিমেন্ট কংক্রিটের। বিরাট ঘর, খাট বিছানা, বাথরুম, ড্রেসিং টেবিল বেতের সোফা, কিন্তু গরম জল নেই। সোলারের আলো। ছাড়া ছাড়া দুটো ট্রি হাউজ, একটা মূল বাংলো উইথ ডাইনিং রুম, বাগান, রান্নাঘর, কেয়ারটেকার মাহিন্দারকে রসদ দিলে বীরেন্দ্র, বলরাম আর মাহিন্দর মিলে রান্না করে দেবে। কিন্তু বুবু ফিল্ডে নেমে পড়েছে। ঠান্ডা জলেই কোনোমতে হাত পা ধুয়ে মাথা মুছে ফ্রেশ হয়ে সে রান্নাঘরে গেছে পকোড়া আর কফি বানাতে, আমি আর পারছি না বাপু, হট প্যাডের সেঁক নিতে নিতে কোমরের যন্ত্রণায় কাহিল হয়ে একটু ঘুমিয়ে নিই কেমন? পকোড়া হলে পল একটু ডেকে দিস প্লিজ। বুবুটা পারে বটে। কী কী রাঁধল শুনবেন? ও আপনিও তো খেলেন, আপনিই বলুন। মুলো দিয়ে মুলোর শাকের ঘণ্ট, আলু-ফুলকপির তরকারি, ঝুরো আলুভাজা, দেশি চিকেন, সালাড, পেঁয়াজকলিভাজা, ভাত। ঠাণ্ডা বুঝতে পারছি না ঠিক কতোটা। তবে ওয়েদার ফোরকাস্টে দেখে এসেছি রাঁচিতে এই কদিন ৩/৪ ডিগ্রি থাকবে। এই গভীর জঙ্গলে অন্তত তার চেয়ে ২ ডিগ্রি কম হবেই হবে।। খেয়ে উঠে বাবু, বুবু আর আমি একটু হাঁটতে যেতেই বলরাম জানাল হাতি আসছে রোজ রাতে কম্পাউন্ডের সামনে। গেট পেরোচ্ছে না। আমরা গেট পেরিয়ে দুপা যেতেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে নিজেদেরই হারিয়ে ফেললাম। আপনি না ডাকলে ফিরতেই পারতাম না জানেন? বুবু, তোরও ভয় লাগছে? আমারও একটু একটু হাতির জন্য ভয় লাগছে, তার চেয়ে চল বাবা ঘরে যাই। আরে আরে তাকিয়ে দ্যাখ, আজ তৃতীয়া, তাই না? একটা প্রায় গোল সোনার থালা সামনের পাহাড়টার ঠিক মাথার উপরে, সুব্রতদা, এই পাহাড়টার নাম কী বলুন না? ও, আলাপ করিয়ে দেওয়া হয় নি, রেঞ্জার অশোক সিংজি, বর্ধমানের সুব্রতদা, সঙ্গে পার্থদা, গত তিরিশ বছর ধরে সুব্রতদা এখানে আসছেন। আদিবাসীদের সাহায্য করেন সাধ্যমতো। মারোমার, লাতেহার, পালামৌ, মহুয়াডাঁড় হাতের তালুর মতো চেনা। চেনালেন, এই সেই বুদ্ধদেব গুহ খ্যাত হুলুক পাহাড়। এই সেই "হুলুক পাহাড়ের মাথায় চাঁদ"। কি এক সোনাগলা রঙের বন্যায় ভিজতে ভিজতে আমিও চাঁদের কাছাকাছি। অরণ্যগন্ধ আমাকেও মত্ত করে। পান করিনি শিভ্যাস রিগ্যাল, স্মার্ন অফ, বাকার্ডি। তবু আমি আকণ্ঠ মাতাল একটা গোটা চাঁদ গিলে ফেলে। অরণ্য একটু একটু করে এগিয়ে আসছে আমায় ঘিরে ফেলবে বলে। কালা চাট্টান, খুঁটিপাথর, আমাকে পুরো গ্রাস করে নিলো আজ অরণ্যদেবতা।

২.

রাতে বেশ ভালো ঘুম হয়েছে। সক্কালবেলা ঘুম ভেঙে গেছে। মোজা সোয়েটার মাফলার চড়িয়েই শুতে হয়েছে। বুবু ইলেক্ট্রিক কেটলিতে চা চড়িয়েছে। ভাই বীরেন্দ্র, এক বাল্টি গরম পানি আভি চাহিয়ে হি চাহিয়ে। কাল হাম নাহা নহি পায়ে গরম পানি না মিলনে কে বজেসে। যাই দেখি, রান্নাঘরের কি হাল। আজ তো লোধ ফলস দেখতে যাবো, খিচুড়িটা নিজেরাই বানিয়ে নিই কি বলেন? আমার রান্না চলবে তো? আমি কিন্তু বুবুর মতো ভালো রাঁধতে পারিনা। খিচুড়ি আর বেগুনভাজা করে ফেলি যাই। কী হল বাবু? ডাকছিস কেন? সুব্রতদা খুঁটিপাথরে নিয়ে যাচ্ছেন? দাঁড়া, খিচুড়িটা নামিয়েই আসছি। বাহ, দারুণ তো জায়গাটা? এটা কিন্তু সুব্রতদা আপনি না থাকলে হতো না। এর কথা তো টুরিস্ট জানেই না। এখানে কোন যুগলপ্রসাদ আর বিভূতিভূষণ শাপলা আর লিলির গেঁড় এনে এই জলাটায় পুঁতেছে? কি চমৎকার লাল শালুকের ঝাড়।

অক্সি নদী, মারোমার

খুঁটিপাথর, মারোমার

ওই তো, দলে দলে গরুবাছুর জল খেতে নামছে কুণ্ডিটায়। চাট্টানে ওঠার মুখেই দুই বৃহৎ দলা হাতির গোবর। হাতির পায়ের টাটকা ছাপ। হাতির দল এখানে জল খেতে আসে। এ এক ক্ষুদ্র সরস্বতী কুণ্ডি। জলদি জলদি, স্নান খাওয়া সেরেই বেরোতে হবে লোধ ফলস দেখতে। গাড়ি নিয়ে বেরুতে বেরুতেই সাড়ে দশটা। ভাগ্যে মহুয়াডাঁড়ের ফরেস্ট গেস্ট হাউজে থাকিনি। পলের কানেকশনে মারোমারেই চার রাত বুকিং করে দিয়েছিলেন ডেপুটি ডিরেক্টর মিঃ মহালিঙ্গম। মহুয়াডাঁড়ে অফিসের মতো বাড়িতেই গেস্ট হাউজ। রাস্তার উপরেই। মারোমারের মতো কুমারী জঙ্গলের ভিতরে নয়। আসুন, ইইম্যানুয়েল .'এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। আদিবাসী ছেলেটি লেখাপড়া শিখে এখন সরকারি চাকুরে। পাশের গ্রামেই বাড়ি। মারোমারের বেশির ভাগ গ্রামেই দেখি চার্চ আর খ্রিস্টান প্রাধান্য। মতিলাল পাদরী, অরণ্যের অধিকার মনে পড়ছে, তাই তো?

বারওয়াডি বনবাংলোটাও মন্দ জায়গায় নয়। পেরোলেই কোয়েলের পুল। এই গেটটা কিসের? ও ভাইয়া, রঙ্গনাথজী কা মন্দির কিতনা দূর হ্যায়? বহেনজি? ওহি যা রহে হো? চলো, পহোঁচা দেতে হ্যায় গাড়িসে। পাহাড়ি জঙ্গলের পথ ধরে খানিক গিয়ে মন্দির দেখে হতাশ। পুরনো ইটের ভেঙে পড়া ছাদবিহীন কাঠামোর সামনে নতুন ইটের গাঁথনি। রঙ্গনাথ তো জানি বিষ্ণুর নাম। অথচ মন্দিরের ভিতরে কয়েকটি পাথর রাখা যা দেখে বোঝা যাচ্ছে প্রাচীন আদিবাসী কোনো টোটেম হয়তো বা। কিন্তু আধুনিক একটি শিবলিঙ্গ সবার সামনে বিরাজমান। আর প্রচুর গাঁয়ের লোকে শিবের পুজো দিতেই আসে এখানে। লোকজ সংস্কৃতি প্রাচীনতা চাপা পড়ে যাচ্ছে হিন্দুত্ব আর নাগরিক সভ্যতার ছোঁয়ায়।

নন্দুজির সঙ্গে এর আগে দেখা করাতেই ভুলে গেছি দেখুন। নন্দুজি তিন পুরুষ ধরে মারোমারের ফরেস্টের সরকারি সেবক। এক তুলনাহীন ভদ্রবিনীত মানুষ। বুবু তাঁর নাম দিয়েছে দোবরু পান্না বীরবর্দী। একদম উপযুক্ত নাম। আমাদের গাইড। বয়েস বাষট্টি। লোধ ফলসে ওঠা বেশ খানিক কসরতের। নন্দুজি আমায় ধরে ধরে নিয়ে গেলো সেখানে। তবে বেশ ভিড়। সুন্দর আর জনসমাগম দুটোর যুগলবন্দী আমি ঠিক মেনে নিতে পারি না।

ফেরার পথে অক্সি বনবাংলোয় যাবো। সুব্রতদা বলে দিয়েছেন। মারোমারের চেয়েও ঘন অরণ্যের মধ্যে এক আধামাটির বনবাংলো, বাউণ্ডারি খানিক আছে, কিন্তু গেটটাও নেই, সোলার প্যানেল বসানো আছে বটে, কিন্তু ভরসা হেরিকেনের আলো, লকড়ি জ্বালিয়ে নিজে রান্না করে নিতে হবে। চৌকিদার সুশীল কোথায় গেছে কে জানে। জনপ্রাণী নেই। একটু টিলামতো উঁচুতে বাংলো, তারপরেই নেমে গেছে জঙ্গুলে ঢাল, ঢালের শেষে নদী, নাম অক্সি, সামনের পাহাড়টার নামও অক্সি। এই শব্দটা আমি আমার মতো করে নিলাম। অক্ষি। আঁখি মেললেই অক্ষির সম্মুখে সুন্দর তার সম্ভার সাজিয়ে রেখেছে আপনারই জন্য। বাংলো থেকে নদী দেখা যায়। নদীর ধারে এত সুন্দর বাংলো ডুয়ার্স ছাড়া কোথাও দেখিনি। কিন্তু এর বন্যতা অনেকগুণ বেশি। চারপাশে হাতি, চিতা, বুনো শুয়োর, সাপ, নেকড়ে ঘুরে বেড়ায়। কি, সাহস হবে এক দুই রাত অক্সি বনবাংলোয় কাটাবার? নেহাৎ মারোমারে রয়েছি, নইলে এবারেই আমরা....

নাঃ, অক্সির নদীতীরেই সূর্যাস্ত হয়ে গেল। গারুতে কোয়েলের ধারে অপার্থিব সূর্যাস্ত দেখা আজ আর হলো না। ওটা কালকের জন্য তোলা থাক।

আজ রাতে আরো দেরি করে চাঁদ উঠেছে। সবটুকু রসদ একবারে কেয়ারটেকারের হাতে তুলে দেবার ফল ভোগ করছি। গারুর হাট থেকে আবার রসদ কিনতে হল। ভাবতে পারেন, এক লিটার তেল এক দিনে শেষ দুধের প্যাকেটের পাত্তাই পাওয়া গেল না। তবে নন্দুজীর হাত দিয়ে দেড়শো কাটা ব্রয়লার মুরগি খরিদ করলাম। আমাদের কাছে চাইছিল ২৮০। ডাকাতমুলো বাণ্ডিল ১০ টাকা !, বেগুন ১০ টাকা কিলো, কপির পিস কুড়ি। শিম পনেরো টাকা কিলো। আলু পনেরো, কলকাতায় যাচ্ছে কিন্তু চোদ্দো। চাল চুয়াল্লিশ চাইছিল, বুবু দর করতেই চল্লিশে নেমে এলো। আজ ওরাই রান্না করুক যা পারে। কাল নেতারহাট যাওয়া আছে। বড্ডো টায়ার্ড লাগছে। একটু গা এলিয়ে সবাই এক ঘরে বসে গজল্লা করা যাক বরং।

সকাল হতেই আজ আমি ইমার্শন হিটার দিয়ে গরম জল বসিয়ে দিয়েছি। ওদের ভরসায় আর না। যাই, একটু জঙ্গলের ভিতরবাগে ঘুরে আসি এই সকালটায়। কাল হাতি এসেছিল। ঘরের লাগোয়া জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। চতুর্দিকে তাদের পায়ের ছাপ। জঙ্গলে একটা সুঁড়িপথ দেখে ঢুকতে যেতেই কয়েকটা বাচ্চা মেয়ে সতর্ক করল, হাতি হ্যায় মগর। এত ভোরে হাতি লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। তার চেয়ে বরং ঢুকেই পড়া যাক। ডালপালা সরাতে সরাতে অনেক দূর গিয়েও একটা জন্তুও দেখতে পেলাম না। জল গরম হয়ে গেছে। ফিরতেই হয়।

আজ নেতারহাট, ব্রিটিশ বনবাংলো, কোয়েল ভিউ পয়েন্ট, নেতারহাট ড্যাম, নাশপাতিবাগান, ম্যাগনোলিয়া পয়েন্ট আর ফেরার পথে কোয়েলের ধারে সূর্যাস্ত। মিনিট তিন চার লেট। সুজিমামা টুক করে ডুবে গেছে কোয়েলের জলে। মাঝে থেকে মান্দারের কাঠের কেল্লা মিস। কিন্তু কোয়েলের বুকে অস্তরবির শেষ আভায় ফোটোশুট আর আবার আসিব ফিরে আবৃত্তিতে তো বাধা নেই।

শহরের বাঁধা রাজপথ ছেড়ে অরণ্যপথে হাঁটি। তুমি আমি যাবো অচেনা আরেক নতুন প্রান্তখোঁজে। মহুয়া পিয়াল পলাশের রেণু মেখে আছে সেই মাটি। আদিম বন্য ঘ্রাণ।

৩.

তিন রাত হয়ে গেল মারোমারে। আপনি কি বোর হচ্ছেন? আরে কোয়েলের ধারে সূর্যাস্ত, মান্দার কেল্লা, হুলুক পাহাড়ের মাথায় ওঠা, সুগগা ড্যাম অবিশ্যি জরুরি নয়, বারবাড্ডি গ্রামের আদিবাসীদের হাতের কাজ দেখা, তপ্তপানি, এগুলো যে বাকি রয়ে গেল। নন্দুজির গ্রামে যাওয়া হয়নি। বাবু ঘুরে এসেছে। সুব্রতদারা থাকলে কুজরুমেও একবার যাবার চেষ্টা করতাম। মাওবাদিদের ডেরা। আশেপাশে তো সর্বত্রই তাই। হুলুক পাহাড়েও। হয়তো ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার ঠিক পাশেই। ওরা ট্যুরিস্টদের কিছু করে না। লোকাল লোকেদের বেশ সমর্থন আছে দেখলাম। ওরা আসার পর কাঠ চোরাই, ডাকাতি সব নাকি বন্ধ হয়ে গেছে। নন্দুজিকে ওরা ভুল করে পুলিশের চর ভেবে একবছর আগে হুলুকপাহাড়ে নিয়ে গিয়ে মেরে ঠ্যাং ভেঙে দিয়েছিল। কোনোমতে প্রাণে বেঁচে ফিরে এসেছে। তারপর ওরা জানতে পারে গদ্দার ওদেরই মধ্যে কেউ। খামোখা জখমি হলো নন্দুজি। নন্দুজি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। কারো চর নয়। কাজ ছাড়া কিছুতেই আগ্রহ নেই। জানপ্রাণ দিয়ে নিজের কাজ করে চলেন। যদিও জানেন সরকার বা মাওবাদী, কেউই তার আপনার নয়। তাই নতুন ডি এফ ও এলে তার ড্রাইভার নন্দুজিকে চমকায়, অরণ্যের সেবক বফাদার নন্দুজিকে শুনতে হয় বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় এক ড্রাইভারের কাছ থেকে "জঙ্গলকে সাথ গদ্দারি মত করো। ও সব জড়িবুটি দেকে লোগোকো ধোঁকা দেনে কি কোশিশ না করো। কম্পাউণ্ড কে অন্দর মত আনা"। অপরাধ? কি, না নন্দুজি গাঁয়ের লোকেদের জড়িবুটি দিয়ে ইলাজ করে। কোনো পয়সাও নেয়না। লোভ নেই দোবরু পান্নার। ছয়টি সন্তান। সবাই পড়াশুনো করছে। তাদের সরকারি চাকরি পাইয়ে দিয়ে তারপর চলে যাবার কথা ভাবে লোকটা। আমার সায়াটিকা আর নার্ভের কষ্ট সে নিজের চোখে দেখেছে আমার সঙ্গে হাঁটার সময়ে। তাই আমায় জানিয়েছিল যে তার যদি সময় থাকতো, আমায় ওষুধ দিয়ে সুস্থ করে দিত। এখন আমি পঙ্গুত্ব থেকে মুক্তি পাবার জন্য স্টেরয়েড বাদে যে কোনও ওষুধের দ্বারস্থ হতে রাজি। আর নন্দুজি পরদিন সকালে আমারই অনুরোধে কিছু শিকড়বাকড় এনে দিতে এসেছিল।

কোয়েল নদী

হুলুক পাহাড়

ও, বলা হয়নি, নতুন ডি এফ ও এসেই মারোমারে সবার বুকিং ক্যান্সেল করে দিয়ে নিজের সাঙ্গোপাঙ্গোদের জন্য ঘর খালি করার ফরমান জারি করে গিয়েছে। নেতারহাট থেকে ফিরেই শুনলেন না আপনি রেঞ্জার অশোক সিং জি এই সংবাদ পাঠিয়েছেন? কী? খুব চিন্তা হচ্ছে কাল এবার কোথায় যাবেন, কোথায় থাকবেন? আরে মশাই বড্ডো চিন্তা করেন আপনি। আপনার মতো পলটাও চিন্তায় পাগল হবার দশা। বুবু আর আমি বুঝলাম এবার আমাদের দুজনকে মাঠে নামতে হবে ব্যাটিং এর জন্য। আমরা মনে মনে ঠিক করেই নিয়েছি, কাউকে হাতেপায়ে ধরে মারোমারে কিছুতেই আর থাকবো না। নিশ্চিন্ত মনে গুছিয়ে টুছিয়ে নিয়ে রাতে খাওয়াদাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পল, আজ ২৮ তারিখ, মারোমার ছেড়ে চলে যাচ্ছি। যা যা রসদ আছে গুছিয়ে গাড়িতে তুলে নিয়ে আগে হিসাব চুক্তা কর দেখি। পালামৌ মানে, পলামু কিলা দেখতে যাবো আজ। তারপর বেতলা সাফারি। তুই বেতলায় যোগাযোগ করার চেষ্টা কর। না হলে ডাল্টনগঞ্জে অজস্র হোটেল তো আছেই। আর আমাদের ট্রেন তো ডাল্টনগঞ্জ থেকেই। এত ভাবিস না তো। উপভোগ কর উপভোগ কর প্রতিটা মুহূর্ত। আপনিও আনন্দ করুন দেখি। পরেরটা পরে দেখা যাবে। টা টা মারোমার। আর হয়তো আসা হবে না। প্রকৃতি ছেড়ে এবার যাই আগে ইতিহাসের পাতা একবার ঝালিয়ে নিতে।

বেশ কয়েকটা ইউটিউব ভিডিও দেখে পলামু আপার ফোর্ট সম্বন্ধে খুব আগ্রহ জন্মেছিলো। লোয়ার ফোর্ট, যা মানসিংহ বানিয়েছিলেন, দেড় দুই কিলোমিটার জুড়ে যার বিস্তৃতি, যা প্রায় চারশো বছরের বেশি পুরনো, তার সম্বন্ধে বেশি কিছুই জানি না। ভাবলুম, দ্রুত এটা দেখে তারপর উপরের কেল্লাটায় যাবো, যেখানে যেতে বেশ খানিকটা ট্রেক করতে হয়।

বিস্ময় পরতে পরতে লুকিয়ে রয়েছে নিচের কেল্লাতেই, তা আবিষ্কার করা তখনো বাকি। ভগ্নস্তূপ, কিছুই গোটা নেই। জঙ্গলে ঢেকে গেছে তোরণদ্বার, প্রাকার, স্তম্ভ, মন্দিরমুখ, রাজস্থানী ঘরানার মুরালের মতো লাল নীল সাদা কাঁচ পাথরের সূক্ষ্ম কারুকার্য আর স্থাপত্য, চিত্রকলা, ভিতরের ছাদের গম্বুজাকৃতি শৈলী ও শিল্প, সবই মুছে গিয়ে 'স্মৃতিটুকু থাক' হয়ে রয়েছে। হঠাৎই আবিষ্কার করলাম একটি সরু ভাঙা সিঁড়ি, (এখন কেবল পাথরের ভাঙা ধাপ) নিচে অন্ধকারে বিপজ্জনকভাবে নেমে গেছে। হতে পারে কোনো গোপন সুড়ঙ্গপথ, কেল্লা থেকে পালাবার, অথবা নিচে কোনো গোপন মন্ত্রণাগৃহ, গোলাকার, মাটির অনেক নিচে, উপরে খোলা আকাশ, কুয়োর মুখের মতো। কে জানে আগে উপরে ছাদ ছিল কিনা। বন্দিশালাও হতে পারে। কোনো তথ্য নেই। উৎসাহিত হয়ে বাবু আমি, বুবু পল একের পর এক আরো উপরে দুর্গপ্রাকারের চুড়োয় ওঠার পথ আবিষ্কার করতে ব্যগ্র হয়ে পড়লাম। যারা এখানে আসে, সকলেই ওই মূল প্রবেশ তোরণের লাগোয়া সিঁড়ি বেয়ে উপরে প্রাকারে ওঠে। আমরা তো তখন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশ মজুমদার, হিউয়েন সাঙ। চলেছি শরদিন্দুর মৃৎপ্রদীপের বিশ্বাসঘাতক বা মোং-কে খুঁজতে, কালের মন্দিরার গোপার মাকে খুঁজে বার করব বলে, রট্টা যশোধরা যে প্রাকারের ধারে বসেছিলেন সেই রকম এক কুড্য ও প্রাকারের শীর্ষে উঠতে চেয়ে আমরা সকলেই তখন দুর্গচূড়ার প্রাকার অলিন্দে গোপনে চোখ রেখে দুর্গ প্রহরারত বিশ্বস্ত প্রহরী। উপর থেকে সমস্ত পালামৌ জঙ্গলের সীমানা কোয়েল নদীসহ দৃশ্যমান। সময় অল্প। যেতে হবে উপরের কেল্লায়। দ্রুত এগোলাম। আমি অবশ্য শম্বুকগতি, হাতে লাঠি, কাঁধে জলের বোতল। অবশেষে পৌছোলাম উপরের কেল্লায়। ভীষণ আশায় ছাই পড়েছে সোনার ডিমের লোভে। জনারণ্যের মধ্যে এসে লাভ কি প্রকাশ ক্ষোভের? যা পেয়েছো, তাই না নিয়ে মরীচিকার পিছে ছুটলে যেমন, এখন পড়ো উপর থেকে নিচে। হায়, আমি হীরে ফেলে কাঁচ কুড়োতে এত পরিশ্রম করলাম? এখানে দলে দলে প্রেমিক প্রেমিকা আর কিছু বুড়বাক ইতিহাসানভিজ্ঞ অজ্ঞ লোকজনের বেজায় ভিড়। ভিতরটাও অতো বড়ো নয়। রাজা মেদিনী রায় তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্য উপরের এই কেল্লাটি বানিয়েছিলেন, কিন্তু তা অসমাপ্ত হয়েই রয়ে যায়। একটি অংশ মন্দির অংশ, ঘরও রয়েছে। তবে সবই সম্পূর্ণ ভেঙে পড়া। দুটি সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠা যায়। এটি যেহেতু আরো উঁচুতে, তাই সবচেয়ে উঁচু থেকে সারা পালামৌ আর নদীধারাকে দেখা যায়। সেখানে বীরবিক্রমে খোদাই করা, না হীর + রাঞ্ঝা নয়, সোনু + প্রিয়া। স্তাপত্য ও সৌন্দর্যের অতি সামান্যই অবশিষ্ট সেখানে। আর যা আছে, তা হল, প্রচুর প্লাস্টিকের খালি বোতল, থার্মোকলের থালা,

প্লাস্টিক প্যাকেট, গরুর গোবর, এমনকি বাচ্চার পরিত্যক্ত ডায়াপারও। ইতিহাসের কি বিপুল অপচয় ও অবজ্ঞা, অনাদর! অগত্যা আমিও প্রচুর সেলফি তুলে বিষণ্ণমনে নেমে এলাম। ফেলে রেখে এলাম ইতিহাসের ছিঁড়ে যাওয়া, হারিয়ে যেতে থাকা, উড়ে যেতে থাকা পাতাগুলি।

৪.

এই চারদিন প্রায় আপনাদের সবাইকে নিয়ে ঘুরলাম। এবার আমায় একদিন একটু একা থাকতে দেবেন দয়া করে? আমি নিজেকে খুঁজতে চাই। নিভৃত নির্জনের গান গাইবো আমি একলা বসে। শ্রোতা নয়, দর্শক নয়, সঙ্গী নয়, কেবল আমার আমিই সব আজকের দিনরাত্রির জন্য। আর এক অরণ্যের দিনরাত্রির জন্য। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, আজ আমি কেচকি বনবাংলোয়। এসেছি সন্ধ্যের সময়।

আচ্ছা, আপনি কি খুব সুখী প্রকৃতির? নানাবিধ অসুখে মানসিকভাবেও জর্জরিত? নির্জনতাকে ভয় পান? যাবেন না, যাবেন না খবর্দার এইসব জায়গায়। ইলেক্ট্রিক নেই, সোলারও নেই, কেবল দুটি ঘরমাত্র, তাতে ব্যাটারিতে একটি করে মৃদু আলো জ্বলে, বাথরুমে কমোড নেই, ইন্ডিয়ান স্টাইল, এমনকি আলোও নেই। মোমবাতি কিনতে হবে। বেসিনে জল নেই। বেসিনের পাইপ ফুটো। একটাই মগ। গরম জল করে দেবার কোনো ব্যবস্থা নেই। ফোন চার্জের কোনো বন্দোবস্ত নেই। গোল হয়ে ঘেরা বারান্দায় কোনো একটাও আলো নেই, মোমবাতিও নেই। ডাইনিং রুমের টেবিলটা জবরদস্ত, কিন্তু মোমের আলোয় ভুতুড়ে ছমছমে পরিবেশ। আয়না নেই, ঘরে টেবিল চেয়ারও নেই। রসদ দিলে চৌকিদার কমলেশের বউ ছটনি (আমি নাম দিয়েছি চাটনি, অরণ্যকন্যা সিমি গারেওয়াল নয় বটে, তবে ছিপছিপে মিষ্টি চটপটে ঝাড়খণ্ডি কন্যা) রান্না করে দেবে ঘরের সামনে টিনের চালওয়ালা সামনে খোলা এক গুমটিতে। ওর কাছে চাল আর ডাল ছাড়া কিচ্ছুটি নেই।

এই এক নেই'এর রাজ্যে বহুবছর আগে সত্যজিৎ রায় অরণ্যের দিনরাত্রির শ্যুটিং করতে এসে থেকেছিলেন বেশ কিছুদিন। চারিদেওয়ালে তাঁদের ছবি টাঙানো। বদলেছে কেবল টালির চালের বদলে টিনের চাল, বারান্দাটা গ্রিলের ঘেরাটোপে বন্দি হয়েছে। আর বাইরে একটা বাউন্ডারি ওয়াল দেওয়া হয়েছে। কেয়ারটেকার রবি জানাল, কাল সকালে দশটার মধ্যে ঘর ছেড়ে দিতে হবে। পরের কথা পরে হবে। আগে ঢুকে তো পড়ি। রেলগাড়ির লাইন পেরিয়েই দুইপা এগোলেই বাংলোর মূল ফটক। আর পিছন দিক দিয়ে আমাদের ঘরে ঢোকার গ্রিলের দরজা। পিছন দিকেও বাউন্ডারির শেষে একটা মস্ত লোহার গ্রিলের দরজা। ছোটো খোপ দরজা দিয়ে বেরোলেই ওয়াচ টাওয়ার, কোয়েল আর ঔরঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থল, বালুচর, ভাঙা ব্রিজ বাঁয়ে। ছুটির দিনের দুপুরবেলা অজস্র গাড়ি, পিকনিক পার্টি, বাস, প্রেমিকপ্রেমিকার দল, রান্নাবান্না, প্লাস্টিকের খালি বোতল, মদের ভাঙা শিশি, থার্মোকলের থালা গ্লাস বাটি। কুড়াদান দুটি, কিন্তু নদী উপচে পড়ছে ভেসে থাকা থালাবাটিবোতলে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বা সরকার, কারো তরফেই কোনো পাহারাদারি নেই, জরিমানা নেই। ইয়ে মেরা ডিজিটাল ইন্ডিয়া। রোজ সকালে কমলেশ আর পারমিন্দর ঝাড়ু হাতে নদীতীর সাফা করতে যায়, কুড়িয়ে সব কুড়াদানে ফেলে।

নীরজ, আমাদের গাড়িচালকও খুশ, আমরাও খুশ। চাটনিকে পকোড়া আর কফি বানাতে বলে আমি আর বাবু সন্ধের অন্ধকারে কমলেশের সঙ্গে গেলাম নদীতীরে। সব পরিযায়ী মানুষ পাখির বিদায়ের পর নদীচর ধূধূ, মাথার উপরে সলমাচুমকির ওড়না ফেলে দিয়েছে কালপুরুষ, সপ্তর্ষিমণ্ডল, কৃত্তিকা, ভরণী, বিশাখা, চিত্রা, মৃগশিরা, ছায়াপথেরা। লুব্ধক আমায় পথ দেখায় নির্জনতম বালুচরের। রাতচরা পাখি উড়ে চলে যায় পশ্চিম থেকে পুবে বুপ বুপ শব্দ করতে করতে। নদীর ওপারে গাঁয়ের ম্লান আলো আমায় জানায়, আমরাও আছি। নদীটুকু পার হয়ে এসো পায়ে পায়ে। জল গোড়ালির কিছু উপরে মাত্র।

ঔরঙ্গা নদী

লোধ ফলস্

ঠাণ্ডা মারোমারের চেয়ে বেশ কম। গতকাল মারোমারে শূন্য ডিগ্রি ছিল। সকালে বাবুকে বীরেন্দ্র দেখিয়েছিল পাতলা বরফের আলতো স্তর। খুঁটিপাথরের কুণ্ডীর জল থেকে ধোঁয়া উঠছিল। জলের উপরে সর পড়েছিল। কেচকিতে ২ ডিগ্রি মতো হবে। পল বাবু বুবু সব এক ঘরে বসে গল্প করছে। এইবার আমার একা হবার পালা। আমি পালালাম ঘর ছেড়ে। খানিক কম্পাউণ্ডের ভিতরে খোলা আকাশের তলায় হাঁটাহাঁটি, চাটনি নীরজ কমলেশ পারমিন্দর সব আগুনের আঙটায় আগুন পোয়াতে পোয়াতে গল্প করছে, চাটনির রান্না প্রায় শেষ। ভাত, ডাল, বাঁধাকপির তরকারি, আলুশিম ভাজা, পাঁপড়ভাজা।

বারান্দায় টেবিল পাতা, গোটা তিনেক চেয়ার প্লাস্টিকের। ওদের ঘরের দরজা ভেজানো, কোথাও কোনো আলো নেই। এর মধ্যেই চাটনি ডাইনিং রুমে খাবার আর মোমবাতি দিয়াশলাই রেখে ঘরে চলে গেছে। আমাদের খেতে এখনো ঘণ্টাদেড়েক দেরি। ওরা গল্প করুক। আমি এখন বারান্দায় একটা চেয়ারে পা তুলে দিয়ে আর একটা চেয়ারে বসে।

গান আমায় ছেড়ে চলে গেছে বহুদিন। না, আমি কোনো গায়িকা ছিলাম না। মোটামুটি সুর লাগাতে পারতাম আপন মনে, এই মাত্র। এলার্জেটিক এস্থমা আমার গলা থেকে দম, সুর, উঁচু স্কেল, আবৃত্তি, শ্রুতিনাটক অভিনয়, মডুলেশন সব কেড়ে নিয়েছে। আজ এই ঘন আঁধারে সুর এল চুপি চুপি আমার কাছে। ধরা দিল খানিক, ছুঁতে দিল। রবিঠাকুরের কাছে আমি আশ্রয় নিলাম। শ্রোতাবিহীন আমি নিজেকে নিজেই শোনাতে লাগলাম, চিরসখা হে, সখী আঁধারে একেলা ঘরে, আমার সকল নিয়ে বসে আছি, ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা, আমি রূপে তোমায় ভোলাবো না, ও যে মানে না মানা।

একটা সময়ের পর নিস্তব্ধতা আমার খুব কাছে এসে দাঁড়াল। দুদণ্ডের সঙ্গ চাইল সে। অখণ্ড নীরবতা নেমে এসেছে ঘোর অন্ধকার বাংলোর বারান্দায়। নক্ষত্রের আলোয় প্রাচীরের বাইরে নদীতীর প্রায় স্পষ্ট দৃশ্যমান। আর কয়েক মিনিট পরপরই নিস্তব্ধতাকে ছিন্নভিন্ন করে সামনে দিয়ে একের পর এক মালগাড়ি আর লোকাল ট্রেন ছুটে চলে যাচ্ছে উল্কার মতো। ছুটন্ত আলোর সারি শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত মিলিয়েও যাচ্ছে। তারপর নিস্তব্ধতা আরো গভীর হয়ে ধরা দিচ্ছে। রাতের কেচকির মোহ আমায় মাদকতার স্বাদ দিচ্ছে। আমার সব দুঃখ যন্ত্রণা এক অনুভূতিশূন্যতায় পরিণত হচ্ছে। আমি কেবল পান করছি রাত্রিরস। ডুবছি, ভাসছি, মাধ্যাকর্ষণ নেই এখানে। মাথার ভিতরে অদ্ভুত হাল্কা। বিনা পানীয়ের নেশায় আমি মাতাল।

পরপরই নিস্তব্ধতাকে ছিন্নভিন্ন করে সামনে দিয়ে একের পর এক মালগাড়ি আর লোকাল ট্রেন ছুটে চলে যাচ্ছে উল্কার মতো। ছুটন্ত আলোর সারি শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত মিলিয়েও যাচ্ছে। তারপর নিস্তব্ধতা আরো গভীর হয়ে ধরা দিচ্ছে। রাতের কেচকির মোহ আমায় মাদকতার স্বাদ দিচ্ছে।আমার সব দুঃখ যন্ত্রণা এক অনুভূতিশূন্যতায় পরিণত হচ্ছে। আমি কেবল পান করছি রাত্রিরস। ডুবছি, ভাসছি, মাধ্যাকর্ষণ নেই এখানে। মাথার ভিতরে অদ্ভুত হাল্কা। বিনা পানীয়ের নেশায় আমি মাতাল।

এই নেশা কাটাতে একা পলই যথেষ্ট। “এই, তোর ঠাণ্ডা লাগছে। অনেক ক্ষণ একা বসে আছিস। এবার খাবি চল।“ খাওয়া মানে তো মোমবাতির আলোয় ভুতুড়ে ছায়াচিত্রের নাচানাচি দেখতে দেখতে ঠাণ্ডা খাবার খাওয়া। বুবুকে ভূতের ভয় দেখাতেই আমায় নখ বার করে খিমচে দিল।

সব ভালোরই একটা শেষ থাকে। ২৯ ডিসেম্বর আমাদের সেই শেষ আনন্দের মুহূর্ত। সকালে ভাঙা ব্রিজে উঠেছিলাম, নদী পার হতে দেখেছি দলে দলে ওপারের মানুষ, সাইকেল, বাইক, ছাগল, গরু ভেড়াকে। কেচকির নির্জনতার সমাপ্তি। এবার তার সারাদিন ধরে ধ্বস্ত হবার পালা। বিদায় কেচকি। বিদায় পালামৌ। আবার আসার ইচ্ছে মনে রইল। যদিও জানি, অমৃত একবারই পান করা যায়।

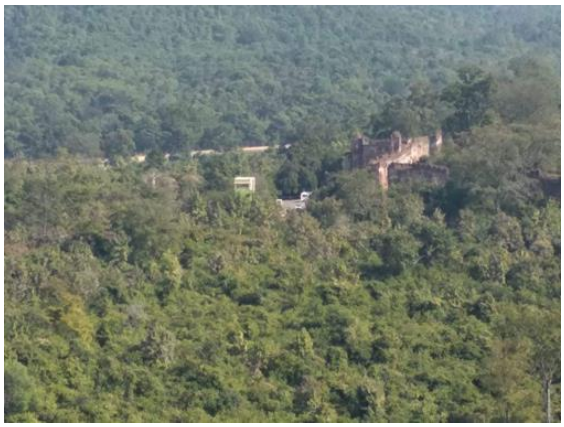

দূর থেকে আপার পলামু কিলা

আপার পলামু কিলা থেকে দৃশ্য

লোয়ার পলামু কিলা

পলামু কিলার ভেতরে

যে মেয়েটি বালি পার করে তোমাকে ছুঁয়েছে,

মনে রেখো,।

শীতের ঝরা নাশপাতি বাগান, নতুন পাতাদের জন্মক্ষণে লিখো আমারো নাম টি।

রাতচরা পাখি, ঋণ রেখে যাই,

ঋণী আমি নক্ষত্রের কাছে।

আদিম অরণ্য, বনভূমি, ভুলে যেও না।

কথা দিয়ে গেলাম, ফিরে দেবো সেই স্বাধীনতা।

তোমার বৃক্ষতলে আগামীতে আমি ভানুমতী হবো।

কেবল এইটুকুই, অপেক্ষায় থেকো।

চৈতালী ব্রহ্ম : কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সহযোগী অধ্যাপক এবং::‘এপার ওপার ইছামতী’ পত্রিকার সম্পাদক।

আন্তর্জাতিক পাঠশালা
ISSN 2230 - 9594

Our revered Referees – The Peer-reviewers :

Bengali :
Prof. Sumita Chakroborty, Former Professor, Burdwan University.
Prof. Sekhar Samaddar, Professor, Jadavpur University.
Dr. Rajyeswar Sinha, Associate Professor, Jadavpur University.
Prof. Arup Kumar Das, Professor, Calcutta University.
Prof. Prasun Kumar Ghosh, Professor, Calcutta University.
Prof. Soumitra Basu, Former Professor, Rabindra Bharati University.
Prof. Deblina Seth, Professor, Rabindra Bharati University.
Prof. Layek Ali Khan, Former Professor, Vidyasagar University.
Prof. Chanda Ghosal, Professor, Vidyasagar University.
Prof. Amal Pal, Professor, Visvabharati, Shantiniketan.
Dr. Sangita Sanyal, Associate Professor, Burdwan University.

Hindi :
Prof. Soma Bandopadhyay, Professor, Calcutta University.

Sanskrit :
Prof. Bijoya Goswami, Former Professor, Jadavpur University.

Santali
Dr. Dhaneswar Maji, Assistant Professor, Visvabharati University.

History :
Prof. Ratanlal Chakraborty, Former Professor, University of Dhaka, Bangladesh.
Prof. Balai Chandra Barui, Former Professor, Kalyani University.
Prof. Susnata Das, Professor, Rabindra Bharati University.
Dr. Ashish Kumar Das, Associate Professor, Rabindra Bharati University.

Political Science :
Prof. Ambarish Mukherjee, Professor, Political Science, Vidyasagar University.

Philosophy :
Dr. Samar Kumar Mondal, Associate Professor, Jadavpur University.
Dr. Tofajal Hossain, Associate Professor, Burdwan University.

সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে
বিশেষ ক্রোড়পত্র

সত্যজিৎ রায়ের ছবি আর লেখার মধ্য দিয়ে
আরেকভাবে খুঁজে দেখা তাঁর প্রতিভার বিভিন্ন প্রান্ত।
কখনো সামান্য আয়োজন কীভাবে অসামান্য এক দ্যোতনা সৃজন করে,
কখনো সময়ের অন্তর্ভুবন কীভাবে নির্মাণ করে তাঁর কথনশিল্প।
তাঁর চরিত্রের সঙ্গে তাঁর মনের সম্পর্কের গাথা।
এর সঙ্গে একেবারে অন্যদিক থেকে
অন্যতর মাধ্যমে কখনো কীভাবে নতুনতর হয়ে ওঠে তাঁর সৃজন
আর তাঁর চরিত্র কত ভিন্ন তাৎপর্যে হয়ে ওঠে বঙ্গজীবনের অঙ্গ।

সত্যজিতের *পরশপাথর* :
বৈভবের কল্পনা আর বিপর্যয়ের দুঃস্বপ্ন

একটি সময়ের আখ্যান। একটি সময়ের ভিতরের পর্বে কীভাবে
গাঁথা থাকে মানুষের মন আর আকাঙ্ক্ষা তার পর্যালোচনাতে **মানস ঘোষ**।

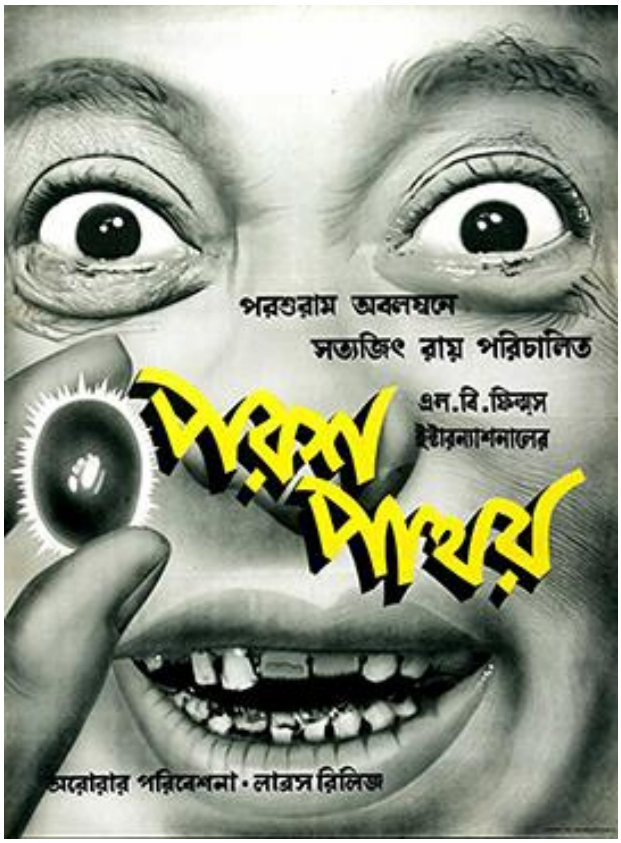

কীভাবে ক্লিষ্ট জীবনযাত্রা, হঠাৎ পাওয়া অর্থ, আরও ওপরে ওঠার লোভ আর সবশেষে পাহাড় চূড়া থেকে পতন মধ্যবিত্ত ব্যক্তি মানুষের জীবনকে বদলে দেয় তা বুঝতে সত্যজিৎ রায়ের *পরশপাথর* ছবিখানি দেখছিলাম আর একবার। ১৯৫৮ সালের ছবি, কিন্তু এখনো প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছিল বড়ো। গল্পটা রাজশেখর বসুর। কেরানি পরেশচন্দ্র দত্ত নেহাতই কৌতূহলবশত কার্জন পার্কে এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় কুড়িয়ে পায় একটি ছোট পাথর। পরে তিনি খেয়াল করেন এটি পরশপাথর। লোহা এই পরশপাথরের স্পর্শে সোনা হয়ে যায়। অর্থাৎ এবার তিপ্পান্ন বছর বয়সে কাজ-হারানো কেরানি পরেশচন্দ্রের একটা হিল্লে হল। অর্থাভাব আর থাকবে না। ছবিটি থেকে তিনটি দৃশ্যের কথা সবিস্তারে উল্লেখ করতে চাই মাত্র।

দৃশ্য এক। পাথরখানির অদ্ভুত গুণের বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে প্রায় ফিসফিস করে কথাটা স্ত্রীকে বলেন পরেশচন্দ্র। কিন্তু কী প্রবল দ্বিধা জড়িয়ে তার কথায়। স্ত্রী প্রবোধ দেন এতো আর চুরির ধন নয়। পরেশবাবু বলেন তার চেয়েও সাংঘাতিক, আরও সাংঘাতিক। (এ হল) যখের ধন। পরশপাথর, যা হয় না, হতে পারে না। একটা অজানা আশঙ্কা আর অপরাধবোধে আক্রান্ত হন পরেশবাবু। অসাধারণ তুলসী চক্রবর্তী অপূর্ব অভিনয়ে ফুটিয়ে তোলেন মধ্যবিত্তের দ্বিধাদীর্ণ মানসিক অবস্থাকে। মা কালীর ছবির নামনে পরেশবাবুর সে কি আকুলি বিকুলি! লোভের জন্য কত বিবেকের তাড়না!

দৃশ্য দুই। অবশেষে প্রাথমিক দ্বিধা কাটিয়ে পরেশচন্দ্র দত্ত সমাজে গণ্যমান্য হয়ে ওঠার আকাংখাটিকে লালন করতে শুরু করলেন। পড়ে পাওয়া সোনার দৌলতে তাঁর একদা দারিদ্র লাঞ্ছিত মুখে এখন চওড়া হাসি। জীবনটা পাল্টে গিয়েছে। বাড়ি, গাড়ি সভাপতির আসন, 'সৎ-কর্মে' ঢালাও অনুদান, সমাজে তজ্জনিত প্রভাব — এই পরেশচন্দ্র অন্য মানুষ। সস্তায় মিউটিনির লোহার গোলা কিনে সোনা বানিয়েছেন। সে সোনা বিক্রি করে বেশ কিছু শেয়ার কিনেছেন। এ বার নির্বাচনে জিতে জনপ্রতিনিধি হতে চান, টাকা আর সামাজিক প্রতিপত্তির জোরে। দ্বিধা আর অপরাধবোধ তার ভেসে গিয়েছে দুর্দম বাসনা্র স্রোতে।

দৃশ্য তিন। একটা পার্টিতে গিয়ে মাতাল হয়ে পরেশচন্দ্র পরশপাথরের বড়াই করে বসেন। ব্যস, পরদিন কাগজে বিরাট খবর প্রকাশিত হয় আয়রন টার্নস ইনটু গোল্ড। খবরটা ছড়িয়ে পড়ে আগুনের মতো। সকলেই ত্রস্ত। ভয়েস ওভার ভাষ্যে শোনা যায়, "৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ। কলকাতার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। সোনার প্রতি মানুষের আস্থা অসীম। এই আস্থার মূলে প্রচণ্ড আঘাত করেছিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত পরেশচন্দ্র দত্তের কীর্তিকলাপ, এই মহানগরীর তিরিশ লক্ষ জনতার মধ্যে সেদিন যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল তার তুলনা বিরল।... যারা অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী তাদের উত্তেজনার কারণ ছিল শেয়ার বাজার। সোনার মূল্যের সঙ্গে শেয়ার মূল্যের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য।" চমৎকার একটি মনতাজে সত্যজিৎ রায় ধরেন কীভাবে চায়ের টেবিল থেকে অন্দরমহল পর্যন্ত সামান্য সঞ্চয়টুকু হারানোর বিভীষিকা জনসাধারণকে উদভ্রান্ত করে তুলেছিল। স্বর্ণকারের দোকানগুলির সামনে বিপুল ভিড়। জমানো সঞ্চয় দিয়ে সোনা কিনে রেখেছিল মহানগরীর হাজার হাজার মধ্যবিত্ত মানুষ। পাগলের মতো সকলেই সে সোনা বেচে ফেলতে চায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

এছবিতে সত্যজিৎ একটা মহানগরীর মধ্যে তিনটে কলকাতাকে দেখান। একটা কলকাতা কেরানি পরেশচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অফিসপাড়া, স্বল্প মাইনের কেরানিকূল, ট্রাম, ভিড়ে-ঠাসা বিকেলের পাবলিক বাস, সরু গলির মধ্যে সস্তার বাসা, ময়দানের র‍্যাম্পার্ট, মাসের শেষে টানাটানির সংসার, অনুগ্রহপ্রার্থী নিম্নমধ্যবিত্ত নিস্তরঙ্গ জীবন। অন্য কলকাতাটা সম্পন্ন বড়ো মানুষের কলকাতা। বিরাট চকমিলান অট্টালিকা, বহুমূল্য গয়না আর আসবাবের বৈভব, ককটেল পার্টি আর ঝাঁ চকচকে হাল-ফ্যাসানের গাড়ি, দামী পোষাক। হঠাৎ বড়লোক পরেশবাবু আর অনুগ্রহপ্রার্থী নন, তিনিই বরং এখন বদান্যতা করার মালিক।

প্রাণপণে নিজের অতীতকে, অর্থাৎ অন্য কলকাতাটাকে ঝেড়ে ফেলতে চান তিনি। স্ত্রী মাঝেমাঝে বলেন পুরনো পাড়ার পড়শিদের কথা, ওরা সব কেমন আছে। পরেশবাবু বলেন, সর্বনাশ, তুমি এখনো ৩৬ নম্বর ছাতুবাবু লেনের কথা মনের মধে পুষে রেখেছ নাকি! ঝেড়ে ফেলো, ঝেড়ে ফেলো...। ওই দুটো কলকাতার মধ্যে বোধহয় সংলাপ সম্ভব নয়। একই নগরীর পেটের ভিতরে থেকেও তারা দ্য প্রিন্স অ্যান্ড দি পপারের মত তারা একে অন্যের থেকে অনেক যোজন দূরে। ধনী মানুষ পরেশবাবু তাই চিনতে চাননা গরিব কেরানি পরেশবাবুকে।

এই দুই কলকাতার পাশে কল্পনাকে প্রলম্বিত করে সত্যজিৎ আর একটা কলকাতাকে দেখে ফেলেন। সে হল বিপর্যয়ের কলকাতা। লোহা যদি সোনা হয়ে যায় তাহলে সোনার আর কী মূল্য থাকবে! আর সেরকম হলে শেয়ার বাজার পড়বে, ব্যাঙ্ক ফেল হবে, অর্থব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে! কয়েকজন আসন্ন বিপর্যয়ের আশংকায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়। কেউ কেউ আত্মহত্যার প্রস্তুতি নেয়। হাহাকার ছড়িয়ে পড়ে সারা শহর জুড়ে। মধ্যবিত্তের আপাত নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রায় সে কী উথালপাথাল জলোচ্ছ্বাস, সব বুঝি ভেসে যায়!!

১৯৫৮ সালে নির্মিত ছবিটিকে যেন আজও প্রাসঙ্গিক মনে হয়। সহজে অর্থ উপার্জনের লোভের কাছে আপামর মধ্যবিত্ত এভাবে আত্মসমর্পণ করবে, ফাটকাবাজদের হাতে পরকালের ভার তুলে দেবে একথা বোধ করি সত্যজিৎ রায় পাঁচ বা ছয়ের দশকের প্রথমার্ধে ভাবতে পারেননি। তাঁর তখনও বোধহয় বিশ্বাস ছিল যে মধ্যবিত্ত বাঙালি তার আত্মসম্মান অর্থের লোভে বিকোবে না। সত্যজিতের *মহানগর* ছবিটির উল্লেখ করেই এরকম দাবি করা যেতে পারে। প্রধান চরিত্র সুব্রত একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্টেন্ট। একদিন সকালে সে আপিস গিয়ে দেখে ব্যাঙ্ক ফেল করেছে। গেটে নোটিস ঝুলছে। ক্ষিপ্ত আমানতকারীদের হাতে সে মারও খায়। তার চাকরিও চলে যায় বলা বাহুল্য। এহেন দুর্দিনে সংসারের রোজগার একমাত্র স্ত্রী আরতির চাকরির মাইনে। একদিন এক সহকর্মিনীর প্রতি ম্যানেজমেন্টের অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবাদ করে চাকরি ছেড়ে দেয় আরতি। কর্মহীন কিন্তু সত্যনিষ্ঠ দম্পতিকে আমরা দেখি কলকাতার জনস্রোতে মিশে যেতে। সংসার প্রতিপালনের জন্য ছোটখাট চাকরি ঠিক জুটিয়ে নেবে তারা। তাই বলে আত্মসম্মান তো বিকানো যায়না। দু'টো পয়সার জন্য অন্যায়কে তো আর বরদাস্ত করা যায় না অর্থকষ্ট যতই থাক। *মহানগর* ছবিতে সত্যজিতের কাব্যিক বাস্তববাদ দর্শকের চোখ জুড়িয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, একটা দরিদ্র কিন্তু ক্লেদহীন মধ্যবিত্ত জগৎ তাঁর ছবির প্রায় প্রতিটি দৃশ্যেই ফুটে ওঠে একটা ব্যস্ত কিন্তু জীবনমুখী মহানগরকে তাঁর ক্যামেরা সযত্নে ফুটিয়ে তোলে। একটা আলোকপ্রাপ্ত উনিশ শতকের ঐতিহ্য প্রত্যয়ের সঙ্গে সত্যজিৎ রায় উদযাপন করেন এ ছবিতে।

কিন্তু বিধি বাম। সত্যজিৎ রায় ছয়ের দশকের শেষ দিকে এসে নির্লোভ আলোকপ্রাপ্ত মধ্যবিত্তের উপর আর তেমন ভরসা করতে পারছেন না। *অরণ্যের দিনরাত্রি* হয়ে যখন *জন অরণ্যে* প্রবেশ করছেন ১৯৭৪ সালে, ততদিনে মধ্যবিত্ত জীবনে আলোকপ্রাপ্তির চিহ্ন প্রায় বাতাসে মিলিয়ে এসেছে। আসলে উনিশ শতকের আলোকপ্রাপ্তি তো আর কেবল রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথেদেরই জন্ম দেয়নি। হুতোম-কথিত বীরকৃষ্ণ দাঁ-দের মতো হীন, লোভী, কূট, দুর্বিনীত ও ধনী অর্থপিশাচদেরও জন্ম দিয়েছিল। সত্যজিৎ রায় হয়তো তাঁর যুগের আরও অনেকের মতোই বিশ্বাস করতেন যে রামমোহন বা রবীন্দ্রের প্রতিভার কাছে বীরকেষ্ট দাঁ-র মতো মুৎসুদ্দিদের ঐতিহাসিক পরাজয় ঘটে গিয়েছে। *জন অরণ্য*-এ এই সব বীরকেষ্টদের ফেরত আসতে দেখেন তিনি। এরা দালালির অর্থে সমাজটাকে কিনে নিতে চায়। যেকোনও উপায়ে বিপুল ধনী হওয়াই এদের উদ্দেশ্য। এরা দৃঢ় প্রত্যয়ী যে অসদুপায় ছাড়া অর্থ উপার্জন হয় না, দুর্নীতি ছাড়া কার্য উদ্ধার হয়না। প্রগতিশীল বুর্জোয়ার কোনও চিহ্ন দূরবীন দিয়েও সত্যজিৎ দেখতে পাচ্ছেন না সাতের দশকের সমাজে। মুৎসুদ্দি হওয়া ছাড়া, দালালির ফাটকা অর্থ ছাড়া যেন ভবিতব্য নেই।

কলকাতার রাস্তায় প্রধান চরিত্র সোমনাথকে অনুসরণ করার ছলে ক্যামেরা দ্রুত রাজনৈতিক পট পরিবর্তন দেখায়। 'সত্তর দশক মুক্তির দশক' – স্লোগানটি দেওয়ালে আঁকা আছে দেখি ছবির শুরুতে। বছর ঘুরতেই সত্যজিতের ক্যামেরা দেখায় কারা যেন ওই স্লোগানের উপর বুলিয়ে দিয়ে গয়েছে কালো কালি। মুছে ফেলতে চেয়েছে শ্লোগানগুলোকে।

সোমনাথ চাকরিপ্রার্থী বেকার। একদিন বড়বাজার অঞ্চলে রাস্তায় দেখা হয়ে যায় ময়দানে পরিচয় হওয়া বিশুদার সঙ্গে। বিশুদা তাকে বলে ব্যবসায় নামতে। সোমনাথ রাজি হয় অগত্যা। এই বার সত্যজিতের ক্যামেরা এসে পড়ে এমন একটা জগতে যেখানে বিনা মূলধনে ব্যবসা করা যায়। কী সেই ব্যবসা – দালালি বা মিডলম্যানগিরি। বিশুদা তাকে বোঝায়, এ ব্যবসায় মূলধন লাগেনা। সততা লাগেনা। বিশুদা বলে, ব্যবসার কোনও শেষ নাই। কত রকমের ব্যবসা আছে জানো? হাজার হাজার টাকা... যে ধরতে পারে সে দু'হাতে লুটে নিচ্ছে।

পরদিন সোমনাথ আসে বিশুদার অফিসে। তার সঙ্গে ইতিমধ্যেই বিশুদা (উৎপল দত্ত)-র মতো আরো দু-একজনের আলাপ হয়েছে, যেমন হীরালাল ব্যানার্জি (সন্তোষ দত্ত), মিস্টার মিত্তির (রবি ঘোষ)। ব্যবসার জগতে ঢুকে পড়ে সোমনাথ বিশুদার হাত ধরে। তিন তিনটে কোম্পানি খুলে ফেলে বিশুদার পরামর্শে। একটা আসল বাকি দুটো ঝুটো। বিশুদা বলে এটাই নাকি দালালি ব্যবসার দস্তুর বা স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস! এই মহানগরীর মধ্যেকার এমন একটা জগৎ আর এমন সব চরিত্ররা উঠে আসে এ ছবিতে যে চমকে যেতে হয়। পড়তে হয় অস্বস্তিতে। অবশ্য অস্বস্তি ততক্ষণই, যতক্ষণ কেউ সোমনাথের চোখ দিয়ে দেখছে ওই দালালির ব্যবসাকে। যার কিনা দ্বিধা আর সঙ্কোচ হয় মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ ঝেড়ে ফেলতে। কিন্তু বিশুদা, হীরালাল, মিত্তির বা আর সবাই এ জগতে বিপুলভাবে সফল আর অপর্যাপ্ত সুখী।

নিশ্চয়ই এ ছবির দু-আড়াই দশক পরে যে মিডলম্যানদের আমরা বিশ্বায়িত খোলা বাজারে দেখব তারা বিশুদাদের তুলনায় অনেক বেশি সফিসটিকেটেড। অনেক বেশি ধনী। এরা অনেক দ্রুত বিত্তবান হয়ে উঠছে আজকাল। কিন্তু কী উপায়ে? ফাটকা পুঁজি আর দালালির গুণেই, অন্য কোনও গূঢ় রহস্য নেই। অপু বা চারুর উত্তরসূরিরা কোথাও নেই। কিন্তু বীরকেষ্ট বা বিশুদার উত্তরসূরিরা আশ্চর্য দাপটে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাদের চারপাশে। হে ক্লান্ত, বিষণ্ণ, ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত বঙ্গদেশ ... !!

মানস ঘোষ : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, চলচ্চিত্র বিভাগের সহযোগী আধ্যাপক।

সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে মিনিমালিজম

সামান্য উপকরণে সামান্য আয়োজনে কতখানি গভীর
এক দ্যোতনা তৈরি করতে পারে সত্যজিতের ছবি, তার অনুপুঙ্খ সন্ধানে **অভীক মজুমদার**।

জন্মশতবর্ষে সত্যজিৎ রায়ের ছবি স্মরণ করার সময় আমাদের স্মৃতিতে আসে তাঁর ছবির চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা, এবং তার সাথে সংগীত। সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্রের জন্য সুর রচনায় পাশ্চাত্য সংগীত বেশি পছন্দ করতেন। তত্ত্বগতভাবে তিনি পশ্চিমের ধ্রুপদী সংগীতকে কাহিনিচিত্রের গঠনের ছন্দনির্মানে বেশি প্রাসঙ্গিক বলে মনে করতেন। কারণ সেখানে অল্প সুর আর ছন্দের ওঠানামায় গল্পের পটভূমি তৈরি করা যায়।

ইউরোপীয় নবজাগরণএর আলোকপ্রাপ্ত বা-ঙালি রেণেশাঁর আধুনিকতার নানাক্ষেত্র নানান দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর ছবির বিষয় হয়ে উঠেছে। ১৯৫৫ থেকে ১৯৯১ প্রায় বছর পঁয়তিরিশের তাঁর চলচ্ছবির চর্চা এরপরেও কতযুগ ধরে বাংলা সিনেমার ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানের আলো দেখাবে। ছবি করার এত বৈচিত্র এত রকম জঁর ও চরিত্র নিয়ে তাঁর কাজ, এতরকম মানসিক অবস্থার চিত্রায়ণ, অথচ প্রতিটা উপস্থাপণেই কত পরিমিত তিনি।

আজকের পোস্টমর্ডান যুগের পৃথিবীতে 'মিনিমালিজম' বা 'নুন্যতমবাদ' শব্দটি খুবই প্রচলিত। রাস্তায় বেরোলে হোর্ডিংয়ে হোর্ডিংয়ে বিজ্ঞাপন, শপিংমলের মাথাঘোরানো পণ্যের হাতছানি। এত পণ্য যা দিয়ে মানুষ নিজের অস্তিত্বের দাম তৈরি করার নেশায় ক্রমশ চাপা পড়ে। সেখানে সামান্য কিছু জিনিস দিয়ে নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে নেওয়ার নামই মিনিমালিজম। এই দর্শন শিল্পে ও জীবনে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন বলেই হয়ত এত কিছু সমস্যার মধ্যেও তিনি একের পর এক ছবি করে যেতে পেরেছিলেন।

মাত্র সাড়ে ছ হাজার টাকায় একটা গোটা ছবির কাজ শেষ করা। স্যুটিং এর আগে প্রতিটা শট্ আগে এঁকে নেওয়া। অলঙ্করণের সময় মুলত স্কেচের ব্যবহার। সামান্য মোটিফের ব্যবহারে গল্প বলে যাওয়া। এখানে আমরা 'পরশ পাথর' (১৯৫৮) এর সেই পাথর হজম হয়ে যাওয়ার সেই দৃশ্যটার কথা মনে করতে পারি। ছবিতে পরেশ দত্ত (তুলসী চক্রবর্তী) যখন তাঁর সোনা তৈরির পাথর তার তরুণ সেক্রেটারি পরিতোষ হেনরি বিশ্বাস (কালী ব্যানার্জি)-র হাতে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন এবং পরিতোষ প্রেমে ব্যার্থ হয়ে সেটি গিলে ফেলে। অতএব তার পেটে ছবির এতক্ষণের অ্যালকেমিময় প্লটটি জায়গা পায়। এবার বিষয় হল পাথরটি পরিতোষের পেট কেটে পুলিশ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অন্তরের মধ্যে গ্রাস করতে পারল কি পারল না? পরেশ দত্ত'র বড়লোক হওয়ার যে ফ্যান্টাসি যা সে তার সন্তানতুল্য নতুন প্রজন্ম পরিতোষ'কে দিয়েছিল সেই রুপকথা কি বাস্তবের দখলে চলে আসবে? হলিউডের ছবিতে আজকের বিখ্যাত এক চলচ্চিত্রকারের নাম হল গুয়েলেরমো ডেল তোরো। মেক্সিকান এই চিত্রপরিচালক তাঁর ছবি 'প্যান্স ল্যাবিরিন্থ' বা 'দ্য সেপ অব ওয়াটার'এ রিয়েলিটি এবং ফ্যান্টাসিকে তাঁর কাহিনি বলার নৈপুণ্যে অদ্ভুত এক সীমারেখা দিয়ে হাঁটাতে পারেন। কিন্তু এই ডেল তোরো, স্টিভেন স্পিলবার্গদের কাছে যে টাকা আছে তা আমাদের সত্যজিত রায়ের কাছে কোনোদিনই ছিলনা। তাই তিনি মাত্র তিন চারটি এক্স-রে প্লেটের মধ্য দিয়ে পাথরের ফ্যান্টাসির কল্পনা মানব যকৃতের মধ্যে হজম হয়ে যাওয়ার চমৎকার দৃশ্য সৃষ্টি করে ফেলেন।

'The task of art today is to bring chaos into order" – প্রখ্যাত তাত্ত্বিক থিওডর অ্যাডরনোর এই বিখ্যাত উক্তিটিকেই যেন সত্যজিত রায়ের ছবির প্রতিটা ফ্রেমে জীবন্ত হতে দেখতে পাই। কম আয়োজনে তিনি অনেক কাহিনির তথ্য দিয়ে দিতে পারেন।

এরকমই আরেকটা উদাহরণ আমরা দেখতে পাবো তাঁর ১৯৬৯ এর ছবি 'গুপি গাইন বাঘা বাইন'এ। আজকের ২০২০ সালের টাকার হিসেবে সেই ছবি প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা বাজেটের একটি ছবি (সেসময় সাড়ে ছয় লক্ষ)। আজকের ভারতবর্ষে বাহুবলী বা ব্রহ্মাস্ত্র র মতো ফ্যান্টাসি ছবির ভিড়ে কোনো বঙ্গ ফিল্মকরিয়ে কি ভাবতে পারবেন-, অমন CGI বিহীন ভিস্যুয়াল এফেক্ট, অমন লেন্সের ব্যবহারে ভূতের নাচ কিংবা বরফির ওষুধের ধোঁয়ায় শুণ্ডির বোবা মানুষদের মুখে শব্দ ফেরার দৃশ্য। কিংবা 'অপরাজিত'তে নাগরিক জীবনের ওপর বিতশ্রদ্ধ হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে গ্রামে ফেরার সেই জাম্প কাট। এভাবেই মহানগরের লিপস্টিকের শট, জলসাঘরের লাঠি দিয়ে বকশিশ আটকানোর দৃশ্যে তিনি আমাদের নুন্যতম শটে অত্যন্ত পরিমিত প্রযুক্তির দক্ষতায় সত্যজিত রায় যা সৃষ্টি করে থাকেন।

সত্যজিৎ রায়কে আমাদের ভাল লাগে তার কারণ তাঁর ছবিতে তিনি চিৎকারের মধ্যেও গঠনকে খুঁজে পেয়েছেন। 'অভিযান'এর ড্রাইভার থেকে শুরু করে প্রতিদন্ধীর চাকরি না পাওয়া ছেলেটি দিনের শেষে মুক্ত হতে চায়, উন্নতি চায়। অপুর জীবনে পাঁচটি মৃত্যুর দাগ যতিচিহ্ন হয়না, কারণ সে তার মাকে চিঠিতে একটা পণ্যের কথা জানায়। যা তার ঘরে

আছে – বিজলিবাতি, রেললাইন কিংবা দেওয়ালের ওপর লেখা গ্রাফিতি। অল্পকথাতেই আমাদের একদম চরিত্রের অন্তর্লোকে পৌঁছে দেয়।

এখানে তাঁর আর একটি ছবি থেকে উদাহরণ দেওয়া যায়। তাঁর ১৯৭০ সালের ছবি 'অরণ্যের দিনরাত্রি'। সে ছবিতে একটি বিখ্যাত মেমোরি গেমের দৃশ্য আছে যা থেকে তাঁর ছবির নূন্যতমবাদের দর্শনটি আমরা উপলব্ধি করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ থেকে মমতাজমহল এই তেরোটি নামের মধ্যে দিয়ে আমরা এক অরণ্যের দেশে ছয়টি শহুরে নাগরিকের মানবমন উন্মুক্ত হতে দেখি। দৃশ্যটি চিত্রনাট্যের সংলাপ রচনার কোনো শিক্ষার্থীকে শেখাতে পারে কীভাবে একটি দৃশ্যে মানসিক অবস্থার ভিত্তিতে চরিত্রদের সাবটেক্সট রচনা করতে হয়। এই একটি দৃশ্যে চরিত্রদের পারস্পরিক সম্পর্ক উত্তোরিত হয় অথচ সেই অবস্থার পরিবর্তনে ডায়লগ কোনো প্রত্যক্ষ অংশ নেয় না। ছবির চার তরুণের মধ্যে নায়ক অসীম (সৌমিত্র), যে নিজের অভিষ্ট প্রেমিকার কাছে দৈব দূর্বিপাকে নানাভাবে অপদস্ত হয়েছে। যে কমেডির খোরাক হিসেবে তারা শেখরকে (রবি ঘোষ) এনেছিল, এই অরণ্যপ্রদেশ তার প্রাগৈতিহাসিক রহস্যের আঙিনায় সেই কমেডির শিকার এখন সে। এই একটি দৃশ্যে অসীমের শেষ প্রাণান্ত চেষ্টা তার তাসের ঘরের মত ভঙ্গুর আলফা নাগরিক স্মার্টনেসকে বাঁচিয়ে রাখার। তার সব বন্ধুরা যখন হেরে গেছে নয় এই স্মৃতির খেলার লড়াই থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছে, তখন অসীমের শিশুপ্রায় এই লড়াই দেখে অপর্ণা (শর্মিলা) হেসে খেলা শেষ করে। আবার এই একই দৃশ্যে নায়িকা অপর্ণার সামনে নিজের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অসীম এই লড়াই করে চলেছে ঠিক তখনি আরেকটা সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে সঞ্জয় (শুভেন্দু) এবং জয়া (কাবেরি বোস) এর মধ্যে।

পরিচালক সুজয় ঘোষ যেমন 'নায়ক' (১৯৬৬) প্রসঙ্গে একটি বক্তব্যে বলেন –

> It is a minimalistic film. Minimalism is extremely important in the art world as it makes a narrative engaging. You have to keep in mind that Ray did not have economic resources. He did not have crores of rupees like today's directors. From minimum economic resources, he created an Auteur cinema (...) I think cinema transfers pain and other experiences through time and space. Narratives, dialogues and other elements of cinema are forgotten. But what remains in our minds subconsciously is the temporality of films. It is temporality in Nayak which makes the film such a powerful narrative.

জাপানিজ পেন্টিং এ মিনিমালিজম একটি বিশেষ দিক। বেঙ্গল স্কুল অব আর্ট এ প্রাচ্যের এই আধ্যাত্মিক দর্শন অনেকখানি ছাপ ফেলেছিল। সত্যজিতের শিল্পীমানসে হয়ত শান্তিনিকেতনের কলাভবনে শিক্ষার সময় অবনঠাকুরের শৈল্পিক প্রভাব তার কাজেও পড়েছিল। রবিঠাকুরের 'জল পড়ে পাতা নড়ে'–র মত অল্পকথার ছবি তিনি সহজে ধরতে পারতেন। পরিশেষে এটাই বলার শুধুমাত্র তাঁর ইউরোপীয় পারিপাট্যে মোড়া ব্যাক্তিত্ব আর সুনিপুণ চিত্রনাট্যের প্যাঁজপয়জার না। চলচ্চিত্র শিক্ষার্থীর কাছে আসল শেখার বিষয় হওয়া উচিত তাঁর নির্মানের পেছনের দর্শনটি। যা একান্তভাবেই ভারতীয় আদর্শে দীক্ষিত।

গ্রন্থসুত্র :

বিষয় চলচ্চিত্র – সত্যজিত রায়
Our films Their films – Satyajit Ray
ইন্টারনেট : https://economictimes.indiatimes.com

অভীক মজুমদার : কলকাতার মুরলীধর কলেজে চলচ্চিত্রবিদ্যার স্টেট এডেড কলেজ টিচার।

সত্যজিৎ রায় ও প্রোফেসর শঙ্কু : এক যুগলবন্দি

প্রফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুর কল্পবিজ্ঞান নির্ভর কাহিনির ভেতরে
ভ্রমণ করলেন, সন্ধান করলেন, **সোমদত্তা ঘোষ কর।**

১৯৬১ সালের মে মাস, সত্যজিৎ রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় বন্ধ হয়ে যাওয়া তাঁর পারিবারিক পত্রিকা *সন্দেশ*কে পুনরায় নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ করলেন। *সন্দেশ*এর সম্পাদনা সূত্রে সাহিত্যসাধনাতেও নিয়োজিত হলেন তিনি। তাঁর প্রথম মৌলিক গল্প প্রকাশিত হয় ১৩৬৮তে পত্রিকার ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম সংখ্যা জুড়ে – নাম 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি', যা কালের দিক থেকে ফেলুদা কাহিনিরও আগে। সেপ্টেম্বর মাসে এই পত্রিকায় প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে বিশ্বখ্যাত বাঙালি বিজ্ঞানী প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুর। বা বলা যায় তাঁর লেখা ডায়েরির প্রথম সন্ধান মেলে। আর প্রোফেসর শঙ্কুর হাত ধরেই বাংলা কল্পবিজ্ঞান শাখায় প্রবেশ করেন সত্যজিৎ রায়। বাঙালি পাঠক পায় এক নতুন আঙ্গিকের কল্পবিজ্ঞান কাহিনি। সত্যজিৎ রায়ের শতবর্ষে শঙ্কুর প্রথম গল্প পর্যালোচনা করে দেখা যাক সত্যজিৎ রায় ও প্রোফেসর শঙ্কুর যুগলবন্দি কোনো নতুন বিজ্ঞানধর্মী কল্পকাহিনীর সন্ধান দেয়, যার মধ্যে ধরা পড়ে এক 'সিনেম্যাটিক ভিউ'।

শঙ্কুর অভিযানের প্রথম ডায়েরি হল 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি'। সেখানে উত্তমপুরুষে লেখক সত্যজিৎ রায় জানান তারক চাটুজ্যে'র মাধ্যমে শঙ্কুর ডায়েরি তাঁর কাছে আসে সম্পাদকীয় দপ্তরে। এই ডায়েরি পাওয়া গিয়েছিল সুন্দরবনের মাথারিয়া অঞ্চলে। লেখক আগে থেকে জানতেন যে তিনি বৈজ্ঞানিক। লেখক বলেন যে প্রোফেসর শঙ্কু বছর পনেরো নিরুদ্দেশ। কেউ বলেন তিনি নাকি এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে প্রাণ হারান। আবার এটাও শুনেছেন যে তিনি নাকি জীবিত। ভারতবর্ষে

কোনও অখ্যাত অঞ্চলে গা ঢাকা দিয়ে নিজের কাজ করছেন। তাঁর লেখা ডায়েরি বিস্ময়কর হয় লেখকের কাছে যখন দেখা যায় খাতার লেখার কালির রং নিজে থেকে সবুজ থেকে হচ্ছে লাল, তারপর নীল থেকে হলদে। আরো দেখেন খাতা আগুনেও পোড়ে না, খাতার কাগজ রবারের মতো। লেখকের ভাষায় "সেই দিন ই রাত্রে ঘুমটুম ভুলে গিয়ে তিনটে অবধি জেগে খাতাটা পড়া শেষ করলাম। যা পড়লাম তা তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। এ সব সত্যি কি মিথ্যে, সম্ভব কি অসম্ভব, তা তোমরা বুঝে নিও। 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি' ১৯৬১-র সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর এই তিন মাস ধরে ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল *সন্দেশ* পত্রিকায়। যদিও ডায়েরির শেষে লেখক জানিয়ে দেন শেষ পর্যন্ত ডায়েরিটা অক্ষত ছিল না। ডায়েরিটা কপি করে প্রেসে দেওয়ার পর তাক থেকে নামাতে গিয়ে দেখা যায় ডায়েরির পাতার কিছু গুঁড়ো আর লাল মলাটের কিছু অংশ তাকের উপর আছে। শ-খানেক বুভুক্ষু ডেঁয়ো পিঁপড়ে পুরো খাতাটাই খেয়ে ফেলেছে। এইভাবে পাঠকের সঙ্গে পরিচয় ঘটে প্রোফেসর শঙ্কুর। শঙ্কুর জনপ্রিয়তা ও পাঠকের চাহিদা লেখককে দিয়ে লেখায় দ্বিতীয় কাহিনি 'প্রোফেসর শঙ্কু ও হাড়'। এর ভূমিকা থেকে জানা যায় শঙ্কু সম্পর্কিত আরো নতুন তথ্য। এই গলপেই শঙ্কু সিরিজের সূত্রটাও গেঁথে দেন লেখক। শঙ্কুর বাড়ির সন্ধান ও ল্যাবরেটররির খোঁজ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় একুশখানি ডায়েরির সন্ধান। সেখানে আছে পৃথিবীর ২১টি জায়গায় অভিযানের কাহিনি। এরপরে পাওয়া যায় আরো কয়েকটি ডায়েরি। সবকটি মিলিয়ে ৩৮টি সম্পূর্ণ ডায়েরি ও ২টি অসম্পূর্ণ ডায়েরি। প্রত্যেকটা ডায়েরি শুধু কল্পবিজ্ঞান কাহিনির বর্ণনামাত্র নয়, ভ্রমণকাহিনী, ভিস্যুয়ালাইজেশন, আন্তর্জাতিক বাঙালির মানবদরদী ভূমিকা, অলঙ্করণ, চলচ্চিত্রধর্মীতার মেলবন্ধন এই শঙ্কুর অভিযানভিত্তিক ডায়েরিগুলি। আলোচ্য শঙ্কু কাহিনির প্রথম গল্প 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি' নিয়ে আলোচনা করার আগে সত্যজিৎ রায়ের ভাবনা প্রোফেসর শঙ্কু সম্পর্কে, প্রোফেসর শঙ্কুর জীবন ও চরিত্রবৈশিষ্ট্য সে বিষয়ে একটা স্বচ্ছ ধারণা পাঠকের জানা দরকার।

সত্যজিৎ রায় তাঁর প্রফেসর শঙ্কুর ডায়েরি রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন পিতা সুকুমার রায়ের লেখা 'হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি' থেকে। সুকুমার রায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন আর্থার কোনান ডয়েলের 'দ্য লস্ট ওয়ার্লড' উপন্যাস থেকে। সুকুমারের কাহিনি প্রায় পুরোটাই হাস্যময় বিজ্ঞান অভিযান।কিন্তু শঙ্কু কাহিনি'তে সিরিয়াস বিজ্ঞানমনস্কতা ও বাস্তবতার সঙ্গে যোগ আছে। 'দ্য লস্ট ওয়ার্ল্ড'এর প্রোফেসর চ্যালেঞ্জার, হেশোরাম হুঁশিয়ার ও প্রোফেসর শঙ্কু এই তিনজনেই তাঁদের অভিযানের বর্ণনা দিয়েছেন ডায়েরির আকারে। তাঁদের অভিযানে বর্ণিত হয়েছে অজানা দেশ, অজানা প্রাণী প্রভৃতির কথা। তিনটি চরিত্রই উজ্জ্বল।

সাধারণভাবে বলা যায় কল্পবিজ্ঞান হল কাল্পনিক বিজ্ঞান। এখানে কল্পনা প্রাধান্য পায় বেশি। "

> কল্পবিজ্ঞান আধুনিক কল্পসাহিত্যের একটি বিশেষ শাখা বা শ্রেণী, যাতে ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিক বা প্রযুক্তিগত আবিষ্কার ও উদ্ভাবন এবং মানব সভ্যতাকে কেন্দ্র করে পটভূমি রচনা করা হয়।.....ইংরেজিতে একে"সাইন্স ফিকশন" বলা হয়। (উইকিপিডিয়া)

কল্পবিশ্ব পত্রিকায় সত্যজিৎ রায় কল্পবিজ্ঞান বিষয়ে সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে সম্পাদক রূপে *সন্দেশ*কে feed করার জন্য তিনি ভেবেছিলেন লিখতেই হবে। প্রথম গল্পই ছিল বিজ্ঞানভিত্তিক পল্প সেটা হচ্ছে 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু'।

> তারপর আমার মনে হলো যে এই শঙ্কু ধরনের একটা চরিত্র...ডায়েরি form টার কথা মনে হলো যে এটা হতে পারে...এবং এটা বোধহয় subconsciously আমার খানিকটা কাজ করেছিল হেঁসোরাম হুঁশিয়ারের ডায়রি...আমার বাবার লেখা, সেটা আমার ভয়ানক একটি প্রিয় লেখা....সেটাতেই উনি Conan Doyle এর Lost World বা অজ্ঞাত জগতকে নিয়ে একটু ঠাট্টা করেছিলেন।.....তা আমারও প্রথম যেটা শঙ্কু, যেটা 'ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি', তার মধ্যে এই মেজাজটা বর্তমান। শঙ্কু যদিও ডায়রি লিখছে এবং আপাতদৃষ্টিতে তাকে সিরিয়াস বলে মনে হবে, কিন্তু তাঁর প্রথম যে invention, যে নস্যাস্ত্র ... snuff gun ..... নস্যির বন্দুক, সেটা মারলে মানুষকে কতবার যেন ... ছাপ্পাননবার হাঁচতে হবে ... এই ধরনের কতগুলো ব্যাপার ছিলো। তা সেইটা লেখার পরে কিনতু ক্রমে ক্রমে শঙ্কু সিরিয়াস হয়ে গেছে।কেননা ওইটা লেখার পরে আমি ভীষণভাবে বিজ্ঞানসংক্রান্ত কাগজপত্র বইপত্র পড়তে আরম্ভ করলাম ... একটা ভীষণ নেশা চাপল, Asimov বলুন, Arther Clarke বলুন, Bradbury,

তারপর Theodore Sturgeon ইত্যাদি বিদেশের যারা নামকরা লেখক তাদের লেখাও ভীষণ পড়তে আরম্ভ করলাম। এবং তারপরে কতকগুলো science fiction এর একেবারে প্রধান মূল বিষয়বস্তু বা theme কতকগুলো আছে, সেগুলো একটার পর একটা ধরে ধরে আমি শঙ্কুর মধ্যে দিয়ে সেগুলো ব্যবহার করতে লাগলাম। (সাক্ষাৎকার,১৯৮২,আকাশাবাণীর পক্ষ থেকে সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন ডঃ অমিত চক্রবর্তী ও সাহিত্যিক সঙ্কর্ষণ রায়।)

প্রোফেসর শঙ্কু র আসল নাম ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু। ডাকনাম তিলু। পিতার নাম ঈশ্বর ত্রিপুরেশ্বর শঙ্কু। পিতামহের নাম ঈশ্বর বটুকেশ্বর শঙ্কু। শঙ্কুর জন্মদিন ১৬ জুন। তাঁর উচ্চতা ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি। মাথাজোড়া টাক। গায়ের রঙ ফরসা। তাঁর বাসস্থান বিহারের গিরিডিতে, উশ্রী নদীর ধারে। গিরিডিতে থাকলে প্রতিদিন ভোরে ওঠেন, উশ্রী নদীর ধারে প্রাতঃভ্রমণ সারেন। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা ফিজিক্স, কেমিস্ট্রিতে ডবল অনার্স নিয়ে বি.এস সি পাশ। ৬৯টা ভাষা জানেন। তাঁর পরিচিতি আবিষ্কারক হিসেবে। তাঁ র উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আবিষ্কার হল মিরাকিউরল, অ্যানাইহিলিন, সমনোলিন, এয়ারকন্ডিশনিং পিল, লিঙ্গুয়াগ্রাফ ইত্যাদি। তাঁর বিজ্ঞানচর্চায় আরাধ্য হলেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। তিনি নির্লোভ, মানবতাবাদী, সৎ, আত্মভোলা, বাঙালি বৈজ্ঞানিক। পদার্থবিদ্যার সাথে প্রাণীতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, গণিত, চিকিৎসাবিদ্যা, আয়ুর্বেদশাস্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান আছে। বিশ্বসাহিত্যের ধারণা, গোয়েন্দাগিরি সম্পর্কেও সম্যক ধারণা আছে। কলকাতার সঙ্গে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জার্মানী, মিশর, সুইডেন, সমুদ্রের মধ্যে অজানা দ্বীপ ইত্যাদি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করেছেন। বাড়িতে তাঁর সঙ্গী চাকর প্রহ্লাদ এবং বেড়াল নিউটন। শঙ্কুর অবৈজ্ঞানিক সঙ্গী গিরিডির শ্রী অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এবং মাকড়দহর শ্রী নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস। এঁরা মাঝেমাঝে শঙ্কুর অভিযানের সঙ্গী হয়েছেন। ইংল্যান্ডের জেরেমি সন্ডার্স ও জার্মানির উইলহেলম ক্রোল শঙ্কুর প্রিয় বন্ধু। শঙ্কুর প্রথম ডায়রি 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি' এবং শেষ ডায়রি' ড্রেক্সেল আইল্যান্ডের ঘটনা' (অসমাপ্ত)। পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলায় ১৯৯২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। শঙ্কু কাহিনির লেখক প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু।

মহাকাশ অভিযানমূলক গল্প হল 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি'টি। প্রোফেসর শঙ্কুর অভিযানমূলক প্রথম ডায়রি 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি'। গল্পটি শুরু হয়েছে তারক চ্যাটাজ্জীর সম্পাদকীয় দপ্তরে আনা শঙ্কুর একটি ডায়রি দিয়ে। একটি উল্কার গর্তের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল নিরুদ্দিষ্ট বিজ্ঞানীর এই ডায়েরি যার কালির রং ঘন ঘন বদলায়, যার কাগজ ছেঁড়ে না, পোড়ে না। সম্পাদক ডায়েরি থেকে জানতে পারেন যেপ্রতিবেশী অবিনাশ বাবু দ্বারা বিদ্রূপ সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক শঙ্কু মঙ্গলগ্রহে অভিযান করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। অবিনাশবাবুর মূলোর ক্ষেত পরীক্ষামূলক প্রথম রকেটটি নষ্ট করলেও খুব তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় রকেট যোগে ১৩ জানুয়ারি ভোরে চাকর প্রহ্লাদ, বিড়াল নিউটনকে নিয়ে ভোর পাঁচটায় নিজের তৈরি করা রকেট 'বিধুশেখর'এ চেপে প্রোফেসর শঙ্কু মঙ্গলগ্রহে পাড়ি দেন। তাঁদের সঙ্গে ছিল দূরবিন, ক্যামেরা, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি। খাবার সামগ্রী হিসেবে ছিল শঙ্কু ও প্রহ্লাদের জন্য 'বাটিকা ইন্ডিকা', নিউটনের জন্য 'ফিশ পিল'। অভিযনের সময় প্রহ্লাদ রামায়ণ পড়ে সময় কাটায়, বিধুশেখর বাংলা শিক্ষা করে শঙ্কুর কাছে এবং একসময় সে ডি.এল.রায়ের বিখ্যাত গান 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' নিজের ভাষায় গেয়ে ওঠে 'ঘঙো ঘআংঙ কুঁক্ক ঘঙা'। ২৫ জানুয়ারি দূরবিন দিয়ে মঙ্গলগ্রহকে দেখেন বাতাবিলেবুর মতো লাগছে।

অবশেষে মঙ্গলে পৌঁছে তাঁরা অনুভব করেন সেখানকার গাছপালা,পাথর সব নরম রবারের মতো। আকাশর রঙ সবুজ,ঘাস,গাছপাতার রঙ নীল,নদীর জল লাল।আকাশ থেকে দেখতে লাল সূতোর মত লাগে।কিন্তু সেখানে নেমে তঁারা বিপদের সম্মুখীন হন।এক আশ্চর্যজনক জন্তুর দল,মঙ্গলীয় সৈন্যরা তঁাদের তাড়া করে।তাদের মুখে বিকট শব্দ 'তিন্তিড়ি! তিন্তিড়ি!'।সেখান থেকে কোনক্রমে রকেটে করে পালিয়ে তাঁরা পৌঁছে যান এক অজানা গ্রহ 'টাফা'য়। এই গ্রহর বর্ণনা- "টাফার সর্বাঙ্গে যেন অসংখ্য জোনাকি জ্বলছে আর নিবছে। সেই আলোয় আমাদের কেবিন ও আলো হয়ে গেছে।" এখানে থাকা প্রাণীদের কাছ থেকে অভ্যর্থনা পেয়েছেন। সেখানে গাছপালা নেই, ঘরবাড়ি নেই, আছে অনাবিল আনন্দ। এরা পিঁপড়ে জাতীয় অতিকায় প্রাণী। বিধুশেখরের কছ থেকে জানা যায় সৌরজগতের প্রথম সভ্য লোকেরা নাকি এখানে বাস করে। ওরা প্রত্যেকেই বৈজ্ঞানিক এবং এত বুদধিমান একত্র হওয়ায় তাদের অসুবিধা হচ্ছে, তাই অন্য গ্রহ থেকে একটি কমবুদ্ধি লোক বেছে নিয়ে টাফায় আনিয়ে বসবাস করাচ্ছে। যদিও সে কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।শঙ্কু বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনা করতে তাদের সঙ্গে নারাজ হওয়ায় রেগে গিয়ে শঙ্কু তাদের উপর নিজস্ব উদ্ভাবন নস্যাস্ত্র প্রয়োগ করেন। কিন্তু কিছু লাভ

হয় না, তারা হাঁচতেই শেখেনি। ডায়েরি এখানেই শেষ। আর গল্পের শেষে জানা যায় এই অক্ষয়, অবিনশ্বর ডায়েরিটি শ'খানেক ডেঁয়ো পিঁপড়ে খেয়ে শেষ করে ফেলেছে।

এই ডায়েরিতে শঙ্কু'র উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আবিষ্কার হল স্নাফ গান বা নস্যাস্ত্র, রোবট বিধুশেখর, বটিকা ইন্ডিকা, ফিশ পিল, মহাভারতের জৃম্ভনাস্ত্র থেকে আইডিয়া পেয়ে তৈরি বড়ি ইত্যাদি। এইচ. জি. ওয়েলস এর 'দ্য এম্পায়ার অব দ্য অ্যান্টস' গল্পের কিছুটা প্রভাব ধরা পড়ে এ গল্পে। এটা কিছুটা সায়েন্স ফ্যানটাসি। সত্যজিৎ রায় স্বয়ং শঙ্কুর গল্পকে সায়েন্স ফিকশন অভিহিত করেন নি, 'শঙ্কু কাহিনি' বা 'প্রোফেসর শঙ্কুর অ্যাডভেঞ্চার' বলে অভিহিত করেছেন। এই প্রথম অ্যাডভেঞ্চার কিছুটা science fiction এর প্যারডির আকারে রচিত হলেও বর্ণনাভঙ্গির নৈপুণ্যে, অলঙ্করণের গুণে গল্পটি পাঠকের কাছে আনে আনন্দ, অ্যাডভ্যাঞ্চার এর আস্বাদন। আর এই গল্পের আবেদনেই পরবর্তীকালে আমৃত্যু প্রোফেসর শঙ্কুর গল্প লিখে গেছেন সত্যজিৎ রায়। সম্ভবত মহাকাশে অভিযানের বর্ণনা এই গল্প ছাড়া শঙ্কুর অন্যান্য গল্পে নেই। সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সত্যজিৎ রায়ের মতো প্রোফেসর শঙ্কুও হয়েছেন অমর। উভয়ের এক অনবদ্য যুগলবনদি বিশ্বকে দিয়েছে স্রষ্টা আন্তর্জাতিক বাঙালির সন্ধান, যাঁরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে সৃজনশীলতায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার।

গ্রন্থসূত্র :

১ *ব্যোমযাত্রীর ডায়রি, সত্যজিৎ রায় শঙ্কু সমগ্র,* আনন্দ পাবলিশার্স,২০১১

২. *সত্যজিতের ভাবনায় প্রোফেসর শঙ্কু,* সুখেন বিশ্বাস, প্রতিভাস,২০১২

৩. *সুকুমার রায় স্রষ্টা ও সৃষ্টি :,* ডসোমদত্তা ঘোষ ., অক্ষর প্রকাশনী,২০১৭

ড. সোমদত্তা ঘোষ (কর) : কলকাতা র প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাবিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সহযোগী অধ্যাপক।

ব্র্যান্ড ফেলু

জনপ্রিয়তাই হল ব্র্যান্ডের মাপকাঠি। ফেলুদা কতভাবে ফিরে এসেছে বিভিন্ন পণ্যের ব্র্যান্ড হয়ে, তার একটি সন্ধানী হিসেবনিকেশ করে দেখলেন **অরিন্দম দাশগুপ্ত**।

পিছনে ফিরে যে কোনো সময়কেই দেখতে বললে ভেসে ওঠে অসংখ্য টুকরো টুকরো ঘটনার প্রতিচ্ছবি।কখনো তা বিচ্ছিন্ন আবার কখনো বা সম্মিলিত ভাবে সেগুলোই ইঙ্গিত করে একটা বৃহত্তর পটপরিবর্তনের। ১৯৬০-এর দশকও এর ব্যতিক্রম নয়। দশকের সূচনাতেই আমরা দেখি ভাঙা পড়েছে সেনেট হাউস। জাতীয় গ্রন্থাগার খুলছে ছোটদের জন্য একটি আলাদা বিভাগ। এই দশকেই আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ। ১৯৬২-র চীন-ভারত যুদ্ধের পাশাপাশি চালু হবে ওজন মাপার মেট্রিক পদ্ধতি। *সন্দেশ* পত্রিকার ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর সংখ্যায় আত্মপ্রকাশ করবে প্রদোষ চন্দ্র মিত্র বা ফেলুদা।

ফেলুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করানো হচ্ছে এই বলে,

> ওকে কেউ কেউ বলে আধপাগলা, কেউ কেউ বলে খাম খেয়ালি, আবার কেউ কেউ বলে কুঁড়ে। আমি কিন্তু জানি ওই বয়সে ফেলুদার মতো বুদ্ধি খুব কম লোকেরই হয়। আর ওর মনের মতো কাজ পেলে ওর মতো খাটতে খুব কম লোকেই পারে।

এই ফেলুরই ব্র্যান্ড ফেলুতে রূপান্তর আমাদের আলোচ্য। তার আগে একবার দেখে নেওয়া যাক পঞ্চাশের দশকে ঠাণ্ডা যুদ্ধের সূচনা যেমন বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক ভারসাম্যে নানা পরিবর্তন নিয়ে এল তেমনই মোড় বদল ঘটাল গোয়েন্দা গল্পের বিন্যাস ও চরিত্রে। ইংরেজ পাঠক ঠাণ্ডা যুদ্ধের কারণে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়া দুনিয়া সম্পর্কে ততদিনে ওয়াকিবহাল হয়ে উঠেছে। তাই তাদের মেনে নিতে কোনো সমস্যা হল না ঠাণ্ডা মাথার পেশাদার খুনে জেমস বন্ড'কে। পঞ্চাশের দশকের শেষে প্রকাশিত জেমস বন্ড তাই একজন কর্তব্যনিষ্ঠ সরকারি ব্যক্তি – যে তার নিয়োগ কর্তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো প্রশ্ন করে না। স্বনিযুক্ত স্বাধীন গোয়েন্দা তাই পাল্টে যায় রাষ্ট্রের এক ভয়ানক গোপন অস্ত্রে। তার প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রিত হয় রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ও নির্দেশে। তার কাজকর্মের সঙ্গে গোয়েন্দাগিরির কিছুটা যোগ থাকলেও অনুপস্থিত স্বাধীনতা আর নিজের বিবেক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর মোড় বদলের প্রভাব ফেলুকে কতটা প্রভাবিত করেছিল সেই আলোচনায় ঢোকার আগে আমরা বরং আরেকটু ব্যক্তি ফেলুকে জরিপ করি।

ফেলুর বাবারা তিন ভাই। বড়ো ভাই ভালো ঠুংরি গাইয়ে ছিলেন, মাত্র ২৩ বছর বয়সে সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যান। মেজভাই ফেলুর বাবা জয়কৃষ্ণ। ছোটভাই তোপসের বাবা। অল্প বয়সে বাবা-মা মারা যাওয়ায় ফেলু কাকার বাড়িতে মানুষ। এই পরিচিতিতে কোনো সমস্যা নেই বরং আর পাঁচটা মধ্যবিত্ত পরিবারের সঙ্গে মিলটা প্রকট। আসলে যা অদ্ভূত ঠেকে তা হল পারিবারিক বৃত্তের মধ্যে বসবাস করেও ফেলু বানিয়ে নেয় তার সম্পূর্ণ নিজস্ব একটা বলয় সেখানে তার ভাই বা সহযোগী তপেশ ছাড়া পরিবারের অন্য কারো অস্তিত্ব নেই। অন্তত দুটি ক্ষেত্রে সে তার কাকার সঙ্গে ভ্রমণ করলেও একবারের জন্যও দেখা যায় না সরাসরি তাঁর সঙ্গে কথা বলছে। এই বলয় বা গড়ে তোলা বৃত্তটি এমনই যেখানে ফেলু সমসাময়িক ঘটে যাওয়া নানা বিষয়ে তার প্রতিক্রিয়া জানাতে কার্পণ্য করে না, যেমন রাস্তার নাম পালটানো, শহীদ মিনারের চুড়োয় লাল রঙ করা বা নিউ মার্কেট ভেঙে ফেলে মাল্টি স্টোরি সুপার মার্কেট হওয়া। কিন্তু ফেলুর কোনো প্রতিক্রিয়া আমরা দেখি না ষাটের দশকে ছাত্র-যুব আন্দোলন সম্পর্কে যার থেকে মুক্ত ছিল না পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতা। একই ভাবে ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ আর বাংলাদেশের সৃষ্টি হওয়া নিয়েও সে নিশ্চুপ। অর্থাৎ ফেলুর চিন্তাজগতে এক ধরনের তারতম্য কাজ করে, ঠিক তেমন বিষয়েই সে তার প্রতিক্রিয়া জানায় যা তার ব্যক্তিত্বকে পূর্ণতা দেয় আর প্রমাণ করে সমসাময়িক কোন কোন ঘটনা সম্পর্কে সে পুরো ওয়াকিবহাল। ফেলুরই সমবয়স্করা যখন বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজ পাল্টাতে উত্তাল তখন ফেলুর এই নীরবতা হয় তো তার পেশার কারণেই প্রয়োজন ছিল। সমাজের যে স্তরের মানুষদের ফেলুর মক্কেল হিসেবে দেখা যায় তাদের পক্ষে ফেলুর বিশেষ কোনো মতাদর্শের প্রতি পক্ষপাত বা বিশ্বাস মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে ফেলুও পারত না কলকাতার পুলিশ মহলে তার ব্যাপক পরিচিতি গড়ে তুলতে। শুধু কলকাতা কেন কলকাতার বাইরেও কাজের সূত্রে বহু পুলিশ কর্তার সঙ্গেই ছিল তার যথেষ্ট হৃদ্যতা।

ফেলু যে শার্লক হোমসের অনুরাগী তা সে নিজেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে। তবে রহস্য সমাধানের ক্ষেত্রে সে যে হোমসের অনুসারী তেমনটা অবশ্য নয়। অন্যদিকে হোমসের কাহিনির প্রভাব থেকে ফেলু যে পুরোপুরি মুক্ত একথাও বলা যাবে না। উদাহরণ হিসেবে আমরা তুলনা করতে পারি *দ্যা সাইন অফ ফোর*এর একটি ঘটনার। মেজর শোল্টো এককালে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে ছিলেন। সেই সময় তাঁর অন্যতম সহকর্মীর নাম ক্যাপ্টেন মর্সটন। সেই মর্সটনের চাঞ্চল্যকর অন্তর্ধান দিয়েই সুচনা হয় এই কাহিনির। শোল্টোই তাঁর পুত্রদের কাছে কবুল করেন আদতে কী ঘটেছিল মর্সটনের।

ওর হার্ট চিরকালই দুর্বল – কিন্তু কেউ জানত না – কাউকে বলত না – আমাকে ছাড়া। আমিই কেবল জানতাম ওর হৃদপিণ্ড ধকল সইতে পারে না একদম। ভারতবর্ষে থাকার সময় পরপর অনেকগুলো আশ্চর্য ঘটনার ফলে বেশ কিছু ধনরত্ন হতে আসে আমাদের দু-জনের। আমি তা নিয়ে আসি ইংল্যান্ডে। মর্সটন দেশে ফিরে সেই রাতেই সোজা আমার এখানে এসে দাবি করল অর্ধেক বখরা। ..... মণিমুক্ত বখরা করা হবে কীভাবে, এই নিয়ে মতান্তর হল আমার সঙ্গে মর্সটনের। বেশ কিছু চেঁচামেচিও হয়ে গেল তাই নিয়ে ! রাগের মাথায় চেয়ার ছেড়ে ছিটকে গিয়েছিল মর্সটন। আচমকা বুকের বাঁ'দিকে খামচে ধরে টলতে লাগল মাতালের মতো ; ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে এল মুখ, তারপরেই চিৎপটাং হয়ে আছড়ে পড়ল মেঝের ওপর, দড়াম করে মাথাটা ঠুকে গেল রত্নপেটিকায়। দৌড়ে গেলাম আমি। হেঁট হয়ে সভয়ে দেখলাম মারা গিয়েছে মর্সটন।

..... দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আমার চাকর লাল চৌদার। পা টিপে টিপে ভেতরে এসে দরজায় খিল তুলে দিল সে। বললে, 'ভয় কী সাহেব? কেউ জানবে না আপনি খুন করেছেন ওঁকে ! আসুন লাশটা লুকিয়ে ফেলি।' ..... শুনেই মন ঠিক করে ফেললাম। লাল চৌদার আমার পরম বিশ্বাসী চাকর- সে যদি আমাকে নিরপরাধ মনে না-করে, আদালতের জুরিরাই-বা করতে যাবে কেন ?

এবার পাশাপাশি পড়া যাক ফেলু কাহিনি *ছিন্নমস্তার অভিশাপ*।

..... তুমি কি ভেবেছ আমি জানি না? দীনদয়ালের কী হয়েছিল আমি জানি না ? তোমার চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সব দেখেছি আমি পর্দার ফাঁক দিয়ে। পঁয়ত্রিশ বছর আমি মুখ বন্ধ করে রেখেছি। তুমি দীনদয়ালের মাথায় বাড়ি মেরেছিলে পিতলের বুদ্ধমূর্তি দিয়ে। দীনদয়াল মরে যায়। তারপর নূর মহম্মদ তার ড্রাইভারকে দিয়ে গাড়িতে করে তার লাশ –

আবার ফিরে যাওয়া যাক আমাদের আগের আলোচনায়। ফেলু শার্লক হোমসকে গুরু মানলেও কেন উঠে আসে জেমস বন্ডের কথা সেটাও মনে হয় খোলসা করা দরকার।

পঞ্চাশের দশক থেকেই ভোগ্যপণ্যের প্রতি আগ্রহ বাড়ছিল মানুষের, সেইসঙ্গে বিশেষ বিশেষ ব্র্যান্ডের প্রতি তৈরি হচ্ছিল এক ধরনের আনুগত্য। মানুষটি মধ্যবিত্ত নাকি বিত্তবান ! বিত্তবান হলে তার রুচি কেমন, সে কোন ব্র্যান্ডের গাড়ি চড়ে, পোশাক পরে বা কী ধরনের খাবার পছন্দ করে – এ সবই একাধারে হয়ে উঠছিল গুরুত্বপূর্ণ তার ব্যক্তি পরিচিতির ধারক। স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপনের পরিচয় ক্রমশ হয়ে উঠছিল সঠিক ব্র্যান্ডের পণ্য ব্যবহার।

ইয়াং ফ্লেমিং তাঁর *ডক্টর নো* উপন্যাসে এমন এক বাথরুমের বর্ণনা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পেশ করেছেন যাকে এক কথায় বলা চলে আরাম আয়েশের চরম। আর যে ব্যক্তি এই বাথরুমের মালিক তার রুচি আর বিত্ত যে প্রশ্নাতীত তা বলাই বাহুল্য।

There was everything in the bathroom – Floris Lime Bath essence for men and Guerlain bath cubes for women. He (এখানে জেমস বন্ড) crushed a cube into the water and at once the room smelled like an orchid house. The soap was *Guerlain Copacetic* Fleurs des Alpes. In a medicine cupboard behind the mirror over the wash basin were toothbrushes and toothpaste, Steradest toothpick, Rose mouth wash, dental floss, Aspirin and Milk of Magnesia. There was also an electric razor, Lentheric after shave lotion, and has nylon hair brushes and combs. Everything was brand new and untouched.

জেমস বন্ডের কাহিনিতে উল্লিখিত সুগন্ধি-প্রসঙ্গ

চারজন বিত্তবান মানুষ কালকা মেলে ভ্রমণ করছেন প্রথম শ্রেণিতে। এঁদের মধ্যে অদল-বদল হচ্ছে দু'জনের বাক্স। এই বদল ঘিরেই বাক্স রহস্য। ফেলু যখন সেই বদল হয়ে যাওয়া একটি বাক্সের ভিতরকার মালের ফর্দ বানাচ্ছে তখন তার মধ্যে যে শুধু আমরা নানা ব্র্যান্ডের ব্যবহার্য পণ্য দেখতে পাচ্ছি তাই নয়, সেইসঙ্গে যে মানুষটি সেগুলি ব্যবহার করে তার সম্পর্কে একটা ধারণা আর পাঠকের সঙ্গে এক ধরনের মানসিক যোগ তৈরি হচ্ছে। দেখা যাবে গল্পের পাঠকও হয়তো ব্যক্তি জীবনে ওই সব ব্র্যান্ডের অনেক পণ্যই ব্যবহার করে থাকে। তাই একটি চরিত্রকে বাস্তবের রূপ দিতে তার দৈনন্দিন ব্যবহার্য টুকিটাকি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

> আমি একটা একটা করে জিনিস টেবিলের উপর থেকে তুলে তার নাম বলে আবার বাক্সে রেখে দিতে লাগলাম আর ফেলুদা লিখে যেতে লাগল। সব শেষে লিস্টটা দাঁড়াল এইরকম :-
>
> ১। দু ভাঁজ করা দুটো দিল্লির ইংরিজি খবরের কাগজ – একটা Sunday Statesman আর একটা Sunday Hindusthan Times
>
> ২। একটা প্রায় অর্ধেক খরচ হওয়া বিনাকা টুথপেস্ট। টিউবের তলার খালি অংশটা পেঁচিয়ে উপর দিকে তুলে দেওয়া হয়েছে
>
> ৩। একটা সবুজ রঙের বিনাকা টুথব্রাশ
>
> ৪। একটা গিলেট সেফটি রেজার
>
> ৫। একটা প্যাকেটে তিনটে থিন গিলেট ব্লেড
>
> ৬। একটা প্রায় শেষ হয়ে যাওয়া ওল্ড স্পাইস শেভিং ক্রিম
>
> ৭। একটা শেভিং ব্রাশ
>
> ৮। একটা নেলক্লিপ – বেশ পুরনো
>
> ৯। একটা সেলোফেনের পাতের মধ্যে তিনটে অ্যাসপ্রোর বড়ি
>
> ১০। একটা ভাঁজ করা কলকাতা শহরের ম্যাপ – খুললে প্রায় চার ফুট বাই পাঁচ ফুট
>
> ১১। একটা কোডাক ফিল্মের কৌটোর মধ্যে সুপুরি
>
> ১২। একটা টেক্কা মার্কা দেশলাই – আনকোরা নতুন
>
> ১৩। একটা ভেনাস মার্কা লাল-নীল পেন্সিল
>
> ১৪। একটা ভাঁজ করা রুমাল, তার এক কোণে সেলাই করা নকশায় লেখা G

১৫। একটা মোরাদাবাদি ছুরি বা পেন নাইফ
১৬। একটা মুখ-মোছা ছোট তোয়ালে
১৭। একটা সেফটি পিন, মর্চে ধরা
১৮। তিনটে জেম ক্লিপ, মর্চে ধরা
১৯। একটা শার্টের বোতাম
২০। একটা ডিটেকটিভ উপন্যাস – এলেরি কুইনের দ্য ডোর বিটউইন

দুটি কাহিনিতেই আমরা পাই অসংখ্য ব্র্যান্ডের পরিচয়, তবে সেটাই শেষ নয়। ফ্লেমিং পাতার পর পাতা লিখে চলেন প্রকৃতি-পরিবেশ আর এমন সব জিনিসপত্র সম্পর্কে যার সঙ্গে প্রথমে মনে হয় মূল ঘটনার আপাত কোনো যোগ নেই তারপর আচমকাই দেখা যায় সেগুলো কোনো না কোনো ঘটনার সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে। একই ভাবে ফেলুর তৈরি করা ফর্দও উপন্যাসের শেষে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে বেরিয়ে আসে রহস্য সমাধানের অন্যতম প্রধান ক্লু।

বন্ড আর ফেলুর কাহিনিতে এমন কোনো পণ্য বা ব্র্যান্ডের উল্লেখ থাকে না যা পাঠক কখনো চোখে দেখেনি বা দেখার কোনো সুযোগ নেই। পাঠকের কাছেও একটা বিকল্প থাকে সেই পণ্যটি তার নিজের জীবনে পরখ করে দেখে নেওয়ার। গোয়েন্দা সাহিত্যে আরাধ্য নায়কের কাছাকাছি পৌঁছানোর এতো এক নতুন কৌশল। পণ্য নির্মাতারা এই কৌশল অবশ্য অনেক আগে থেকেই ইস্তেমাল করে চলেছে। যেমন ধরা যাক প্রসাধনী দ্রব্য। চলচ্চিত্রের নায়ক-নায়িকার জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করে তৈরি হয় হরেক রকমের বিজ্ঞাপন।

বন্ড কাহিনি নিয়ে এল আরো এক নতুন আঙ্গিক। পাঠককে দুনিয়ার প্রায় সমস্ত দর্শনীয় স্থান ঘুরে দেখার সুযোগ করে দেওয়া। কথা হচ্ছে এর আগে কি তাহলে গোয়েন্দা কাহিনিতে ভ্রমণ অনুষঙ্গ পুরোপুরি গরহাজির? আগাথা ক্রিস্টির লেখার উল্লেখ করলে সে-কথা বলা যাবে না। গোয়েন্দা গল্পের সাম্রাজ্ঞী ব্যক্তিজীবনে ছিলেন ভ্রমণ-বিলাসী। পুরাতাত্ত্বিক স্বামী এবং নিজের আয়েই তাঁর এই শখ তিনি বজায় রাখতে পেরেছিলেন। তাঁর সেই ভ্রমণ অভিজ্ঞতাকে তিনি পাঠকদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছিলেন গোয়েন্দা এরক্যুল পোয়ারোর মাধ্যমে। পোয়ারো পেয়েছিল ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে চড়ার,প্রমোদতরিতে নাইল ভ্রমণ করার অথবা তদন্তের স্বার্থে উড়োজাহাজ চেপে এধার-ওধার যাওয়ার সুযোগ। আগাথা ক্রিস্টি যে সময়ে তাঁর কাহিনিগুলি লিখছেন তখন পাঠকের পক্ষে এই ধরনের ভ্রমণ অভিজ্ঞতার শরিক হওয়া ছিল সুদূর কল্পনা। বাকি গোয়েন্দা-কাহিনির লেখকরা বেশিরভাগই ভ্রমণের রোমাঞ্চকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন স্থানীয় বা আঞ্চলিকতার গণ্ডিতে। কাহিনি সৃষ্টিতে লেখকরা যতই মুনশিয়ানা দেখান না কেন পট পরিবর্তনের অভাবে তা ক্রমশই এক শ্রেণির পাঠকের কাছে একঘেয়ে ঠেকতে লাগল।পশ্চিম ইয়োরোপের অর্থনীতিতেও ধীরে-ধীরে আসছিল বদল।আন্তর্জাতিক ভ্রমণ যা এতদিন ছিল কেবল বিত্তবান আর উচ্চ মধ্যবিত্তদের করায়ত্ত,পালটে-যাওয়া আর্থিক পরিস্থিতিতে সেটাই ছড়িয়ে পড়ল মধ্য আয়ের মানুষের মধ্যে। এখন দূর দেশের দ্রষ্টব্য স্থান তারা কেবল আর কল্পনা করে না,চাইলে তারা সশরীরে সেই জায়গাগুলিতে হাজির হতে পারে।নতুন এই উপভোক্তাদের চাহিদা মেটাতে কাহিনিতে তাই দরকার হল নতুন মোড়ক আর নতুন চমকের। মাস ট্যুরিজমের শৈশবেই ফ্লেমিং তাঁর নায়ককে ঘোরাতে লাগলেন পৃথিবীর এ মাথা থেকে ও মাথা। বাদ রইল না আকর্ষণীয় কোনো ট্যুরিস্ট স্পট। রঙচঙে বর্ণনার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল গতি আর পরতে পরতে রহস্য উন্মোচনের উন্মাদনা।

নতুন প্রজন্মের লক্ষ লক্ষ পাঠককে আকৃষ্ট করল এই বন্ড কাহিনি। এতদিন তো প্রকাশকেরা এমন কিছুর জন্যই অপেক্ষা করে ছিলেন। অপরাধ সাহিত্যে বদল আর সেই বদল ঘটিয়ে প্রকাশনায় লক্ষ্মীলাভ সবই সম্ভব হল এই নতুন পলিটিক্যাল থ্রিলারের মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রেও পাঠক ইচ্ছে করলে সেইসব জায়গায় ঘুরতে যেতে পারেন, যদি পকেটে রেস্ত থাকে। ফারাকটা ঘটে যাবে দেখায় – এবার তাদের ঘোরা-বেড়ানোর সঙ্গে যোগ হবে একজন স্পাইয়ের অভিজ্ঞতা।

বাঙালি গোয়েন্দা ফেলুর পূর্বসুরি ব্যোমকেশের বিচরণক্ষেত্র মূলত কলকাতা শহর। এছাড়া কখনো সখনো সাঁওতাল পরগণা, খুব দুরে হলে বড়জোর পুনা। ফেলু কিন্তু এ ক্ষেত্রেও অনেকটাই বন্ড অনুসারী। কলকাতার বাসিন্দা ফেলুকে তদন্তের কারণে যেতে হয় ভারতের নানা জায়গায়। রহস্য উন্মোচনের পাশাপাশি ফেলু কাহিনির বাড়তি পাওনা ভ্রমণের মৌতাত। ফেলু কেবল ভারত ভ্রমণ করেই ক্ষান্ত হয় নি। তদন্তের প্রয়োজনে তাকে পাড়ি দিতে হয়েছে বিলেত আর হংকঙে। ফেলু কাহিনির একটা বড়ো অংশই প্রকাশিত হত পুজোর সংখ্যায়। ভ্রমণ বিলাসী আর এল. টি. সি. পাওয়া বাঙালিকে পুজোয় বেড়ানোর হদিশ জোগাতেও সেগুলির জুড়ি ছিল না। ফেলু সেই অর্থে বাঙালি ট্যুরিজমের আইকনও বটে। ফেলু কাহিনির প্রভাব যে কত সুদূর প্রসারী হতে পারে তারই একটা ছোট নমুনা আমরা পেশ করতে পারি সাগ্নিক চট্টোপাধ্যায়ের *জয়সলমির জমজমাট* লেখাটির থেকে। লেখক শুটিং-এর কাজে গিয়েছিলেন জয়সলমির, সেখানে মুকুল স্টোন শপ বা অটো রিক্সার গায়ে লেখা মুকুল ট্যাক্সি দেখে তিনি তো বেবাক। শেষ পর্যন্ত স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথপোকথনে বের হয়ে আসে মর্মকথাটি।

> মাণিকদার মতো কেউ ভাবতে পারেনি। কেউ গল্পও লেখেনি আর। মাণিকদার তৈরি গুডউইলের ওপর ভর করে আজও জয়সলমিরের মানুষজনের পেটের ভাত জোগাড় হচ্ছে।

গল্পের গোয়েন্দারা যে নানা নেশায় আসক্ত তা জোরালো ভাবে হাজির করেন স্যার কোনান ডয়েল। শার্লক হোমসের নেশা কেবল পাইপ খাওয়ার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। দরকারে আরো কড়া নেশাতেও তিনি বুঁদ হয়ে থাকতেন। গোয়েন্দা কাহিনি মাত্রই কম বেশি মেলে চা-সিগারেটের উল্লেখ। মনে রাখতে হবে এগুলি বিপণনের গোড়ার যুগে বিশ্বজোড়া ভোগ্যপণ্যের ফর্দে একেবারে উপরের সারিতে বিরাজ করত চা এবং সিগারেট। হাজার হাজার টাকার বিজ্ঞাপন দিয়ে যে পণ্যগুলিকে বাজারজাত করার চেষ্টা চলছিল নিঃশব্দে সেই কাজটাই সম্পন্ন করল গোয়েন্দা সাহিত্য। শহুরে জীবন যাপন আর একটি বিশেষ শ্রেণির পরিচিতি হয়ে উঠল এই পণ্য। বাঙালি গোয়েন্দা ব্যোমকেশের ছিল সিগারেটের নেশা। বৈঠকি আড্ডায় গড়গড়ার নল হাতেও দেখা গিয়েছে তাকে। ব্যোমকেশ বা অজিত গল্পে সিগারেটের পর সিগারেট খেলেও অজানা থেকে যায় তাদের পছন্দের ব্র্যান্ড। ফ্লেমিং *ক্যাসিনো রয়েল* কাহিনিতে পাঠকের কাছে কবুল করলেন যে জেমস বন্ডের সিগারেট হল –

> A Balkan and Turkish mixture made for him by Morland's of Grosvenor Street.

ফেলুর প্রথম গল্প *ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি*-তে সিগারেট খাওয়ার উল্লেখ থাকলেও উহ্য থেকে যায় ব্র্যান্ড। ক্রমে ক্রমে জানা যায় তার পছন্দের ব্র্যান্ড 'চারমিনার'। ১৯৮১ সালের *নেপোলিয়ানের চিঠি*, গল্পের গোড়াতেই বলা হচ্ছে,

> এই সে দিনই একটা বাংলা কাগজে ফেলুদার একটা সাক্ষাৎকার বেরিয়েছে, তার সঙ্গে হাতে চারমিনার নিয়ে একটা ছবি।

১৯৬৫-তে যার গোয়েন্দা হিসাবে আত্মপ্রকাশ ১৯৮১-তে সে কেবল বিখ্যাতই নয়, কাগজে তার ছবি ছাপা হয় পছন্দের ব্র্যান্ডের সিগারেট হাতে। কেন এই বিশেষ ব্র্যান্ডের প্রতি ফেলুর আসক্তি ? চারমিনারের বিজ্ঞাপন অনুসারে 'সর্বাধিক বিক্রি' শুধু এর কারণ হতে পারে না। আসলে চারমিনারের উৎপাদকরা খুব কৌশলে যে তকমাটি এর সঙ্গে জুড়ে দিতে পেরেছিল তা হল বুদ্ধিজীবীদের পছন্দ। চারমিনার মানেই শক্ত-পোক্ত-চিন্তাশীল মানুষের ব্র্যান্ড এমন একটা ধারণা চারিয়ে গিয়েছিল। এই ধারণার সঙ্গে খাপ খায় বলেই মনে হয় ফেলুর হাতে উঠে আসে ব্র্যান্ডটি।

জেমস বন্ড ও ফেলুদা কাহিনিতে উল্লিখিত সুগন্ধি ও সিগারেটের ব্র্যান্ড

কেবল সিগারেট নয় দেশলাইয়েরও একটা বিশেষ ভূমিকা দেখা যায় ফেলুর কাহিনিতে। এর আগে আমরা ব্যোমকেশের *অগ্নিবাণ* উপন্যাসে দেখেছি দেশলাই বাক্সের এক নির্ণায়ক ভূমিকা যার উপর দাঁড়িয়েছিল তদন্তের সাফল্য – ঘোড়া মার্কার বদলে সত্যাগ্রহী মার্কা দেশলাই দেখে সন্দেহ জাগে ব্যোমকেশের, বুঝতে পারে এবার খোদ সে অপরাধীর টার্গেট।

সোনার কেল্লা উপন্যাসের শেষে ফেলু জানায়,

> ভবানন্দকে সন্দেহ করেছিলাম বললে ভুল হবে। করেছিলাম ডক্টর হাজরাকে। যোধপুর নয়, বিকানিরে। দেবীকুণ্ডে গিয়ে দেখি ভদ্রলোক হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছেন। তার ঠিক আগেই দেশলাই কুড়িয়ে পাই – টেক্কা মার্কা। এটা রাজস্থানে বিক্রি হয় না।

অগ্নিবাণ লেখা হয়েছিল ১৯৩৫ সালে, সেই সময় সত্যাগ্রহী মার্কা কোনো দেশলাইয়ের ব্র্যান্ড ছিল কিনা আমাদের অজানা। কিন্তু ১৯৭১ সালে লেখা *সোনার কেল্লা*-র সময়ে যে টেক্কা মার্কা দেশলাইয়ের প্রচলন ছিল তা নিয়ে কোনো সংশয় নেই। টেক্কা মার্কা দেশলাই এর পরেও অনেক বছর বাজারে সুলভ ছিল। এই বিশেষ ব্র্যান্ডটি যে রাজস্থানে বিক্রি হয় না সেটাই হয়ে দাঁড়াল গোয়েন্দার কাছে রহস্য সমাধানের অন্যতম একটি সূত্র।

বন্ড হোক বা ফেলু – এরা কেবল সূক্ষ্ম রুচিরই মানুষ নয়, এদের নানা ছোট-খাটো আচরণ দেখিয়া দেয় যে এরা আর পাঁচজনের থেকে আলাদা। রুচি বা পছন্দের কথা কোথাও ফলাও করে বলা হয় না। ছোট ছোট কিছু ইঙ্গিতেই তা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। বন্ডের পছন্দের পানীয়, ভোদকা-মার্টিনি। তবে তা পরিবেশন করতে হয় মিশ্রণটি নাড়িয়ে – ঝাঁকিয়ে নয়। ফেলুও আম বাঙালির মতো চা'য়ে আসক্ত –

> ..... বিকেল চারটে নাগাদ তুলসীবাবুর বাড়িতে পৌঁছে হাত মুখ ধুয়ে প্রথমেই চায়ের প্রয়োজন হল। ফেলুদা সঙ্গে ভালো চা এনেছিল, কারণ ওই একটা ব্যাপারে ও সত্যিই খুঁতখুঁতে।

ভালো চা এখানে একমাত্র বিবেচ্য নয়। পাঠক জানেন যে ফেলুর পছন্দের চা'য়ের ব্র্যান্ড হচ্ছে কার্সিয়াঙের মকাইবাড়ি টি-এস্টেটের চা। আবারও বলতে হয় ব্র্যান্ড এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একাধারে তা সূক্ষ্ম রুচি আর উপভোক্তা কেমন দৃষ্টি আকর্ষণকারী পণ্যের প্রতি আসক্ত তার মাপকাঠি হিসাবে কাজ করে।

দীর্ঘদিনের প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের পর মানুষ যে দক্ষতা অর্জন করে বন্ড বা ফেলুকে সেই কাজই করতে দেখা যায় অনায়াসে। বন্ড চাইলেই যে কোনো গাড়ির দখল নিয়ে নেয়, দরকার হলে সেই গাড়ি পালটে যায় হেলিকপ্টার বা স্পিডবোটে। সেই যন্ত্রগুলি চালানোতেও সে সমান দক্ষ। পরোয়া করে না যদি তাকে বলা হয় রুশ ট্যাঙ্ক বা স্পেস রকেটের

দখল নিতে। একজন দক্ষ শিকারী সারা জীবন ধরে অনুশীলন করে যান বাঘ শিকার করবেন বলে। অথচ ফেলুকে দেখা যায় অনায়াসেই এতটুকু বিচলিত না হয়ে কাজটা সম্পন্ন করতে।

ফ্লেমিং, জেমস বন্ড সম্পর্কে জানান,

> The game he plays in the elegant casino is not canasta but baccarat.

ঠিক তেমনই কাঠমাণ্ডুতে আমরা দেখতে পাই,

> একটা বড়ো হলঘর আর তার ডান দিকে একটা মাঝারি ঘর মিলিয়ে ক্যাসিনো। বড়োটায় পনটুন, ব্ল্যাক জ্যাক, ফ্লাশ আর আসল খেলা রুলেট ছাড়াও কিছু জ্যাকপটের মেশিন রয়েছে, আর ছোটোটায় রয়েছে কিনো আর জ্যাকপট। ফেলুদা দেখলাম রুলেটের দিকে এগিয়ে গেল। আমরা গিয়ে ঢুকলাম ডাইনের ঘরে।

ফেলুর গোড়ায় পারিশ্রমিক ছিল আগাম ৫০০ টাকা, পরে আরো ৫০০। তারপর অ্যাডভান্স একহাজার, সফল হলে আরো এক। শেষদিকে থোক্ পাঁচ হাজার। এ হেন ফেলুর ক্যাসিনোর দক্ষতা দেখে সত্যিই তাজ্জব হতে হয় !

জনপ্রিয়তাই হল ব্র্যান্ডের মাপকাঠি। মানুষ কোন ব্র্যান্ড বেশি ব্যবহার করে সেই দিয়ে বিচার হয় তার সাফল্য। ফলে বন্ডই হোক কিংবা ফেলু, যখন শ'য়ে শ'য়ে পাঠকের হৃদয়ে তারা স্থান করে নেয় তখন তারাও তো এক একটা ব্র্যান্ড। পণ্য নির্মাতারা কী করে উপেক্ষা করবে তাদের এই ব্র্যান্ড ভ্যালুকে। তাই নিয়ে এসো আর জুড়ে দাও তাদের নিজের নিজের পণ্যের সঙ্গে, তা হলেই চরিত্রের জনপ্রিয়তা আর পণ্যের চাহিদা দুই মিলে মিশে পৌঁছে যাবে সাফল্যের সর্বোচ্চ চূড়োয়।

ফেলু সম্পর্কে বলা হয় সে হল কিশোর পাঠ্য গোয়েন্দা। বছর বছর তাকে কিন্তু দেখা যেত বয়স্ক পাঠ্য পত্রিকায় নতুন নতুন রহস্য নিয়ে হাজির হতে। এই বিচারে ফেলু বয়স্ক পাঠ্য নাকি কিশোর এই দোলাচল যতই থাক আখেরে কিন্তু ফেলু এর জন্য ডিভিডেন্ড কিছু কম পায়নি। বয়স্কপাঠ্য পত্রিকা গোষ্ঠীই নিজের প্রচার ও প্রসারের স্বার্থে ফেলুকে বানিয়ে তুলেছে বাঙালির আইকন। কিশোর পাঠ্য পত্রিকার পাতায় আটকে থাকলে তা কখনোই সম্ভব ছিল না। এর উল্টো উদাহরণও আবার হাজির করা যায়। এখনো মনে হয় না কেউ দাবি করতে পারেন যে জেমস বন্ডের কাহিনি ছোটদের উপযোগী। কিন্তু সেই বন্ডই যখন ব্র্যান্ড আইডেনটিটি তখন তাকে ইস্তেমাল করতে পিছপা হন না পণ্য প্রচারকেরা। তারা ধরে নেয় এই উপমহাদেশের ছোটরা বন্ডের কাহিনি না পড়লে বা ছবি না দেখলেও তার অ্যাপিল সম্পর্কে পুরোমাত্রায় ওয়াকিবহাল। তাই মূলত ছোটদের পণ্য ক্যাডবেরি জেমসের বিজ্ঞাপনে অনায়াশে ঠাঁই হয় জেমস বন্ডের।

জেমস বন্ড যখন ব্র্যান্ড হিসেবে ব্যবহৃত বিজ্ঞাপনচিত্রে

ব্র্যান্ড প্রথম পর্বে ছিল চরিত্র গঠনের সহায়ক কিংবা রহস্য সমাধানের ক্লু। এবার ব্র্যান্ড পরিচিতির গণ্ডি অতিক্রম করে গল্পের নায়করা নিজেরাই হয়ে দাঁড়াল এক একটি ব্র্যান্ড। জেমস বন্ডের আবেদন যেহেতু দুনিয়া জুড়ে তাই তার ব্র্যান্ড

আইডেন্টিটিও গাড়ি-জামা-জুতো-ঘড়ি মায় পিস্তলের সঙ্গে যুক্ত। বহুজাতিক এই সব পণ্য নির্মাতারা বন্ডকে ব্যবহার করে তাদের আইকন হিসেবে।

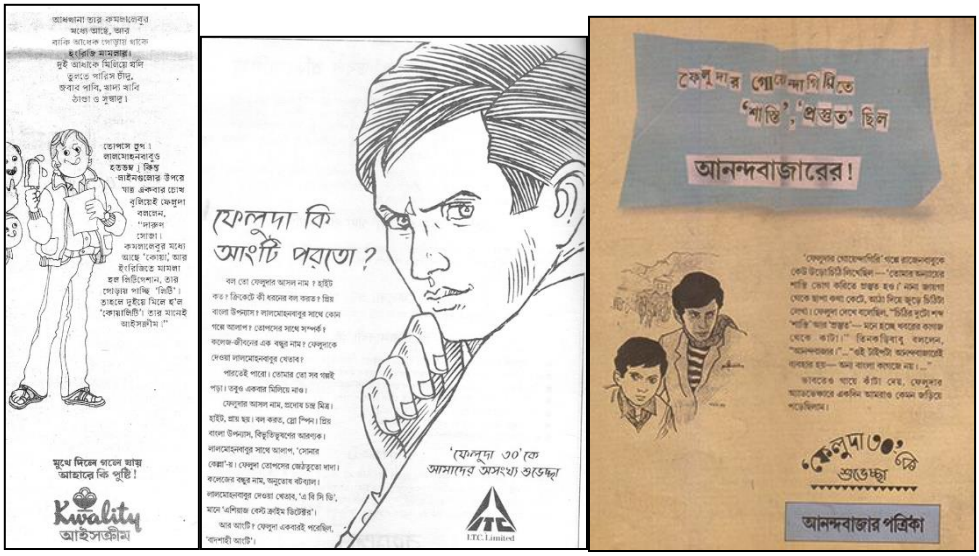

ফেলুদা যখন ব্র্যান্ড হিসেবে ব্যবহৃত বিজ্ঞাপনচিত্রে

ফেলু এখনও বিশ্বজনীন না হলেও তার আবেদন ফেলনা বলা যাবে না। তাকে ঘিরেও বিজ্ঞাপনী প্রচার পিছিয়ে নেই। টুপি-গেঞ্জিতে তো ফেলু আছেই, সেই সঙ্গে আছে আইসক্রিমেও। বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র অথবা পণ্য নির্মাতারা ফেলুকে ব্যবহার করে তাদের বিজ্ঞাপনে। বর্তমান ভয়াবহ অতিমারিতেও ফেলু কিন্তু বিস্মৃত নয়। তারই নামে নামাঙ্কিত Feluda Paper Strip Test for COVID-19 যা এখনো পরীক্ষাগারের নিয়ন্ত্রণে।

** লেখাটির একটি সংক্ষিপ্ত রূপ ২২.১২.২০১৩-তে প্রকাশিত হয় *এই সময়* সংবাদপত্রে। ধন্যবাদ জাগরী বন্দ্যোপাধ্যায়কে। লেখাটির প্রথমিক খসড়া পড়ে কতগুলি সুচিন্তিত মতামত দেওয়ার জন্য।

অরিন্দম দাশগুপ্ত : সুদীর্ঘকাল বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ইতিহাস অনুসন্ধানে উৎসাহী এবং একনিষ্ঠ গবেষক। এই বিষয়ে তাঁর মৌলিক লেখা-পত্র ইতিপূর্বে প্রকাশিত এবং তাঁর সম্পাদনা ও অনুবাদ বহুল পরিচিত।

ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি সাহিত্যে ও চিত্রকাহিনিতে : একটি তুলনামূলক প্রতিবেদন

কমিকস বা চিত্রকাহিনিতে ফেলুদার পুনঃসৃজন। কীভাবে এক নতুন মাধ্যমে উন্মোচিত হল এক নতুন ফেলুদা। তার পুনর্বিচার করলেন **পিনাকী মাইতি**।

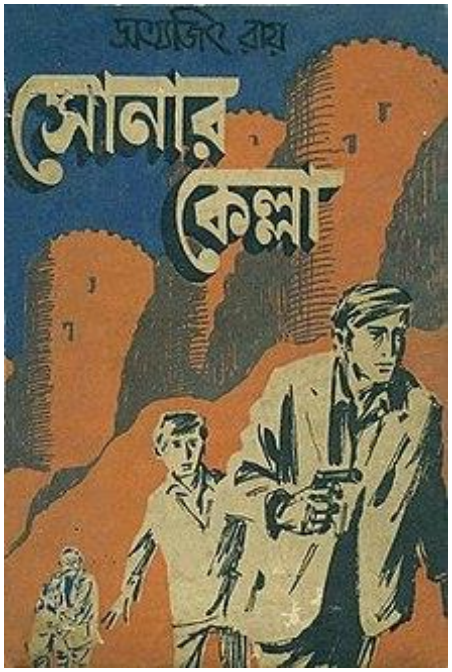

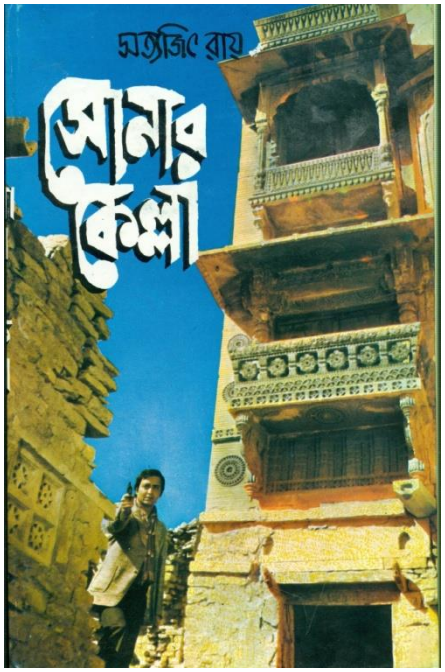

২০০৫এর অক্টোবর মাসে উমবের্তো একো দিল্লির আলিয়াঁস ফ্রাঁসেতে একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন-, অনুবাদ কখনোই মূল টেক্সটের সঙ্গে সমাপাতিত হতে পারে না। অনুবাদ হল একটা সেতুর মতো যার একদিকে অবস্থান করে মূল টেক্সট আর অপর প্রান্তে থাকে অনুবাদের মাধ্যমে রূপান্তরিত টেক্সটটি। অনুবাদের চিরন্তন যাত্রা মূলের দিকে। হয়তো কোনদিনই মূলে ফেরা হবে না, তবে চেষ্টা করলে কাছাকাছি পৌঁছানো সম্ভব। কিন্তু মাধ্যম যদি পরিবর্তিত হয় তাহলে রূপান্তরিত মাধ্যমে জঁর (genre) দুটির মধ্যে পার্থক্য ঘটে দুস্তর। উদাহরণ স্বরূপ একো বেছে নিয়েছিলেন উপন্যাস আর চলচ্চিত্রকে। অনুবাদের মাধ্যমে মূলে ফেরার ক্ষীণ চেষ্টা হলেও হতে পারে, কিন্তু চলচ্চিত্র আলাদা মাধ্যম হবার জন্যই সিনেমার পক্ষে কখনোই আর মূল আখ্যানের কাছে ফেরা সম্ভব নয়। বরং নতুন জঁরের সঙ্গে 'ট্রান্সক্রিয়েশনে' তা হয়ে ওঠে এক নতুন সৃষ্টি। চলচ্চিত্রের খুব ঘনিষ্ঠ জঁর চিত্রকাহিনি বা কমিকস্। দুটোতেই চিত্রনাট্য করতে হয়, করতে হয় শট ডিভিশনও। তফাৎ হল সিনেমা সচল আর চিত্রকাহিনি নিশ্চল। সাদৃশ্য থাকলেও যেহেতু দুটি আলাদা মাধ্যম তাই স্বাভাবিকভাবেই দুটো জঁরের তুলনামূলক আলোচনা এসেই যায়। বাংলায় এই দুই জঁরের তুলনামূলক আলোচনা সেভাবে না হলেও সহৃদয় পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণের যথেষ্ট মশলা কিন্তু এই জঁরের মধ্যে মজুত আছে।

ফেলুদার সবকটি চিত্রকাহিনিই প্রকাশিত হয়েছে পাক্ষিক অথবা শারদীয় *আনন্দমেলা*য়। প্রতিটি চিত্রকাহিনির সংলাপ ও ছবি করেছেন অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়। বাংলা চিত্রকাহিনির জগতে অভিজিৎ একজন ব্যতিক্রমী শিল্পী। তিনিই একমাত্র শিল্পী যিনি কম্পিউটারের সাহায্য ছাড়াই জলরঙে তাঁর প্যানেলগুলি[১] আঁকেন। অন্য শিল্পীরা যখন Ligne clair বা ক্লিয়ার লাইন ড্রয়িং করছেন অথবা আধুনিক চিত্রকাহিনিতে জাপানি মাঙ্গার দিকে সরে যাওয়ার প্রবণতা দেখাচ্ছেন তখন প্রথম থেকে অভিজিৎ আজ পর্যন্ত জলরঙেই স্থির আছেন। সাধারণভাবে আউটলাইনের ব্যবহারই একটি চিত্রকাহিনিকে 'ক্লিয়ার লাইন' গোষ্ঠীতে উন্নীত করে। অভিজিৎ মূলত ট্র্যাডিশনাল ওয়াটার কালার আর্টিস্ট। পেন্সিলের শেড দিয়ে শেপ ঠিক করে তার উপর জলরং করেন। আউটলাইনের ব্যবহার নেই বললেই চলে। আউটলাইনের ব্যবহার নেই বলেই তাঁর চিত্রকাহিনিকে ক্লিয়ার লাইন ড্রইংয়ের গোত্রভুক্ত করা যায় না। ক্লিয়ার লাইন ছাড়াও শ্রী চট্টোপাধ্যায় সফলভাবেই ফেলুদার চিত্রকাহিনি নির্মাণ করে চলেছেন।

অভিজিতের নির্মিত ফেলুদার চিত্রকাহিনিতে সাধারণত স্প্ল্যাশের[২] ব্যবহার নেই। সেদিক থেকে দেখতে গেলে *নেপোলিয়নের চিঠি* বেশ ব্যতিক্রমী। এই চিত্রকাহিনি শুরুই হয়েছে পাতাজোড়া স্প্ল্যাশ দিয়ে, সঙ্গে অবশ্য দুটি ছোট ছোট প্যানেলও আছে। সেই স্প্ল্যাশে পাঠকরা দেখতে পায় সেন্ট পল ক্যাথিড্রালের সামনে ঘোড়ায় চড়া গাড়িতে চড়ে ফেলুদা, তোপসে এবং জটায়ু

বেড়াতে বেরিয়েছে। জলরঙের মধ্যে যে মাধুর্য এবং পেলবতা আছে তা প্রথম পৃষ্ঠাতেই পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করেন অভিজিৎ। সত্যজিতের ডিটেলিংকেও নিউ মার্কেটের ছবিতে অসাধারণ নৈপুণ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন চিত্রকাহিনিকার। এমনিতে সাহিত্য হোক অথবা চলচ্চিত্র পরিচালনা সত্যজিৎ চিরকালই ডিটেলিং এ বিশ্বাসী।-সম্ভবত তাঁর পরিচালক বা চিত্রনাট্যকার সত্ত্বাই তাঁকে এই ডিটেলিং এ অনুপ্রাণিত করেছিল। ফেলুদার গল্পগুলিতেও আমরা দেখতে পাই প্রায়-লেখক অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছেন। সত্যজিৎ রায়ের সংলাপ এতটাই শক্তিশালী এবং বলিষ্ঠ যে চিত্রকাহিনিকারের নতুন করে বিশেষ কিছু করার থাকে না। তবে অদ্ভুত লাগে এই চিত্রকাহিনি থেকে সিধু জ্যাঠার উল্লেখ বাদ পড়া। *গোলাপী মুক্তো রহস্য* উপন্যাসে সিধু জ্যাঠা নিজেই নিজেকে মাইক্রফ্ট হোমসের সঙ্গে তুলনা করেন। *গোলাপী মুক্তো রহস্য* ছাড়াও সিধু জ্যাঠা *সোনার কেল্লা, কৈলাশে কেলেঙ্কারি, গোরস্থানে সাবধান* এবং *বাক্স রহস্য* এই পাঁচটি ফেলুদা কাহিনির মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। সিধু জ্যাঠা যেমন সাকুল্যে পাঁচটি কাহিনিতে উপস্থিত তেমনই মাইক্রফ্ট হোমসও *দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব্ দ্য গ্রিক ইন্টারপ্রেটার, দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব্ দ্য ব্রুস পার্টিংটন প্ল্যানস* এবং *দ্য ফাইনাল প্রবলেম*এ উপস্থিত হয়েছে। - *দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব্ দ্য এম্পটি হাউসে* যেমন তার নাম উল্লিখিত হয়েছে কিন্তু চরিত্র হিসেবে উপস্থিতি নেই তেমনই *নেপোলিয়নের চিঠি*তেও সিধু জ্যাঠার নাম উল্লিখিত হয়েছে চারিত্রিক উপস্থিতি নেই। কোনো সন্দেহ নেই সিধু জ্যাঠা চরিত্রটি অনেকাংশেই মাইক্রফ্ট হোমসের আদলে গড়া। গল্পের শুরুই হয়েছে সিধু জ্যাঠার সত্তর বছরের জন্মদিনের উপহার কিনতে গিয়ে। ঘটনাক্রম এগোলে পাঠক দেখতে পায় অ্যান্টিক কালেক্টর পেস্টনজীর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার আগেও ফেলুদা সিধু জ্যাঠার কাছ থেকে নেপোলিয়ন এবং আর্টিস্টিক জিনিস সম্বন্ধে বইপত্র সিধু জ্যাঠার থেকেই আনিয়ে পড়েছে। সেখানে সিধু জ্যাঠা চরিত্র ফেলুদার চিত্রকাহিনি বাদ পড়া সত্যিই আশ্চর্যের। যেহেতু আখ্যান এবং চিত্রকাহিনি দুটি পৃথক মাধ্যম তাই চিত্রকাহি্নিকারের স্বাধীনতা গ্রহণের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। সত্যজিতের গোয়েন্দাকাহিনিগুলোতে তোপসের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক প্রদোষচন্দ্র মিত্রের থেকে একাধিক বিষয়ে জ্ঞানতৃষ্ণা মিটিয়ে নিতে পারে। বিচিত্র বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী সিধুজ্যাঠার সংযোজন নিঃসন্দেহে আখ্যানের আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে দেয়। সেক্ষেত্রে চিত্রকাহিনিতে এই চারিত্রিক বিয়োজন চিত্রকাহিনির গল্পের পক্ষে হানিকর।

জঁরের দিক থেকে ফেলু মিত্তিরদের কাহিনি রহস্য আখ্যান বলেই একাধিক ক্লু সত্যজিৎ সমগ্র কাহিনি জুড়েই ছড়িয়ে রাখেন। ছড়িয়ে থাকে সত্যজিতের রসবোধ এবং চলচ্চিত্রকারের সমস্ত গুণাবলী। সেগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার না করেও একজন পাঠক সাহিত্যের টেক্সট থেকে নির্ভেজাল গল্পের যে আনন্দ পাবেন তা চিত্রকাহিনি বা সিনেমা থেকে নাও পেতে পারেন। যেমন হালদার বাড়ি থেকে ফিরে আসার পর যখন আবার নিউ মার্কেটে চন্দনার খোঁজখবর নিতে লালমোহনবাবু এবং তোপসে গেছে তখন তোপসে পাঠকদের ডিটেলে জানিয়েছে লালমোহনবাবু কী কী কিনেছেন। সেখানে চিত্রকাহিনিকার একটা স্পিচ বেলুনে লালমোহনবাবুর মুখ দিয়ে জানিয়ে দেন নিউ মার্কেটে এলেই তার কিছু একটা কিনতে ইচ্ছে করে। তার প্রত্যুত্তরে তোপসে বিস্ময় প্রকাশ করলে জটায়ুর সংলাপ, "একটা হিস্টোরিক্যাল ল্যান্ডমার্ক ত!" (পৃষ্ঠা ২) একটা ছোট সংলাপেই জটায়ুকে নিয়ে মজাটাও রইল আবার সত্যজিতের বয়ান থেকে সরেও আসতে হল না। সত্যজিতের গল্পে আছে জটায়ু নিউমার্কেট থেকে কিনেছিলেন দেশবন্ধু মিলসের গেঞ্জি আর সিগন্যাল টুথপেস্ট। সিগন্যাল টুথপেস্ট লালমোহনবাবুর ব্র্যাণ্ড নয়, জটায়ু যে ফরহ্যান্স টুথপেস্ট ব্যবহার করেন তার উল্লেখ আমরা ফেলুদার কাহিনিতে অন্যত্র পেয়েছি। দেশবন্ধু মিলসের মধ্যে দেশীয় উদ্যোগপতির তৈরি হোসিয়ারি দ্রব্যের উল্লেখ গুরুত্বপূর্ণ। পারিবারিকভাবে কুন্তলীন খ্যাত হেমেন বোসের সঙ্গে (উপেন্দ্রকিশোরের বন্ধু ও পরবর্তীকালে মৃণালিনীকে বিবাহ করার সূত্রে ভগ্নিপতি) সংযোগ থাকাতেই হয়তো দেশীয় উদ্যোগপতিদের উপর দুর্বলতা ছিল। সেজন্যই হয়তো দেশবন্ধু মিলসের উল্লেখ। অভিজিৎ ফেলুদার কাহিনিগুলোকে চিত্রকাহিনিতে রূপান্তরের সময় তাঁর নির্মাণকে সমসাময়িক করে তুলেছেন। তাই দেশবন্ধু মিলসের গেঞ্জি চিত্রকাহিনিতে বাদ গিয়ে সেখানে এসেছে অ্যাঞ্জেলো হোসেয়ারির প্যাকেট। এক্ষেত্রে আমরা অনুমান করতে

পারি যখন এই চিত্রকাহিনিতে রূপান্তর চলছে তখন সন্দীপ রায়ের পরিচালিত ফেলুদাকেন্দ্রিক চলচ্চিত্রে ফেলুদাকে সমসাময়িক করার চেষ্টা করেছেন পরিচালক। সন্দীপ রায়ের পরিচালিত চলচ্চিত্রে ফেলুদা মোবাইল ব্যবহার করেছে বা অন্তর্জালে প্রয়োজনীয় তথ্য অনুসন্ধান করেছে, অনুরূপভাবে অভিজিতের চিত্রকাহিনিতেও শহরের হোর্ডিংয়ে মোবাইল ফোনের বিজ্ঞাপন দেখা যায়।

নেপোলিয়নের চিঠি চিত্রকাহিনিতে পার্বতীচরণ হালদার খুনের অন্যতম সন্দেহভাজনের তালিকায় ছিলেন আর. ডি পেস্টনজী। .গল্পে সত্যজিৎ এই নাম রাখলেও চিত্রকাহিনিতে আমরা নেমপ্লেটের যে অর্ধাংশ দেখতে পাই সেখানে নাম আছে এ. পেস্টনজী। এই পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন ছিল বলে আমাদের মনে হয় না। অভিজিতের নির্মিত চিত্রকাহিনির আরও একটি বড় সমস্যা হল তাঁর শট ডিভিশন। অর্থাৎ কোন সংলাপ রাখবেন এবং কোন সংলাপ বাদ দেবেন তা অনেক সময় ভুল করে ফেলেছেন। একটা গোয়েন্দা কাহিনি ঘটনা এবং যুক্তির পারম্পর্যের উপর দাঁড়িয়ে থাকে, অন্তত সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদার কাহিনিগুলো তো বটেই। বাংলা গোয়েন্দা কাহিনিতে স্বপনকুমারের দীপক চ্যাটার্জী বা শশধর দত্তের দস্যু মোহনের কাহিনিতে যেমন একাধিক ঘটনায় যুক্তি পারম্পর্যের ঘাটতি থাকে ফেলুদার কাহিনিতে সেরকম সমস্যা তো নেই বরং প্রখর রুদ্রকে নিয়ে লেখা জটায়ুর কাহিনিতেও একাধিক ত্রুটি বিচ্যুতি প্রদোষ মিত্র দেখিয়ে দেন।- যুক্তি পারম্পর্য লঙ্ঘিত হয়েছে। বারাসতে হালদার বাড়িতে গিয়ে অমিতাভ হালদারের সঙ্গে তার পিতা পার্বতীচরণের ঘরে ঢুকে তাকে মৃত অবস্থায় দেখতে পায়। অমিতাভ পিতার মৃত্যুতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেও ফেলুদা তার অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে হত্যার অস্ত্র চিহ্নিত করে ফেলে। ফেলুদার পূর্ব পরিচিত পুলিশ অফিসার মিস্টার হাজরাকে জানায় পার্বতীচরণের টেবিলে সবুজ ফেল্টের কভারের উপরে হালকা ধুলোর আস্তরণ থাকলেও মাঝখানে গোল মত মতো অংশ ধুলোবিহীন দেখেই পেপার-ওয়েটের গায়েব হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ হয়। অমিতাভ হালদার নিশ্চিত করেছেন টেবিলে ভিক্টোরীয় আমলের পেপার-ওয়েট ছিলো। চিত্রকাহিনির প্যানেলে সত্যজিতের ডিটেল বর্ণনা থেকে সরে গিয়ে টেবিলের রঙ বাদামি রেখেছেন অভিজিৎ। একটি প্যানেলে ফেলুদার সন্দেহকে চিন্তা বেলুনে[৩] শুধুমাত্র'?' দিয়ে সত্যজিতের আবেদনকে ছুঁতে ব্যর্থ হয়েছেন চিত্রকাহিনিকার।

চিত্রকাহিনির আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ওনোম্যাটোপিয়া বা ধ্বনিকৌশলের[৪] ব্যবহার। চিত্রকাহিনির সাফল্যের অনেকাংশই নির্ভর করে এই ধ্বনিকৌশলের উপর। বিশেষ করে অ্যাকশন দৃশ্যে ধ্বনিকৌশলের প্রয়োগ চিত্রকাহিনির আকর্ষণকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। যেহেতু *নেপোলিয়নের চিঠি* চিত্রকাহিনিতে বারাসতে মধুমরলির দিঘির কাছে রাত্রিবেলা হৃষিকেশ ওরফে সাধনের ষড়যন্ত্রে ফেলুদা, তোপসে এবং জটায়ুকে মারপিট করতে হয়েছে সেখানে ধ্বনিকৌশল প্রয়োগের অভাব চোখে পড়ার মত। অথচ এই জায়গায় সফল ওনোম্যাটোপিয়ার প্রয়োগ এই চিত্রকাহিনিকে অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিতে পারত। হুডানইট গোত্রের এই কাহিনিতে ফেলুদা কালো সানগ্লাস পরে হাজির হয়েছে চোখের কালসিটে ঢাকার জন্য। এই যুক্তি সত্যজিৎ তাঁর পাঠকদের জানালেও অভিজিৎ এই কৈফিয়ত দেবার প্রয়োজন অনুভব করেননি। জলরঙের মাস্টার আর্টিস্ট হলেও শট ডিভিশনে এবং এনক্যাপসুলেশনে[৫] তাঁর কিছু খামতি রয়ে গেছে। তবে লঙ্‌শটে বাংলা চিত্রকাহিনির জগতে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠশিল্পী। এই চিত্রকাহিনির সেন্ট পল ক্যাথিড্রাল গির্জা বা সাহেবিকেতায় হালদারদের বাড়ির যে প্যানেল তিনি নির্মাণ করেছেন তা এক কথায় অসাধারণ।

আমেরিকায় ডিসি বা মার্ভেল বা ফ্রান্সে অ্যাসটেরিক্সের মতো স্টুডিওতে একটা চিত্রকাহিনির নির্মাণে একাধিক শিল্পী তাদের নির্দিষ্ট কাজটি করেন। পেন্সিলার, ইংকার, কালারিস্ট, লেটারার, কার্টুনিস্ট বা লেখকের[৬] কাজ আলাদা আলাদা মানুষ করে থাকেন। বাজার এবং পুঁজির অভাবে বাংলায় এই সবগুলো কাজই একজন চিত্রকাহিনিকারকে করতে হয়। একজন উঁচুদরের শিল্পী একজন ভালো গল্পকার নাও হতে পারেন। তখনই শট ডিভিশন এবং এনক্যাপসুলেশনে সমস্যা

দেখা দিতে পারে। সত্যজিতের মতো উঁচুদরের শিল্পীর কাজকে নতুন করে নির্মাণ করার কিছু ঝুঁকি থেকেই যায়। সেদিক থেকে অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় উত্তীর্ণ। তবে এই এক মাধ্যম থেকে ভিন্ন মাধ্যমে রূপান্তরের ক্ষেত্রে কিছু স্বাধীনতারও প্রয়োজন হয়। সংরূপগত দিক থেকে গোয়েন্দা কাহিনি হলে সেই প্রয়োজন হয় আরও বেশি। সাধারণভাবে রহস্য আখ্যানের একদম শেষে গিয়ে তার পর্দা উন্মোচন করেন গোয়েন্দা কিন্তু চিত্রকাহিনিতে গোয়েন্দা যে প্যানেলে অপরাধের কোনো ক্লু পাচ্ছেন, সেই প্যানেলের ছবি থেকে সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে পাঠক একটা ধারণ পেতেই পারেন। সেইজন্যই কিছু কৌশল ও স্বাধীনতা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে গোয়েন্দা চিত্রকাহিনিকারের। অভিজিৎ অনেক সময়েই সে স্বাধীনতা গ্রহণ করে সফল হয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি, *বোসপুকুরে খুনখারাপি* গল্পে প্রদ্যুম্ন হত্যার অস্ত্র কোথায় লুকিয়েছিল সে সম্পর্কে সত্যজিৎ ছিলেন নীরব। চিত্রকাহিনির প্রয়োজনে অভিজিৎ আচার্য বাড়ির একাধিক প্যানেলে একটা মানিপ্ল্যান্টের ছবির উপর জোর দেন এবং একদম শেষে গিয়ে জানতে পারি প্রদ্যুম্ন অস্ত্র মানিপ্ল্যান্টের ঝোপের মধ্যেই লুকিয়েছিল। অভিজিতের এই সংযোজন সত্যজিতের উপর কলম চালানো নয়, কিন্তু এই স্বাধীনতা গোয়েন্দা কাহিনির কার্যকারণ সম্পর্ককে আরও বলিষ্ঠ করেছে। পরিচিত কাহিনির চিত্রকাহিনিতে রূপান্তর হলেই চিত্রকাহিনিকারের একটা দ্বিধা কাজ করে যে, তিনি কতটা মূলানুগত থাকবেন আর কতটা স্বাধীনতা গ্রহণ করবেন। এই দোলাচলতা থেকে চিত্রকাহিনিকারের মুক্তিই সফল চিত্রকাহিনির রসায়ন।

আবার অতিরিক্ত স্বাধীনতা কখনো চিত্রকাহিনির ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। যেমনটা হয়েছে *অম্বর সেন অন্তর্ধান রহস্য*-এ। চিত্রকাহিনিকে সময়োপযোগী করতেই অম্বর সেনের অ্যাক্সিডেন্টের ক্ষতিপূরণের অঙ্ক সত্যজিতের গল্পের পাঁচ হাজার চিত্রকাহিনিতে হয়েছে এক লাখ। কিন্তু অম্বর সেনের মুক্তিপণের অঙ্ক হয়েছে দুই লাখ। সত্যজিতের গল্পে যা ছিল কুড়ি হাজার। মুক্তিপণ ক্ষতিপূরণের চারগুণ। ফেলুদা অম্বর সেনের অন্তর্ধান নিয়ে তাদের পাম অ্যাভেনিউয়ের বাড়িতে গেলে অম্বুজ সেনের স্ত্রী ফেলুদাকে জানিয়েছিলেন অম্বর সেন অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলেন বছর দশেক আগে। মুক্তিপণ দশ বছর আগের ক্ষতিপূরণের মাত্র দ্বিগুণ। অম্বর সেনের মতো ধনী ব্যক্তির জন্য মুক্তিপণ দুই লাখ ভীষণই কম। সত্যজিৎ রায় এই খুঁটিনাটি ঘটনার উপর তীক্ষ্ণ নজর দিতেন যা এড়িয়ে গিয়ে অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় গল্পের কার্যকারণ সম্পর্ককে অনেকসময় শিথিল করে ফেলেছেন।

এরকমই আরও একটি দুর্বলতা ঘটেছে গল্পের ক্ল্যাইমাক্সে। গল্পে ছিল মুক্তিপণের টাকা রাখতে হবে প্রিন্সেপঘাটে থামের আড়ালে, চিত্রকাহিনিতে যা হয়ে গেছে প্রিন্সেপঘাটের দক্ষিণদিকে কুমীরের মুখের মধ্যে। ফেলুদা গল্পের মধ্যে টাকার ব্যাগ যেখানে রাখা হয় সেই থামের চারপাশে আলকাতরা ছড়িয়ে দেয় কারণ ফেব্রুয়ারি মাসের সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় আলকাতরা তাড়াহুড়োয় লক্ষ করা সম্ভব নয়। সমরেশ মুক্তিপণের টাকা চুরি করলে তার জুতোর তলায় লেগে থাকা আলকাতরা থেকে তাকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে ফেলে ফেলুদা। চিত্রকাহিনিতে ফেলুদা আলকাতরা লাগায় মুক্তপণের টাকার প্ল্যাস্টিকের ব্যাগে। ফেলুদা প্রিন্সেপঘাট থেকে রজনী সেন রোডের বাড়িতে যায় মেকআপ তুলতে। তারপর অম্বর সেনদের পাম আভেনিউয়ের বাড়িতে যেতে যে সময় লাগবে তাতে সমরেশের হাতে লেগে থাকা আলকাতরা তার পরিষ্কার করে ফেলার কথা। জুতোর তলায় আলকাতরা লেগে থাকলে তা চোখে না পড়ারই কথা কিন্তু হাতে আলকাতরা লেগে থাকলে তা সহজেই নজরে পড়বে। শুধুমাত্র ফেলুদার হাতে ধরা পড়ার জন্য সমরেশ মল্লিক এতক্ষণ হাতে আলকাতরা লাগিয়ে বসে থাকবে এ নেহাতই কষ্টকল্পনা। কথাসাহিত্যের চিত্রকাহিনিতে রূপান্তরের সময় এই ধরণের ত্রুটি বিচ্যুতি সত্যিই-চিত্রকাহিনির ক্ষতি করে দেয়।

জটায়ুর সিগনেচার সবুজরঙের অ্যাম্বাসাডার এই চিত্রকাহিনিতেও রয়েছে কিন্তু অম্বর সেনের অ্যাম্বাসাডার পরিবর্তিত হয়ে লাল এসইউভি হয়েছে। এই পরিবর্তনের বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছিল বলে আমাদের মনে হয় না। খুব খুঁটিয়ে না দেখলে এই পার্থক্য চোখে পড়ার কথা নয়। সংযোজন বিয়োজনের এই খেলায় অভিজিৎ কখনো জিতেছেন কখনো হেরেছেন। কিন্তু ত্রুটি বিচ্যুতিকে ঢেকে দিয়েছেন জলরঙের স্নিগ্ধতা দিয়ে। একদিকে সত্যজিৎ রায়ের কালজয়ী-টেক্সট এবং অন্যদিকে অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের অনবদ্য তুলির মিথস্ক্রিয়ায় জন্ম নিয়েছে ফেলুদার চিত্রকাহিনি। সমস্যা হয়তো আছে কিন্তু তা ছাপিয়ে পাঠককের মনোরঞ্জনে এবং চিন্তার খোরাকে ফেলুদার চিত্রকাহিনি সফল।

উল্লেখপঞ্জি :

১। **প্যানেল :** চিত্রকাহিনির একটি পৃষ্ঠায় বহু খণ্ড খণ্ড দৃশ্যের মধ্যে একটি খণ্ডদৃশ্যকে বলে প্যানেল। একটি পৃষ্ঠায় একাধিক প্যানেল থাকতে পারে। সাধারণত প্যানেলগুলো কালো বর্ডার দিয়ে আঁকা হয়। অবশ্য এই বর্ডারের চেহারা বদলেও অনেক সময় আবেগ, উত্তেজনা বা আগের ঘটনার ফ্ল্যাশব্যাক বোঝানো হয়। প্রতি প্যানেলের চেহারা, আকার, তার মধ্যকার ছবি, ক্যাপশন আর কথাবেলুন দিয়ে এক একটি খণ্ডদৃশ্য তৈরি করা হয়। তবে ইদানীংকালে asynchronous প্যানেলের ক্ষেত্রে একই প্যানেলে একাধিক খণ্ডদৃশ্য তৈরির প্রচেষ্টাও লক্ষ করা যায়।

২। **স্প্ল্যাশ :** পাতাজোড়া, বৃহৎ আকৃতির একখানি ছবি। সাধারণত চিত্রকাহিনির শুরুর পৃষ্ঠাটিতেই এই স্প্ল্যাশ পেজ করা হয়। অনেক সময় আবার দুটো পৃষ্ঠা জুড়ে প্রায় পোস্টারের মত বিশালাকার স্প্ল্যাশ পেজ বানানো হয়। পাঠকের আগ্রহ বাড়াতে স্প্ল্যাশ পেজের জুড়ি নেই।

৩। **কথাবেলুন** : চিত্রকাহিনির চরিত্রদের মনের ভাব আর সংলাপ বোঝাতে এটি অপরিহার্য। এদেরকে অনেক সময় কথা-বুদবুদও (Speech bubble) বলা হয়। বেলুনের একটি লেজ থাকে, যেটি বক্তার দিকে ইঙ্গিত করে। মেঘের মতো দেখতে চিন্তা-বেলুন (Thought balloon) বক্তার না বলা কথাকে তুলে ধরে। কাঁটার মতো দেখতে বেলুন চিৎকারকে ফুটিয়ে তোলে দারুণভাবে। এককথায় কথাবেলুনই চরিত্রদের জীবন্ত করে তুলল।

৪। **ধ্বনিকৌশল** : গ্রিক শব্দ Onoma মানে শব্দ আর topoeia মানে আমি করি। কাউকে মারার সঙ্গে সঙ্গে 'দড়াম' করে পড়ে যাওয়ার যে শব্দ তাকেই বলে ধ্বনিকৌশল। চিত্রকাহিনিতে ধ্বনিকৌশল প্রয়োগের কৃতিত্ব বাজ সইয়ার স্রষ্টা রয় ক্রেনের। বাংলায় নারায়ণ দেবনাথের বাঁটুলের সঙ্গে 'ইরক!', 'ইয়োফ্' প্রায় সমার্থক হয়ে গেছে। এই ধ্বনিকৌশলের প্রয়োগ চিত্রকাহিনিকে অন্যমাত্রা দেয়।

৫। **এনক্যাপসুলেশন বা ফ্রেমবনন্দিকরণ** : এটি সম্পূর্ণ লেখক-কার্টুনিস্টদের দায়িত্ব। গল্পের সবকটি দৃশ্য চিত্রকাহিনিতে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই ঠিক কোন কোন দৃশ্যগুলো দিলে তা পাঠকদের ক্লোজারে সাহায্য করবে, তা বুঝতে হয় চিত্রকাহিনিওয়ালাদের। সেই বুঝে প্যানেলের আকার, আকৃতি, সংখ্যা, গঠন এবং প্রতি ফ্রেমে চরিত্রদের কীর্তিকলাপ স্থির করতে হয়। এককথায় এনক্যাপসুলেশন আর ক্লোজার সঠিক না হলে ভালো চিত্রকাহিনি নির্মাণ অসম্ভব।

৬। **কার্টুনিস্ট** : যিনি ছবিগুলো আঁকেন। অনেক সময় কার্টুনিস্টের কাজ ভাগ করে নেয় অনেক মানুষ। তারা হলেন –

পেন্সিলার—প্রতি পৃষ্ঠায় খসড়া পেন্সিল ড্রয়িং করেন পেন্সিলার। ঠিক করেন চরিত্রগুলো দেখতে কেমন হবে, পারিপার্শ্বিক কিংবা চরিত্রদের দেহের ভঙ্গি, মুখের ভাব। প্যানেল কীভাবে সজ্জিত হবে, তাও ঠিক করেন এই পেন্সিলার।

ইংকার---ইংকার বা ফিনিশার ইন্ডিয়া ইংক দিয়ে পেন্সিলারের কাজকে সম্পূর্ণতা দেন। তবে কাজটা মোটেই সহজ নয়। পেন্সিলারের খসড়া কাজকে নিখুঁত ডিটেলিং-এর দায়িত্ব ইংকারের উপরই বর্তায়।

কালারিস্ট—নামেই পরিচয়। সাদা-কালো চিত্রকাহিনিকে মুড অনুযায়ী রঙে রাঙাবার দায়িত্ব কালারিস্টের। আগে রুবিলিথের রঙ করা হত। তারপর পোস্টার কালারের যুগ পেরিয়ে এখন ডিজিটাল কালারের যুগ।

লেখক : আগে কার্টুনিস্টের মতো গল্প ফাঁদতেন। তবে চিত্রকাহিনির রমরমার সঙ্গে উঠে এসেছেন ফ্রাঙ্ক মিলার, অ্যালান মুরের মতো চিত্রকাহিনির কাহিনিকাররা—যাঁদের অনেকে চিত্রনাট্য লেখকও বলেন। এঁরা একটি গল্প লেখেন। তারপর প্রতি প্যানেলে কোন কোন চরিত্র থাকবেন, কী কী কথা হবে এমনকি চরিত্রদের দেহভঙ্গিও সময় সময় ঠিক করে দেন। সিনেমার পরিচালকদের মতোই দায়িত্ব এই চিত্রকাহিনির আখ্যানকারদের।

লেটারার : যিনি অক্ষরগুলো লেখেন। ইনি হাতের লেখা বিষয়ে (যাকে ক্যালিগ্রাফি বলে) দক্ষ। কথাবেলুন, ক্যাপশন আর বিভিন্ন ধবনির জন্য শব্দগুলি লেটারারের সৃষ্টি। কিছু ক্ষেত্রে চরিত্রদের বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য করতেও লেটারিং ব্যবহৃত হয়। মুখের কথা আর মনে ভাবা কথাতেও আলাদা লেটারিং। বিভিন্ন শব্দের অন্তর্নিহিত শব্দের অর্থ ফুটিয়ে তুলতে এদের জুড়ি নেই।

ড. পিনাকী মাইতি : ত্রিপুরার বিলোনিয়ায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সহকারী অধ্যাপক।

রায়বাবু, ক্যামেরা চলছে ও কাশবনের সেই দৃশ্য

একটি বিশেষ অঞ্চল। সেখানে শুটিংয়ের কিছু অভিজ্ঞতার স্মৃতিকথা।
বদলে দিল ভারতীয় চলচ্চিত্রের গতিপথ। বিষয়টি ফিরে দেখলেন **ঋষিগোপাল মণ্ডল**।

পালসিট স্টেশনটা পাশের দুই নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে প্রায় দেড় তলা উঁচুতে। ট্রেনের জানালা থেকে দেখলে পাহাড়ি এলাকা বলে বিভ্রম হয়। এখানেই কোথাও সত্যজিৎ রায়ের ‘পথের পাঁচালীর’ অপু দুর্গার কাশবনে দৌড়ে রেলগাড়ি দেখতে যাওয়ার শুটিং হয়েছিল। শুটিংয়ে যাওয়ার সময় রায়বাবুর ক্রু লেভেল ক্রসিংয়ে আটকে গেল। একটা ট্রেন যাচ্ছে। দিনের স্বাভাবিক কাল ক্রমে কমে আসছে। পরের ট্রেন আবার কখন কে জানে! ইউনিটের সকলের মাথায় হাত। লেভেল ক্রসিং খুলতেই ইউনিটের একজন ভারী মিচেল ক্যামেরা কাঁধে স্পটের দিকে ছুটলেন। ক্যামেরাম্যান সৌমেন্দু রায় ছুটলেন মাথায় চব্বিশ ভোল্টের ব্যাটারি নিয়ে। তারপর কাশবন পেরিয়ে অপুর রেলগাড়ি আবিষ্কারের শট নেওয়া হল। একেই বলে শুটিং!

বর্ধমান–হাওড়া রেলপথের মেন লাইনে এই পালসিট স্টেশন। ডাউন রেল লাইনের পাশে হয়েছিল শুটিং। সাদা কাশফুলে ভরে গেছে পালসিট স্টেশনের দুই ধার। রেললাইনের দু'পাশে কাশবনের স্মৃতি আজও সিনেমোদিদের ভোলার কথা নয়। এখানেই 'পথের পাঁচালী'র প্রথম শুটিং করে চলচ্চিত্রের রূপ দিয়েছিলেন বিশ্ববিশ্রুত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়।

সত্যজিৎচর্চায় পথিকৃৎ দেবাশিস মুখোপাধ্যায় এক সাক্ষাতকারে জানান, সত্যজিৎ রায়ের তখন টাকাকড়ি খুব কম থাকায় ওই সময় ক্যামেরাটি যেহেতু গাড়ি থেকে নামিয়ে বেশিদূর নিয়ে যাওয়া যাবে না। সেইজন্য উনি চেয়েছিলেন, এমন একটা লোকেশন যেখানে কাশবনের পাশে রেললাইন থাকবে এবং সেটা বড়ো রাস্তার ধারেও হবে। তারপরই এই জায়গাটির খোঁজ পান তাঁর প্রোডাকশন ম্যানেজার অনিল চৌধুরি।

১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী চলচ্চিত্রের চিত্রগ্রাহক হিসাবে মাত্র বাইশ বছর বয়েসে তার চলচ্চিত্র জীবনের সূচনা হয় সুব্রত মিত্রর'। চলচ্চিত্রের ক্যামেরার ব্যবহার সম্পর্কে এর আগে তার কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। দ্য রিভার ছবিতে পর্যবেক্ষক হিসাবে তার অভিজ্ঞতা নিয়েই তিনি পথের পাঁচালীর চিত্রগ্রাহকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পথের পাঁচালী থেকে শুরু করে নায়ক সত্যজিৎ রায়ের এই দশটি ছবি ছাড়াও তিনি অন্য পরিচালকের বাংলা, ইংরেজি এবং হিন্দি ছবিতে কাজ করেছেন।

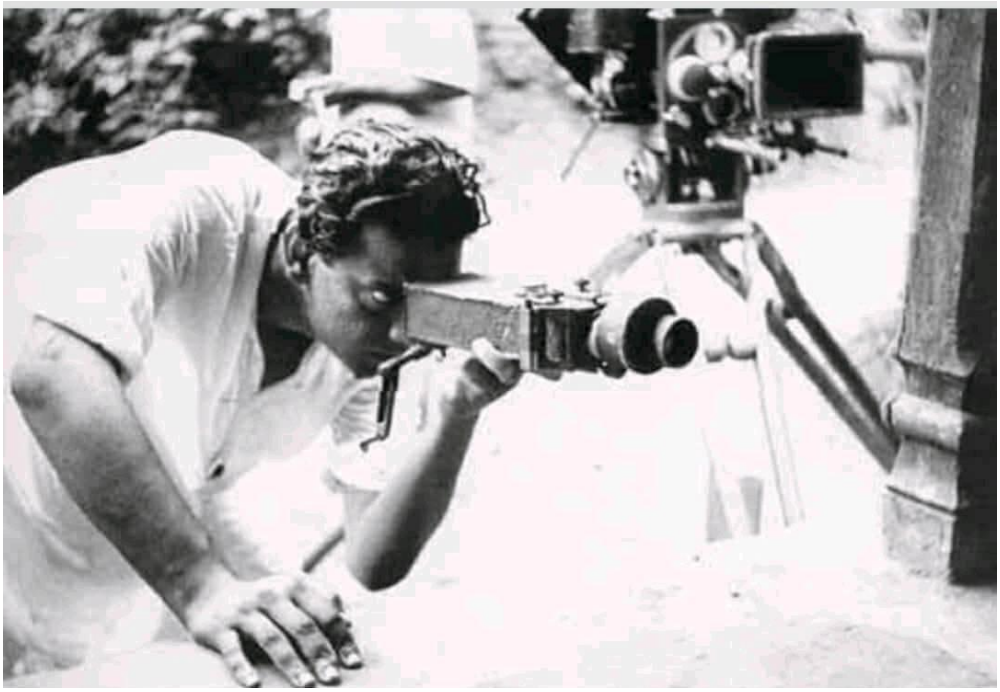

সিনেমার পর্দায় আলোছায়ার খেলায় সুব্রত মিত্র এতটাই দড় ছিলেন যে তাঁর ক্যামেরায় তোলা ছবি যেন আক্ষরিক অর্থেই 'ছায়াছবি' হয়ে উঠতে পেরেছিল। এইখানে আমরা পথের পাঁচালীর অনেক দৃশ্যই স্মরণ করতে পারি। হরিহরের অন্তঃপুর দৃশ্যটির সময় অনিবার্য কারণে বংশী চন্দ্রগুপ্তকে সর্বজয়ার উঠোন সেটে বানাতে হল। আর সুব্রত মিত্র সাদা কাপড় থেকে আলো প্রতিফলিত করে উদ্ভাবন করলেন পেলব, বারাণসীর প্রায়ান্ধকার বাড়ির মতো কোমল আলো। চারুলতার জন্য সুব্রতবাবুকে অন্য কৌশল নিতে হল। যেহেতু সত্যজিৎ স্থানের গুরুত্ব ও মাত্রা বাড়াতে চাইছিলেন, সুতরাং সুব্রত

কাঠের বাক্সের সাহায্যে বাউন্স লাইটিং-এর ছলনা নির্মাণ করে দিলেন। আর কাঞ্চনজঙ্ঘাতে তো রং অজানা অধ্যায় রচনা করে দিল। কুয়াশার মধ্যে রঙের যে অস্বচ্ছতা যেন বৃষ্টি ভেজা গাড়ির জানলা দিয়ে দেখা রঙিন জগত। সুব্রত মিত্র নিও-রিয়ালিজম বা নব্যবাস্তববাদী ব্যাকরণ অনুযায়ী সাধারণত একটি বিশ্বাসযোগ্য আলোর উৎস ফ্রেমে রাখেন, পছন্দ করেন না তীব্র কনট্রাস্ট। কিন্তু ইন্দির ঠাকরুন যখন বালক অপুকে রূপকথার গল্প শোনান, তার মিচেল ক্যামেরা অভাবনীয়রূপে রচনা করে দেওয়ালে ছমছম করা ছায়ামূর্তি। ব্রেমবান্ট এফেক্ট। 'অপরাজিত' চলচ্চিত্রে সুব্রত মিত্রের সিনেমাটোগ্রাফিতে আমরা দেখতে পাই একটি জীর্ণ এরিফ্লেক্স ক্যামেরার দৌলতে বাউন্সড ডিফিউডজ লাইটের প্রাচ্যরীতি।

'পথের পাঁচালী' শ্যুটিঙ সম্পর্কে এক মজার অভিজ্ঞতা শুনিয়েছিলেন সুব্রত মিত্র। একবার ম্যাক্সমুলার ভবনে অনুষ্ঠিত এক ওয়ার্কশপে 'পথের পাঁচালী'র সিনেমাটোগ্রাফি নিয়ে ক্লাস নিচ্ছিলেন চিদানন্দ দাশগুপ্ত। সে দিন বলার কথা না থাকলেও ক্লাসের মাঝপথে হঠাৎ হাজির সুব্রত মিত্র। আলোচনার মাঝপথে চিদানন্দবাবুর সেই দিকে নজর পড়তেই তিনি একটি দৃশ্যের ব্যাখ্যার জন্য সুব্রতবাবুকে আহ্বান জানান। প্রাথমিক ভাবে অরাজি থাকলেও অনেক চাপাচাপিতে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়েই সুব্রতবাবু বললেন,

> "দেখুন, গত ২৫-৩০ বছর 'পথের পাঁচালী' নিয়ে অনেক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই শুনলাম। কিন্তু এই দৃশ্যের মোদ্দা কথাটা হচ্ছে— আমাদের হাতে একটা ক্লোজ-আপ লেন্স এসেছিল। আমি আর মানিকবাবু লেন্সটা টেস্ট করতে বেরোই। পুকুরের জলে জলপিপি, ফড়িংয়ের ওড়াউড়ি, কলমিলতার হাওয়ায় কাঁপন— এই ধরনের বেশ কিছু শট আমরা তুলি। রাশপ্রিন্ট চালিয়ে দেখা গেল ছবিগুলো ভালোই উঠেছে। পরে এডিটিং-এর সময় মানিকবাবু ঠিকঠাক জায়গায় লাগিয়ে দিয়েছিলেন আর রবিশংকরের মিউজিক ওখানে ঠিকঠাক সিনক্রোনাইজ করে গিয়েছিল। আমি শুধু বলতে পারি জলের উপর জলপিপিদের মুভমেন্টের দৃশ্যে আমরা কোনও ট্রেইন্ড পোকা ইউজ করিনি।"

প্রাথমিকভাবে পথের পাঁচালীতে একটি ভারী মিচেল ক্যামেরার শ্যুট করার পরে সত্যজিত রায় এবং সুব্রত মিত্র এরিফ্লেক্স -35II ক্যামেরা ব্যবহার করেছিলেন। এটি অপরাজিতা ছবিটির শ্যুটিংয়ের জন্যও ব্যবহার করেছিলেন। Nagra reel-to-reel tape recorder এই হাল্কা এবং সহজে বহনযোগ্য ক্যামেরাটি ন্যূনতম ক্রু সহ দ্রুত এবং বহুমুখী অবস্থানের শ্যুটিংয়ের জন্য ব্যবহার করা যেত।

তাঁর 'ক্রনিকল অব দ্য এরিফ্লেক্স' বইতে নরিস পোপ সত্যজিৎ রায়কে প্রথম বিদেশি চলচ্চিত্র নির্মাতাদের এরিফ্লেক্স ব্যবহারকারী বলে উল্লেখ করেছেন। অপু ট্রিলজির চিত্রগ্রাহক সুব্রত মিত্র বেশ কয়েকটি সাক্ষাতকারে বলেছিলেন যে – অপরাজিতার শুটিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হওয়ার পরে জনপ্রিয় হয়েছিল 35 এরিফ্লেক্স ক্যামেরা। রায় ক্যামেরাটিকে এত পছন্দ করতেন যে তিনি নিজে অনেকগুলি শট নিয়েছিলেন। Luis Bunuel এবং Jean-Luc Godard-এর মতো সত্যজিৎ রায়ও ছিলেন এই ক্যামেরার গুণ্ডরাহী।

সত্যজিতের প্রথম দিকের চলচ্চিত্রগুলোর ক্যামেরার কাজ করতেন সুব্রত মিত্র, যিনি পরবর্তীকালে সত্যজিতের কর্মীদল থেকে বেরিয়ে যান। কিছু সমালোচকের মতে সুব্রতের প্রস্থানের কারণে সত্যজিতের চলচ্চিত্রের চিত্রধারণের মান নেমে যায়। বাইরে সুব্রতের প্রশংসা করলেও চারুলতা-র সময় থেকেই ক্যামেরার কাজে সত্যজিৎ নিজের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করতে থাকেন, এবং এর পরিণতিতে ১৯৬৬ সালের পর থেকে সুব্রত আর সত্যজিতের হয়ে কাজ করেননি।

‘শিল্প ও শিল্পী’ পত্রিকার সপ্তম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় সত্যজিতের আর এক ক্যামেরাম্যান সৌমেন্দু রায়ের একটি সাক্ষাৎকারভিত্তিক লেখা প্রকাশিত হয়। সেখানে সৌমেন্দু রায় তাঁর ক্যামেরাজীবন নিয়ে স্মৃতিবিজড়িত নানা কথা বলেছেন। সৌমেন্দু রায়ের জবানিতেই শুনে নেওয়া যেতে পারে সেই সব কথা –

ক্যামেরাই আমার চিরবন্ধু। এতসব পারিপার্শ্বিক ঘটনার মধ্যে দিয়ে সে কীভাবে আমায় হাতছানি দিলো? স্মৃতিচিত্রগুলো আরো একবার নেড়েচেড়ে দেখা যাক –

> আমাদের পরিবারে ছবি তোলার একটা রেওয়াজ ছিল। তখন কারো হাতে ক্যামেরা থাকা মানে সে অন্য সকলের থেকে আলাদা। দাদারা সকলেই ছিলেন অ্যামেচার ফটোগ্রাফার। জ্যাঠতুতো দাদার যেমন একটা ক্যামেরা ছিল, তেমনই আমার দাদারও একটা ক্যামেরা ছিল। ওদের দেখে আমিও বেশ ক্যামেরার লোভে পড়ে গেলাম। মনে হতো, আমারও যদি ওই যন্ত্রটা থাকত, তবে আমিও ছবি তুলতাম। কত মুহূর্ত আমাদের মধ্যে আসে আর চলে যায়। তেমনই, কত কত মুহূর্তের মধ্যে আমরাও আসি আর চলে যাই। ভাবতে অবাক লাগত, কেবলমাত্র একটি সুইচ টিপলেই সেই মুহূর্তটা আর আমার কাছ থেকে সরে যেতে পারছে না, চলে যেতে পারছে না, সে অবিকল রয়ে যাচ্ছে আমারই কাছে, আমারই সঙ্গে। ক্যামেরাকে না ভালোবেসে উপায় কী! কিন্তু তখন একটা ক্যামেরা জোগাড় করা মুখের কথা ছিল না। তখন তো আর এরকম যুগ নয় যে মোবাইল কিনলেই ক্যামেরা ফ্রি! ক্যামেরা পাওয়া যে কত বড় ব্যাপার সেটা বোঝা গেল যখন আমার বড়দি নমিতা বলল, ‘আগে ম্যাট্রিকটা পাশ কর, তবে মিলবে ক্যামেরা, আমি কিনে দেব।’ বুঝলাম, ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা একটা সীমান্তরেখার মতো, যেটা পার না হলে আমি লুচি বা ক্যামেরা, কিছুই পাব না। আচ্ছা গেরোয় পড়া গেল। দাদারা সকলেই পড়াশোনায় ভালো। আমি প্রত্যেকবারই পরীক্ষায় ওই লাল কালির গা ঘেঁষে ঠিক পাশ করে যাই। ম্যাট্রিকটাও উতরে গেলাম। দিদি কথা রেখেছিল। লুচির ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা উঠে গেল। ম্যাট্রিকের ওই সীমানা পার হয়ে আমি তখন এসে পড়লাম যেন এক নতুন দেশে – ক্যামেরার দেশ, ছবির সে দেশ!...টেকনিশিয়ান স্টুডিয়োটি লিজে চলত। জমি একজনের। স্টুডিয়োকে লিজে চালাতেন আরেকজন, তিনিই মালিক। মালিকের সঙ্গে ম্যানেজমেন্টের কী একটা কারণে যেন

ঝামেলা লেগে গেল। ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই বন্ধ করে দেওয়া হল। ফলে স্টুডিয়োর কাজও বন্ধ হয়ে গেল। আমি যদিও প্রত্যেকদিন সেখানে চলে যেতাম অন্য কর্মীদের মতো। বিশাল ওই অন্ধকার স্টুডিয়োর দিকে তাকালে নিজের অন্ধকার ভবিষ্যৎটিকে দেখতে পেয়ে ভয়ে প্রমাদ গুনতাম। ক্যামেরার কাজ কিছুই শিখিনি তখনো। ক্যামেরা সংরক্ষক বা কেয়ারটেকারের ভূমিকা পালন করে গেছি শুধু। এরকম কেয়ারটেকার তো ইন্ডাস্ট্রিতে কত লোকই আছেন। আমাকে কে কাজে নেবেন? নিয়তির কথা বলছিলাম না, শুনতে পেলাম, একটি ছবি শুটিংয়ের কাজ চলতে চলতেই টাকার অভাবে বছর দুই আগে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সেটি আবার চালু হবে। যিনি পরিচালক, শুনলাম ওই প্রথম পর্বের শুটিং তিনি অত্যন্ত আর্থিক প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে করেছেন। শুটিংয়ের খরচ জোগানের জন্য তাঁকে নাকি স্ত্রীর সমস্ত গহনাও বেচে দিতে হয়েছে। শেষে, পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ের আর্থিক আনুকূল্যে আবার চালু হতে চলেছে সেই ছবির শুটিং। ছবির নাম? পথের পাঁচালী।... আর সুব্রত মিত্রর কথা কী বলব! তিনি আমার থেকে মাত্র বছর দুয়েকের বড়। পথের পাঁচালীতে সিনেমাটোগ্রাফার হিসেবে কাজ করার সময় তাঁর বয়স কত আর – বড়জোর চবিবশ কি পঁচিশ। আরো যেটা বিস্ময়, মানিকদার মতো সুব্রতদারও ওই সিনেমাই ছিল ছায়াছবির দুনিয়ায় প্রথম কাজ। এর আগে তিনি স্টিল ক্যামেরায় ছবি তুলেছেন সত্য কিন্তু মুভি ক্যামেরা, তাও আবার মিচেল ক্যামেরা, যাকে নিয়ে কাজ করতে গেলে যথেষ্ট প্রশিক্ষণ প্রয়োজন – সুব্রতদা সেসব কিছু না জেনেই ওরকম একটা ইতিহাস তৈরি করতে পারলেন! হয়তো একটু-আধটু পড়াশোনা করে থাকতে পারেন তিনি ওই ক্যামেরা, তার কার্যকারিতা সম্পর্কে। কিন্তু এটুকু প্রশিক্ষণ তো যাকে বলে একেবারেই প্রাথমিক স্তরের। কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা, কোনো উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ছাড়াই স্রেফ প্রতিভা এবং কল্পনার সমন্বয়ে বলা যায় সুব্রতদা এক প্রকার ঝাঁপ দিয়েছিলেন ওই না-জানা জগতে।...আর আমার কী ভূমিকা ছিল পথের পাঁচালীতে! ট্রলি করতাম, ট্রলি পাততাম, রিফ্লেক্টর ঠিক করে দিতাম – এসবই। তবে সবচেয়ে বেশি যে-কাজটা করে গেছি তা হলো সবকিছু পর্যবেক্ষণ করা, দেখা। দেখেছি, সুব্রতদা কত রিস্ক নিয়ে একের পর এক দৃশ্য শুট করে গেছেন। তখন তো মনিটর ছিল না যে কোনো শট ওকে হওয়ার পর সেটা কেমন হল দেখে নেওয়া যাবে। সবকিছুই অনুমানের ওপর দাঁড়িয়ে। তখন, সে মুহূর্তে সুব্রতদার ওই কাজ নিয়ে মনে মনে প্রচুর প্রশ্ন জাগত কিন্তু করার সাহস ও সুযোগ, কোনোটাই হয়নি। পরবর্তীকালে অবশ্য সবটুকুই জেনেছি তাঁর থেকে। বলা যায়, ক্যামেরার যতটুকু আমার শিক্ষা তা সবই সুব্রতদার কাছ থেকেই শিখেছি। আমি ভাগ্যবান যে তাঁর মতো একজন গুরুকে পেয়েছিলাম কাজ করতে আমার প্রায় প্রথম থেকেই।

'বাংলাচলচ্চিত্রের বিষয়-আশয়' নিবন্ধে বিশিষ্ট সিনেমা-বিশেষজ্ঞ সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় বর্ধমানের পালসিটে পথের পাঁচালীর শুটিং নিয়ে কিছু কথা লিখেছিলেন । সেই লেখায় সঞ্জয়বাবু জানান,

পথের পাঁচালীর প্রথম দৃশ্যের কথা ভাবুন। আমি যখন কলামন্দিরে ছিলাম তখন রাস্তাতে মাঝে মাঝে সৌমেন্দুদার সাথে কথা হতো। অনেক গল্প হত পথের পাঁচালী নিয়ে। কারণ তিনি ছিলেন পথের পাঁচালীর অপারেটিভ ক্যামেরাম্যান। সৌমেন্দুদা বলেছিলেন একেবারে ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শট তোলা হয়েছিল জগদ্ধাত্রী পূজার দশমীর দিন।...সত্যজিৎ রায় নিজেই বলেছিলেন দুর্গাকে কাশবনে দেখে সত্যজিৎ রায়ের খুব ভাল লেগেছিল। তিনি অনেকগুলো ক্লোজ-শট নিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন পরে এগুলোকে জুড়ে দেবেন।...যে ছবি তিনি একদিনে তুলবেন ভেবেছিলেন সেটা পরের সপ্তাহে তোলার প্রয়োজন পড়ে গিয়েছিল। যেহেতু তখন তিনি চাকরি করতেন তাই প্রতিদিন শুটিং করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই পরের সপ্তাহে তিনি গেলেন। কিন্তু গিয়ে আর জায়গাটা খুঁজে পাচ্ছেন না। জায়গাটা ছিল বর্ধমানের পালসিট, যেখানে আমরা ল্যাংচা খাই অর্থাৎ শক্তিগড়, তার ঠিক আগে। সে জায়গাটা ছিল পালসিট এর রেল লাইনের ধারের একটা কাশবন । তিনি তো জায়গাটা খুঁজছেন, তখন এক বৃদ্ধ সেখানে ঘোরাঘুরি করছিলেন। তিনি জানতে চাইলেন আপনারা কি কাউকে খুঁজছেন? তারপর নিজেই বললেন যে, আপনারা তো গত রবিবার এখানে এসেছিলেন। অনেক ছবি তুললেন। তখন ঐ বৃদ্ধকে সত্যজিৎ রায়

> জিজ্ঞাসা করলেন এখানের কাশবনটা গেল কোথায়? বুড়ো তখন হেসে বললেন আপনারা তো শহরের লোক তাই জানেন না কাশ তো সিজনাল ফুল। সে তো কবেই গরু-মোষ খেয়ে গেছে। সে কি আর এতদিন থাকে! এর ফলে ছবিটা এক বছর পিছিয়ে যেতে বাধ্য হল। কারণ কাশ তো আর কৃত্রিমভাবে তৈরি করা যাবেনা। হিন্দি সিনেমা হলে হয়তো কৃত্রিম কাশ করে নেওয়া হতো। কিন্তু তাতে তো আর এই ইফেক্ট আসতো না। কিন্তু সত্যজিৎ রায় একগুঁয়ে। তিনি 'এ লং টাইম অন রোড' নামে একটি লেখা লিখেছিলেন। এবং তাতে নিজেই ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, শহরের মানুষ হওয়ায় এবং জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকায় কোথায় কোথায় তার সমস্যা হয়। এ ছবিতে তিনি সংলাপ খুব কম রেখেছিলেন। কারণ তার উদ্দেশ্য ছিল পিক্টোরিয়ালকে চূড়ান্ত মর্যাদা দেওয়া।

দীর্ঘ এই নিবন্ধে সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় আরো বলেছেন,

> এই ছবিতে শটের সংখ্যা কম ছিল সেটা দুলালবাবু (পথের পাঁচালীর সম্পাদক দুলাল দত্ত) পয়েন্ট আউট করেছিলেন সত্যজিৎ রায়কে। কিন্তু ছবিটা নিউইয়র্ক-এ দেখানোর জন্য তৈরীর তখন এত তাড়াহুড়ো যে আর ছবি রি-শট করা যাবে না। তাই ওই কম শট নিয়ে এই ছবিটা তৈরি হয়ে যায় এবং ছবিটা হয়ে ওঠে এশিয়ার মুখ। আমাদের গর্ব এটাই ভাবতে যে সারা পৃথিবীর সিনেমার যে ইনস্টিটিউটে যান না কেন তার দেওয়ালে কাশবনের মাঝে অপু দুর্গার মুখ এবং এই ছবিটাই এশিয়ার ছবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে।

বর্তমান লেখক সিনেমাতাত্ত্বিক নন। ফলত পথের পাঁচালী নামক বিশ্ব বিশ্রুত ও বহি চর্চিত সিনেমা নিয়ে আলোচনা লেখকের উদ্দেশ্য নয় ।সেই স্পর্ধা ও দুঃসাহসও নেই। পথের পাঁচালীর আইকনিক দৃশ্যের শুটিং হয়েছিল বর্ধমানের পালসিট সংলগ্ন এলাকায়। লেখক বর্ধমান জেলার (অধুনা পূর্ব বর্ধমান) বাসিন্দা। 'এই জেলায় ওই দৃশ্যের শুটিং'! শীর্ষক কখনও না ফুরানো বিস্ময় ও শ্লাঘা থেকেই টুটাফুটা ও কোটেশনাকীর্ণ এই লেখা।

তথ্যঋণ :

- কালীশ মুখোপাধ্যায়, *বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের ইতিহাস*, পত্রভারতী।
- সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, *অনভিজাতদের জন্য অপেরা*, প্রতিভাস।
- https://www.itihasadda.in/bengali-film/*বাংলা চলচ্চিত্রের বিষয়-আশয়*, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়।
- https://www.shilpaoshilpi.com
- *আওয়ার ফিল্মস, দেয়ার ফিল্মস*(১৯৭৬), সত্যজিৎ রায়।
- *বিষয় চলচ্চিত্র*(১৯৭৬), সত্যজিৎ রায়।
- *একেই বলে শুটিং* (১৯৭৯), সত্যজিৎ রায়।
- Biswas, M., (Ed.) (1979), *Apu and After : Revisiting Ray's Cinema*, Seagull Books.
- Mitra, S., (1983), The Genius of Satyajit Ray, India Today.

ঋষিগোপাল মণ্ডল : বর্ধমান মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহিলা কলেজের গনজ্ঞাপন ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক।

বিভূতিকথার নবনির্মাণ : প্রযত্নে সত্যজিৎ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যের সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রের সম্পর্ক। সৃষ্টির দুই ভিন্ন ধারা কীভাবে এক স্রোতে নিত্য বহমান, তারই আলোচনায় **সুব্রত কুমার দে**।

(১)

'নবজাতক' কাব্যের নাম-কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথ এক নব আগন্তুকের উদ্দেশ্যে অজানা প্রশ্নে সম্ভাষণ করে লিখেছিলেন –

নবীন আগন্তুক,
নবযুগ তবু যাত্রার পথে
চেয়ে আছে উৎসুক।
কি বার্তা নিয়ে মরতে এসেছ তুমি;
জীবনরঙ্গভূমি
তোমার লাগিয়া পাতিয়াছে কী আসন।
নরদেবতার পূজায় এনেছ
কী নব সম্ভাষণ।
অমরলোকের কী গান এসেছ শুনে।[১]

উক্ত রবীন্দ্র-বক্তব্যটি নবযুগের অগ্রদূত, পরাধীন দেশের সোচ্চারি কুশীলব সত্যজিৎ রায়ের জীবনছন্দের সঙ্গে এক হয়ে যায়। ভারতবর্ষের এমন এক তমসাচ্ছন্ন সময়ে সত্যজিৎ রায়ের আবির্ভাব (২রা মে, ১৯২১), যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-

’১৮) কালিমালিপ্ত-ভয়ঙ্কর দিনলিপির অবসান হয়নি, অগণিত শৃঙ্খলিত-নিপীড়িত মানুষের মন থেকে ম্লান হয়নি সেই সকল ভয়াবহ দিনগুলির কথা; উনিশ শতকের উদার মানবধর্মের নির্মিত পরিখার ভগ্নদশার মাটি সবেমাত্র প্রস্তুত হচ্ছে, আর সেই সুযোগে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় মার্কসীয় মতাদর্শের ছায়াতলে বৈপ্লবিক ভাবান্দোলনে সোচ্চার হতে শুরু করে। আর একটু তফাতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে’র (১৯৩৯-’৪৫) আবহতটে নতুন ভাবাদর্শে লেখক-শিল্পী সংঘ ‘Indian People’s Theatre Association’ (IPTA)-এর প্রতিষ্ঠালগ্নে (১৯৪১) মাত্র বিশ-বছরীয় তারুণ্যে তেজোদ্দীপ্ত হতে শুরু করেন কিশোর-যুবক সত্যজিৎ। বিশেষ কোনো ভাবাদর্শের সারথি না হলেও বিশ শতকের বিশ-ত্রিশ দশকের চতুঃপার্শ্বের আবহাওয়ায় তাঁর প্রতিভাভূমি প্রস্তুত হতে শুরু করে। “যুবাবয়স থেকে প্রৌঢ়ত্ব – এই পাঁচ দশক সময়ে স্বাধীনতা আন্দোলন, মন্বন্তর, দেশবিভাগ, শরণার্থী আগমন, বাম আন্দোলন, নকশাল বিক্ষোভ, জরুরি অবস্থা ইত্যাদির মতো অনেক উত্তাল ঘটনার সাক্ষী কলকাতার মানুষ সত্যজিৎ। সক্রিয় রাজনীতিতে তো নয়ই সংস্কৃতিচর্চার বাম বা দক্ষিণপন্থী বলে চিহ্নিত কোনও সংগঠনের সঙ্গে সরাসরি জড়িত হননি তিনি। বিষয়-অনুযায়ী কখনও সহানুভূতি, কখনও বিরোধিতা প্রকাশ করেছেন। তাঁর অবস্থান ‘সোস্যালিস্ট সাইড অফ দ্য ফেন্স’-এ, এমনটা অবশ্য তিনি মনে করতেন। তাঁর কমিটমেন্ট ছিল শিল্পের প্রতি, মানুষের ধর্মের প্রতি। সত্যজিতের মনন, দৃষ্টিভঙ্গি ও শিল্পরূপ আন্তর্জাতিক; কিন্তু ঘরোয়া ও সামাজিক আচরণে ছিল একজন নির্ভেজাল বাঙালিয়ানা”।[২] এককথায় তিনি এমন এক স্রষ্টা, যাঁর হাত দিয়েই চলেছে সাহিত্যের সংযোজন-বিয়োজন-পরিমার্জনের যজ্ঞাদি। সমকালীনতা, জীবনবাস্তবতা, প্রতীকী ব্যঞ্জনার নিবিড় অনুসন্ধান – সার্বিকভাবে আক্ষিপ্ত হয়েছে সত্যজিতের হাতযশে। প্রসঙ্গ ও অনুসঙ্গসূত্রে এ প্রবন্ধের নিবিড়ে তাঁর সেই শিল্প-সৌষ্ঠবের তত্ত্ব প্রদর্শিত হবে।

(২)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের যোগাযোগ যেন কোনো এক অলৌকিক শিল্পসত্যে বাঁধা। জীবনে চলার পথে গুরু রবীন্দ্রনাথ নির্দেশিত পথেই সত্যজিতের এগিয়ে চলা। সত্যজিৎ রায়ের প্রারম্ভিক জীবনপর্ব খেয়াল করলে দেখব – তাঁর আবির্ভাব কলকাতার সাহিত্য-শিল্পী সমাজের সম্ভ্রান্ত ‘রায়’ পরিবারে; পূর্বপুরুষের বসতি ব্রিটিশ অধ্যুষিত অখণ্ড বাংলার কিশোরগঞ্জের (বর্তমানে বাংলাদেশ) কটিয়াদী উপজেলার মসূয়া গ্রামে। প্রসঙ্গান্তরে একটি বংশতালিকা নিম্নে সংযোজন করা হ’ল –

রায় পরিবার

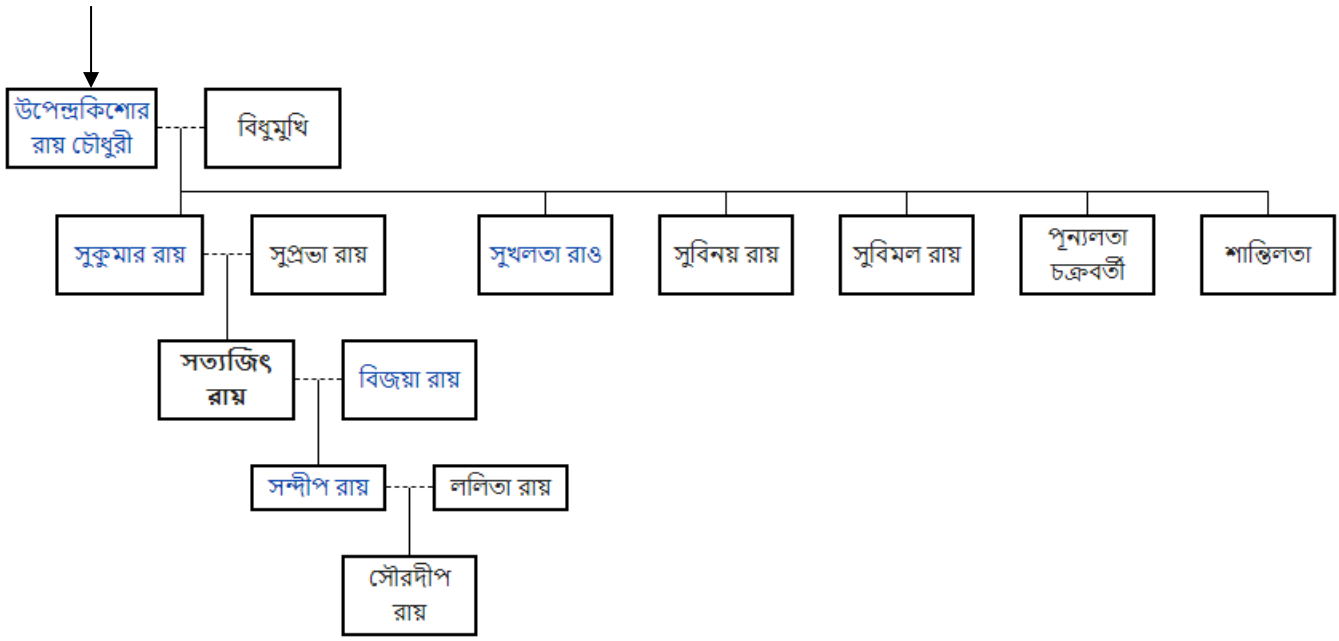

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সত্যজিতের সম্পর্ক এক অলক্ষ্য সুতোর শিল্পিত টানে বাঁধা, যেখানে সত্যজিতের রবীন্দ্র-স্মরণ ঘটেছে স্বপ্নে-জাগরণে। উল্লেখ্য, মা সুপ্রভা দেবীর একান্ত পীড়াপীড়িতেই ১৯৪০ সালে সত্যজিৎ রায় সিদ্ধান্ত নেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-স্থাপিত শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার। তদুপরি শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি তিনি ছিলেন বিশেষ উদাসীন। যেন এক অলক্ষ্য শক্তির অমোঘ আকর্ষণ সেই দুঃসাধ্য-অনীহায় ইতি টানলো, মিলল দুই ভিন্ন স্রষ্টার যৌথ স্রোত –

তোমার সৃষ্টি, আমার সৃষ্টি, তার সৃষ্টির মাঝে
যত কিছু সুর, যা কিছু বেসুর বাজে।[৩]

ভাগ্যসত্যে মিলন হওয়ার কথা লেখা থাকলে তাকে খন্ডাবে কে! অতঃপর শান্তিনিকেতনী ভাবধারায় সত্যজিৎ শিখলেন প্রাচ্য নন্দনতত্ত্বের প্রতি নিবিড় আস্থাশীল হওয়ার মন্ত্র। নন্দলাল বসু, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় আর অবচেতনে রবীন্দ্রস্মরণ – সত্যজিৎ পেলেন ত্রিবেণী সঙ্গমের আস্বাদ। রবীন্দ্র-ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য অবলম্বনে তিনি নির্মাণ করলেন একের পর এক চলচ্চিত্র। রবীন্দ্রনাথের তিনটি ছোটগল্প, 'পোস্টমাস্টার' (১২৯৮), 'সমাপ্তি' (১৩০০), 'মনিহারা' (১৩০৫) অবলম্বনে সত্যজিতের নবনির্মাণ 'তিন কন্যা' (১৯৬১); 'নষ্টনীড়' (১৩০৮) অবলম্বনে 'চারুলতা' (১৯৬৪) বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক মাইলফলক নিদর্শনস্বরূপ। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাস অবলম্বনে সত্যজিৎ-এর 'ঘরে-বাইরে' (১৯৪৮) এক স্বতন্ত্র শিল্প-প্রকাশনার দাবি রাখে। মূল কাহিনির গ্রহণ-বর্জন-পরিমার্জনের সূত্রে রবীন্দ্রচেতনার ভিন্ন দৃষ্টিকোণ উন্মোচন ক'রে অগণিত রবীন্দ্রভক্ত-মণ্ডলে আনলেন নবজাগরণের স্বর্ণময় আলোকবর্তিকা। কেবল রবীন্দ্রনাথই নয়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ায়ের চিরন্তন শৈশবচেতনা, গ্রাম-বাংলার সহজ-সরল ছবি, প্রকৃতির অন্দরমহল, সাধারণ থেকে বিশেষ সত্যে যাত্রা, ব্যঞ্জনা মাধুর্য, প্রতীকচেতনার বৈচিত্র্য 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'র হাত ধরে 'অপুর সংসারের মধ্য দিয়ে তা বিশ্বমহীতলের আসন লাভ করেছে।

(৩)

সাহিত্য স্রষ্টা 'রূপেন সংস্থিতা' হিসেবে বাদ দিলেও চলচ্চিত্র নির্মাণে তাঁর সৃজনশীল মৌলিক প্রতিভার অবদান কম নয়। প্রায় চল্লিশ বছরের জীবনে ২৮টি পূর্ণাঙ্গ কাহিনিচিত্র, ৩টি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি এবং ৫টি তথ্যচিত্র অগণিত দর্শকের মন কেড়ে নিয়েছে। নিম্নে একটি সারণির মধ্যে তা প্রদর্শিত হল –

ক্রম	সময় কাল	চলচ্চিত্র নাম	আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মুক্তিকালীন নাম	ভাষা	চলচ্চিত্র-প্রকরণ	চিত্রনাট্য, সংগীত, পরিচালনা	কাহিনিকার	প্রযোজনা
১.	১৯৫৫	পথের পাঁচালী	A song of the Little Road	বাংলা	পূর্ণাঙ্গ কাহিনিচিত্র	সত্যজিৎ রায়	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	পশ্চিমবঙ্গ সরকার
২.	১৯৫৬	অপরাজিত	The Unvanquished	বাংলা	পূর্ণাঙ্গ কাহিনিচিত্র	সত্যজিৎ রায়	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	এপিক ফিল্মস
৩.	১৯৫৮	পরশপাথর	The Philosopher's Stone	বাংলা	পূর্ণাঙ্গ কাহিনিচিত্র	সত্যজিৎ রায়	পরশুরাম(রাজ শেখর বসু	প্রমোদকুমার লাহিড়ী

৪.	১৯৫৮	জলসাঘর	The Music Room	বাংলা	পূর্ণাঙ্গ কাহিনিচিত্র	সত্যজিৎ রায়	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	সত্যজিৎ রায় প্রোডাকসন
৫.	১৯৫৯	অপুর সংসার	The World of Apu	বাংলা	পূর্ণাঙ্গ কাহিনিচিত্র	সত্যজিৎ রায়	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	সত্যজিৎ রায় প্রোডাকসন
৬.	১৯৬০	দেবী	The Goddess	বাংলা	পূর্ণাঙ্গ কাহিনিচিত্র	সত্যজিৎ রায়	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	সত্যজিৎ রায় প্রোডাকসন
৭.	১৯৬১	তিন কন্যা(পোস্ট মাস্টার, মণিহারা, সমাপ্তি)	Three Daughters (The Postmaster, The Lost Jewels, The Conclusion)	বাংলা	পূর্ণাঙ্গ কাহিনিচিত্র	সত্যজিৎ রায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	সত্যজিৎ রায় প্রোডাকসন
৮.	১৯৬১	রবীন্দ্রনাথ	Rabindranath Tagore	ইংরেজি	তথ্যচিত্র	সত্যজিৎ রায়		ফিল্মস ডিভিসন : ভারত সরকার
৯.	১৯৬২	কাঞ্চনজঙ্ঘা	Kanchanjangha	বাংলা	পূর্ণাঙ্গ কাহিনিচিত্র	সত্যজিৎ রায়	সত্যজিৎ রায়	এন.সি.এ. প্রোডাকসন
১০.	১৯৬২	অভিযান		বাংলা	পূর্ণাঙ্গ কাহিনিচিত্র	সত্যজিৎ রায়	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	অভিযাত্রিক
১১.	১৯৬৩	মহানগর	The Big City	বাংলা	পূর্ণাঙ্গ কাহিনিচিত্র	সত্যজিৎ রায়	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	আর.ডি.বনশল
১২.	১৯৬৪	চারুলতা	The Lonely	বাংলা	পূর্ণাঙ্গ কাহিনিচিত্র	সত্যজিৎ রায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	আর.ডি.বনশল
১৩.	১৯৬৪	'টু'	Two	বাংলা	টি.ভি. উপযোগী স্বল্প দৈর্ঘ্যের চিত্র	সত্যজিৎ রায়	সত্যজিৎ রায়	এসো ওয়ার্ল্ড থিয়েটার
১৪.	১৯৬৫	কাপুরুষ ও মহাপুরুষ	The Coward & The Holy Man	বাংলা	পূর্ণাঙ্গ কাহিনিচিত্র	সত্যজিৎ রায়	প্রেমেন্দ্র মিত্র ও পরশুরাম	আর.ডি.বনশল
১৫.	১৯৬৬	নায়ক	The Hero	বাংলা	পূর্ণাঙ্গ কাহিনিচিত্র	সত্যজিৎ রায়	সত্যজিৎ রায়	আর.ডি.বনশল
১৬.	১৯৬৭	চিড়িয়াখানা	The Zoo	বাংলা	পূর্ণাঙ্গ কাহিনিচিত্র	সত্যজিৎ রায়	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	স্টার প্রোডাকসন

১৭.	১৯৬৯	গুপী গাইন বাঘা বাইন	The Adventures of Goopy and Bagha	বাংলা	পূর্ণাঙ্গ কাহিনিচিত্র	সত্যজিৎ রায়	উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	পূর্ণিমা পিক্চার্স
১৮.	১৯৭০	অরণ্যের দিনরাত্রি	Days and Nights in the Forest	বাংলা	পূর্ণাঙ্গ কাহিনিচিত্র	সত্যজিৎ রায়	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	প্রিয়া ফিল্মস
১৯.	১৯৭০	প্রতিদ্বন্দ্বী	The Adversary	বাংলা	পূর্ণাঙ্গ কাহিনিচিত্র	সত্যজিৎ রায়	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	প্রিয়া ফিল্মস
২০.	১৯৭১	সীমাবদ্ধ	A Company Limited	বাংলা	পূর্ণাঙ্গ কাহিনিচিত্র	সত্যজিৎ রায়	শংকর	চিত্রাঞ্জলি
২১.	১৯৭১	সিক্কিম	Sikkim	ইংরেজি	তথ্যচিত্র	সত্যজিৎ রায়		সিকিমের চোগিয়াল
২২.	১৯৭২	দি ইনার আই	The Inner Eye	বাংলা	তথ্যচিত্র	সত্যজিৎ রায়	বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের ‘শিল্পীজীবন’	ফিল্মস ডিভিসন : ভারত সরকার
২৩.	১৯৭৩	অশনি সংকেত	The Distant Thunder	বাংলা	পূর্ণাঙ্গ কাহিনিচিত্র	সত্যজিৎ রায়	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	বলাকা মুভিজ
২৪.	১৯৭৪	সোনার কেল্লা	The Fortress	বাংলা		সত্যজিৎ রায়	সত্যজিৎ রায়	পশ্চিমবঙ্গ সরকার
২৫.	১৯৭৫	জন অরণ্য	The Middleman	বাংলা	পূর্ণাঙ্গ কাহিনিচিত্র	সত্যজিৎ রায়	শংকর	ইনডাস ফিল্মস
২৬.	১৯৭৬	বালা	Bala	ইংরেজি	পূর্ণাঙ্গ কাহিনিচিত্র	সত্যজিৎ রায়		ন্যাশনাল সেন্টার ফর দি পারফর্মিং আর্টস : মুম্বাই ও তামিলনাড়ু সরকার
২৭.	১৯৭৭	শতরঞ্জ কে খিলাড়ী	The Chess Players	হিন্দি, উর্দু, ইংরেজি	পূর্ণাঙ্গ কাহিনিচিত্র	সত্যজিৎ রায়	প্রেমচন্দ	সুরেশ জিন্দাল
২৮.	১৯৭৯	জয় বাবা ফেলুনাথ	The Elephant God	বাংলা	পূর্ণাঙ্গ কাহিনিচিত্র	সত্যজিৎ রায়	সত্যজিৎ রায়	আর.ডি.বনশল

২৯.	১৯৮০	হীরক রাজার দেশে	The Kingdom of Diamonds	বাংলা	পূর্ণাঙ্গ কাহিনিচিত্র	সত্যজিৎ রায়	সত্যজিৎ রায়	পশ্চিমবঙ্গ সরকার
৩০.	১৯৮২	পিকুর ডায়েরি	Pikoo's Diary	বাংলা	টি.ভি	সত্যজিৎ রায়	সত্যজিৎ রায়	অ্যাঁরি ফ্রেস
৩১.	১৯৮২	সদগতি	The Deliverance	হিন্দি	টি.ভি	সত্যজিৎ রায়	মুনশি প্রেমচন্দ	দুরদর্শন : ভারত সরকার
৩২.	১৯৮৪	ঘরে-বাইরে	The Home and The World	বাংলা	তথ্যচিত্র	সত্যজিৎ রায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	এন.এফ.ডি.সি
৩৩.	১৯৮৭	সুকুমার রায়	Sukumar Roy	বাংলা	তথ্যচিত্র	সত্যজিৎ রায়		পশ্চিমবঙ্গ সরকার
৩৪.	১৯৮৯	গণশত্রু	An Enemy of the People	বাংলা	পূর্ণাঙ্গ কাহিনিচিত্র	সত্যজিৎ রায়	হেনরিক ইবসেন	এন.এফ.ডি.সি
৩৫.	১৯৯০	শাখা প্রশাখা	The Branches of the Tree	বাংলা	পূর্ণাঙ্গ কাহিনিচিত্র	সত্যজিৎ রায়	সত্যজিৎ রায়	জেরার দ্যপারদিয়ো ও দানিয়েল তস্কা দ্য প্লাতিয়োঁ
৩৬.	১৯৯১	আগন্তুক	The Stranger	বাংলা	পূর্ণাঙ্গ কাহিনিচিত্র	সত্যজিৎ রায়	সত্যজিৎ রায়	এন.এফ.ডি.সি

(৪)

১৯৫২ সালে বিলেত থেকে প্রত্যাবর্তনকালে জাহাজে বসেই 'পথের পাঁচালি'র চিত্রনাট্য লেখা হলে ওই বছরই ২৭শে অক্টোবর এক শরৎকালীন আবহে কাশফুল আর Close up-এ রেলগাড়ির দৃশ্য দিয়ে শুরু হয় 'পথের পাঁচালী'র শুটিং। আর শেষ হতে সময় লেগেছিল তিন বছর, অর্থাৎ ১৯৫৫ সালের ২৬শে আগস্ট। এ বছরই নিউইয়র্ক থেকে ছবিটি মুক্তি পায়। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসটি তিনটি খন্ড ও পঁয়ত্রিশটি পরিচ্ছেদে সুবিন্যাস্ত। প্রথম খণ্ড 'বল্লালী বালাই'-এ (পরিচ্ছেদ ১-৬) ইন্দির ঠাকরুণের বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে; দ্বিতীয় খণ্ড 'আম আঁটির ভেঁপু' (৭-২৯ পরিচ্ছেদ) অংশে অপু দুর্গার একসঙ্গে বেড়ে ওঠা, শৈশব চাঞ্চল্যের পাশাপাশি পরিবার জীবনে দুষ্টু-মিষ্টি খুনসুটি, দুর্গার মৃত্যু এবং নিশ্চিন্দিপুর ফেলে সোনাডিঙির মাঠ পেরিয়ে হরিহর-সর্বজয়া ভগ্নহৃদয়ের বিস্তৃতি ভুলে সপরিবারে কাশীযাত্রা বেশ প্রাঞ্জল হয়েছে। শেষ খণ্ডের নাম 'অক্রূর সংবাদ' (পরিচ্ছেদ ৩০-৩৫)। এই পর্বে অপুদের কাশীজীবন, হরিহরের মৃত্যু, রুটি-রুজি সংস্থানের জন্য সর্বজয়ার এবং সবশেষে নিশ্চিন্দিপুরে প্রত্যাবর্তনের কাহিনি ঔপন্যাসিকের নিটোল বুননে শিল্পমন্ডিত হয়ে উঠেছে। "সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত 'পথের পাঁচালী'র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'আম আঁটির ভেঁপু'ই যে 'পথের পাঁচালী'র চিত্রনাট্যের উৎস' সেকথা সত্যজিৎ রায় নিজের মুখেই স্বীকার করে গেছেন।[৪] বলা বাহুল্য অপুর জীবনকাহিনির প্রথম পর্বের প্রয়োজনীয় তালিকা তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা নেন সত্যজিৎ-এর বিজ্ঞাপন অফিসের সহকারী ম্যানেজার দিলীপ কুমার গুপ্ত, সংক্ষেপে

'ডি.কে'। স্থান-কাল-ঘটনা-পরিবেশ-পরিস্থিতি -- সব ব্যাপারেই বিশেষ আগ্রহী ছিলেন এই ফিল্ম পাগল মানুষটি। সমালোচক অসীম সোম বলেছেন,

> 'পথের পাঁচালী এক একটি চিত্রমুহূর্ত, এক-একটি ঘটনা চিত্রভাষাতেই মূর্ত। সংক্ষিপ্ত অথচ স্বাভাবিক সংলাপ, পরিবেশের শব্দ আর আবহসংগীত ছবিকে করেছে আরও গভীর ও মর্মস্পর্শী। দুর্গাকে ঘিরে সর্বজয়া ও ইন্দির ঠাকরুণের কথাবার্তা, অপুর প্রথম পাঠশালা যাওয়া, পাঠশালার অবস্থা, অপু-দুর্গার কাশবন পেরিয়ে ট্রেন দেখা, মৃত ইন্দিরকে অপু-দুর্গার আবিষ্কার, ঝড়ের রাতে দুর্গার মৃত্যু, হরিহরের বাড়ি ফিরে দুর্গার মৃত্যুসংবাদ জানা - এমন অসংখ্য দৃশ্যের সাহায্যে 'পথের পাঁচালি' হয়ে উঠেছে এক মহৎ শিল্পসৃষ্টি"।[৫]

দর্শক-মনস্তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যেতে পারে 'পথের পাঁচালী'ই 'চলচ্চিত্র নির্মাতা সত্যজিৎ রায়'-এর জন্ম দিল; বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে এক নতুন মাইলফলকের নাম সংযোজন করল। এর পর থেকেই সাহিত্য-চলচ্চিত্র-আর্টকে এক সীমারেখায় সচেতনভাবে মুক্তি দেওয়ার প্রয়াসে আবদ্ধ হলেন তিনি। ডি. কে. কীমার কোম্পানির বিজ্ঞাপন বিভাগে আর্ট ডিরেক্টরের চাকরি ছেড়ে কাঁধে চাপালেন আর-এক নতুন ঝোড়ো দায়িত্ব - তবে তা অনেকটা সচেতন প্রয়াসের সাবলীল পদচারণা। যে অপুকে তিনি খুঁজেছিলেন নিশ্চিন্দিপুরের পথে-প্রান্তরে, তাকেই আবার খোঁজার চেষ্টা চালালেন অপু-আখ্যানের দ্বিতীয় পর্ব 'অপরাজিত'-এ। সিনেমার প্রথমাংশের বিষয় অপুর বেনারস পর্ব এবং পরিণতি সর্বজয়ার মৃত্যুতে অপুর শহরমুখী বেদনাগাথা দিয়ে। হরিহর-সর্বজয়া-অপু ছাড়া বাকী সকল চরিত্র পাঠকের পরিচিতবৃত্তের বাইরে। তবে লীলা চরিত্রটিকে নিয়ে পরিচালক সত্যজিৎ অত্যন্ত চিন্তিত ও সংশয়ান্বিত ছিলেন। কারণ লীলার সক্রিয় উপস্থিতিতে চিত্রনাট্যের পরিধি প্রসারিত হচ্ছে, ছবির গতিময়তা যেন বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অপু-চিত্রের আকাশে বিচ্ছুরিত মেঘের প্রতিফলন দেখা দেবে। আবার পাঠকের পরিচিত বা প্রিয় লীলা চরিত্রের দৃশ্যহীনতাও সফল পরিচালকের এক গভীর চিন্তার কারণ হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে লীলাকে বাদ দিয়ে সামগ্রিক চিত্রনাট্যটিকে একনজরে দেখলে অপু চরিত্রের মহানময়তা কখনোই সীমায়িত পরিধিতে আটকে থাকেনি। তবে একটা ক্ষেত্রে দর্শকের হয়তো দুই ভিন্ন বয়সের ভিন্ন রূপের অপুকে মানতে সংশয় হতে পারে। কারণ বালক ও কৈশোরকালীনতা একজন অভিনেতার পক্ষে একটি চরিত্রের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব। সেক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের এক কৌশলগত ত্রুটি সহজেই ধরা পড়ে। তবে সাহিত্যে সেই ভাবধারায় কোনো চিড় ধরে না। কারণ পাঠক মানসকল্পনায় একটি অপুর বিবর্তনকে মেনে নেয় আপন-আত্মনিমগ্ন ভাবনায়। হয়তো অপু চরিত্রের চারিত্রিক বিবর্তন হয় এবং মানস বিবর্তন যেন সেই সহজ-সরল-শৈশবিক কুসুমে প্রস্ফুটিত। ছবি সম্পর্কে স্রষ্টা নিজেই স্বীকার করে নিয়েছেন –

> প্রথমার্ধে কাশীর দৃশ্যগত বৈচিত্র্য ও তার ব্যবহার ছবিতে যে আকর্ষণ আরোপ করেছে, দ্বিতীয়ার্ধে তার অভাব সত্ত্বেও যেখানে ছবি অনেকাংশে সার্থক সেটা হল অপু-সর্বজয়া সম্পর্কের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, ও কেবলমাত্র চিত্রভাষার সাহায্যে নিঃসঙ্গ সর্বজয়ার ট্র্যাজেডির উপস্থাপনা।[৬]

উপন্যাস ও চলচ্চিত্রের মধ্যে আপাত নৈকট্য থাকলেও অন্তরালে বিভেদ কিন্তু সুপ্রচুর। এক অজ-পাড়াগাঁয়ের চালচিত্রকে পাঠকের দরবার থেকে দর্শকের মানসচৈতন্যে আনতে অনেকটাই কসরত দিতে হয় পরিচালক-প্রযোজককে। সংযোজন-বিয়োজন-পরিমার্জন-নবতর অনুষঙ্গের পরিকল্পনায় সেই গুপ্ত শিল্পসম্পদ বা এক রীতির শিল্পকলা অন্য রীতির পরিমার্জনায় স্বতন্ত্র ও সফলতার আস্বাদ পায়। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের যে সরল জীবন-বাস্তবতা, কাশবনের সারি, পুকুর-জলের নিস্তরঙ্গ স্বভাবধর্ম, প্রাকৃতিক দুর্যোগের রাত, দারিদ্র্যের নিঃশব্দ হাহাকার, কথকতাবৃত্তির অকুণ্ঠ আবেগ চলচ্চিত্রের হাত ধরে ভিন্ন-স্রোতধারায় পরিমার্জিত। রবিশংকরের সেতারের শব্দ আর পুকুরের জলের উপর অনাম্নী পোকার অস্থির চাঞ্চল্যভাবনা -- এক লহমায় দর্শকের মনকে আকৃষ্ট করে। চরিত্রের বিশেষ আবেগ-অনুভূতি, যেমন রাগ-দুঃখ-হাসি-আনন্দ-বেদনা-যন্ত্রণার attention নিয়ে নেয় এমন আবহসংগীত ও অবলা প্রাণের নিরাভরণ স্বভাব চাঞ্চল্য। আবার হরিহর সামান্য আয়ের সংস্থানের খবর পেয়ে সেই চিঠি পড়া ও সর্বজয়া মুখ আলোকিত-হাস্যকিরণে উজ্জ্বল হয়ে

যাওয়া, পরম আনন্দে দুর্গার বৃষ্টিতে ভেজা -- এক পারম্পর্য সূত্রে বিন্যস্ত। কিন্তু অচিরেই নেমে আসে বেদনা, একই সঙ্গে দুর্গার অসুস্থতা, ভয়ঙ্কর দুর্যোগের রাত ও পার্থিব জীবনসত্য ত্যাগ ক'রে অপুর পরিবারকে কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে যায় দুর্গা। একদিন যে স্নেহ-মায়া-মমতা ঘিরে ছিল হরিহর-সর্বজয়ার সংসার জুড়ে, সখ্যসুলভ অভিভাবকীয় লালিত্য হারালো অপু -- সেকথা উপন্যাসের পাঠক মনে গেঁথে রাখলেও দর্শক দেখল "তথাকথিত ঘাত-প্রতিঘাত সংবলিত প্লটের অভাবে ঘটনার এই ওঠাপড়ার সাহায্যে সচেতনভাবে ছবিতে একটা ছন্দ আরোপ করা"র চালচিত্র"।[৭]

এক শান্ত নিস্তরঙ্গ পল্লীজীবনের সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্নার ঝুলনলীলা – 'পথের পাঁচালী'র গুরুত্বকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করেছিল -- কথাসাহিত্যের শিল্পবোধে এ দাবি অসমর্থিত নয়। তবে ছায়াছবির চলমানতায় সেই শিল্পের রূপবদল ঘটে, স্থবিরতা জঙ্গমত্বপ্রাপ্ত হয়। সেখানে নিস্তরঙ্গ জীবনে আনা হয় ঘটনার বাহুল্য, চরিত্রের উত্থান-পতন, আবহসঙ্গীতে প্রতীকী অনুষঙ্গের ব্যবহার – এ সবই দর্শক-অনুভবে আলোড়ন তোলে। হীরা-পান্নার মতোই জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না চলচ্চিত্রের সেই জগতে হাত ধরাধরি ক'রে বসবাস করে। সত্যজিৎ রায় নিজেই বলেছেন এমন এক বিশেষত্বের কথা, "পুজোর দৃশ্য আর গ্রামের যাত্রা মিলে যে আনন্দের পরিচ্ছেদ, তার-পরেই অপু-দুর্গার আড়ি, তার পরেই প্রথম ট্রেন দেখার উল্লাস, আবার তার পরেই ইন্দিরের মৃত্যু, ইন্দিরের শবযাত্রা, হরিহর-সর্বজয়া-অপু-দুর্গার শোক"।[৮] এভাবে বেশকিছু ঘটনা উপন্যাসের সঙ্গে চলচ্চিত্রের পার্থক্যকে সুদৃশ্যময় করেছে। বিভূতিভূষণ তাঁর উপন্যাসে দুর্গার হাত দিয়ে তার গ্রাম্য-জীবনের সরল সাবলীলতাকে তুলে ধরেছেন চুরি করার মতো স্বাভাবিক ঘটনার মধ্য দিয়ে। দুর্গার হাত দিয়ে দুটি চুরির অনুষঙ্গ আমরা দেখতে পাই - একটি পুঁতির মালা আর অন্যটি কারুকার্য করা সোনার কৌটো। পুঁতির মালাটি চুরি যাওয়ার অল্পক্ষণের মধ্যে পাওয়া গেলেও অপু সোনার কৌটোটির সন্ধান পায় সপরিবারে নিশ্চিন্দিপুর ছাড়ার আগের দিনে। কিন্তু ছবির স্বার্থে পরিচালক সোনার কৌটোর প্রসঙ্গকে বাদ দিয়ে কেবল পুঁতির মালা চুরির ঘটনাকেই ব্যঞ্জনাধর্মীতার সঙ্গে দৃশ্যায়িত করেছেন। ঘরের দরজার মাথায় একটা তাকের উপর অপু কিছু জিনিস খোঁজার উদ্দেশ্য নিয়ে তাক হাতড়ায় এবং একটি নারকেলের মালা মেঝের ওপর পড়লে তার ভেতর থেকে একটি মাকড়শাকে বের হতে দেখা, যায় সঙ্গেই রাখা ছিল দুর্গার চুরি করা সেই পুঁতির হার। এর মধ্য দিয়ে স্রষ্টা বোঝাতে চেয়েছেন অপ্রাপনীয় বিষয়ের উপর দুর্গার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা-বাসনা, যেন কঠিন শৃংখলে জর্জরিত হয়ে থেকেছে দুর্গার জীবনে অপ্রাপ্তির দুর্দমনীয় পছন্দ। তার আগামীর পথদর্শী অপুর হাতেই তার পার্থিব বন্ধনমুক্তি ঘটেছে। অপুর আগত ভবিষ্যতকে মুক্তি দেওয়ার লক্ষ্যে দুর্গার যে জাগতিক বন্ধন অপু-বৃত্তকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিল – সেই ঘটনাই যেন মূর্তিত হয়েছে এভাবে।

'পথের পাঁচালী'র চরিত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল হরিহর-সর্বজয়া এবং তাদের কন্যা দুর্গা ও পুত্র অপু। এছাড়াও এক বিশেষ চরিত্র সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্রের উত্তরণের ক্ষেত্রে মাইলফলক হয়ে দাঁড়ায়, – সাহিত্যের শ্রীক্ষেত্রে যাঁর নাম 'ইন্দির ঠাকরুণ', বাস্তব জীবনে তিনিই চুনীবালা দেবী, নিবাস পাইকপাড়া, কলকাতা। উল্লেখ্য পরিচালক স্বয়ং স্বীকারোক্তিতে জানিয়েছেন, "এঁর সন্ধান না পেলে আমাদের পথের পাঁচালী হত না"।[৯] ইন্দির ঠাকরুণ হরিহরের মামার বাড়ির দূর-সম্পর্কের বোন। বিভূতিভূষণ সত্যজিতের ছবির চরিত্র নির্মাণের রসদ রেখে গেলেন 'পথের পাঁচালী'তে,

> পূর্বদেশীয় এক নামজাদা কুলীনের সঙ্গে ইন্দির ঠাক্‌রুণের বিবাহ হইয়াছিল। স্বামী বিবাহের পর কালেভদ্রে এ গ্রামে পদার্পণ করিতেন। এক-আধ রাত্রি কাটাইয়া পথের খরচ ও কৌলিন্য-সম্মান আদায় করিয়া লইয়া, খাতায় দাগ আঁকিয়া পরবর্তী নম্বরের শ্বশুরবাড়ি অভিমুখে তল্‌পী-বাহক সহ রওনা হইতেন, কাজেই স্বামীকে ইন্দির ঠাক্‌রুণ ভালো মনে করিতেই পারে না। ... তাহার পর অনেকদিন হইয়া গিয়াছে শাঁখারীপুকুরে নাল ফুলের বংশের পর বংশ কত আসিয়াছে, চলিয়া গিয়াছে।
>
> ... শুধু ইন্দির ঠাকরুণ এখনও বাঁচিয়া আছে। ১২৪০ সালের সে ছিপছিপে চেহারার হাস্যময়ী তরুণী নহে, পঁচাত্তর বৎসরের বৃদ্ধা, গাল তোব্‌ড়াইয়া গিয়াছে, মাজা ঈষৎ ভাঙিয়া শরীর সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, দূরের জিনিস আগের মতো চোখে ঠাওর হয় না, হাত তুলিয়া যেন রৌদ্রের ঝাঁজ হইতে বাঁচাইবার ভঙ্গিতে চোখ ঢাকিয়া বলে, কে আসে? নবীন? নবীন? না, ও তুমি রাজু ...।[১০]

একেবারে বয়স্ক মানুষকে চলচ্চিত্রের চৌহদ্দিতে আনার নানান সমস্যা আছে। একদিকে বার্ধক্যের ভারে ন্যুব্জ হলে তার শারীরিক অচলাবস্থা যেমন পরিচালক সহ ছবির সহযোগীদের সমস্যার কারণ হয়, তেমনি সময়াভাবে ঔষধপত্রের ঘাটতি বা খাবারের অনিয়মে যে শারীরিক সমস্যা প্রকট হবে তাতে ছবির নির্মাতাদের ক্ষেত্রে যে প্রভূত সমস্যার তৈরি হবে -- সে কথা বলাই বাহুল্য। বিশেষত বিভূতিভূষণের বর্ণনার আতিশয্যে চরিত্র নির্মাণ প্রায় অসম্ভব। কারণ একদিকে এই ছবির জন্য কোনোরকম মেক-আপ করা হবে না (বিজ্ঞাপন মর্ম অনুযায়ী), অপরদিকে পঁচাত্তর বছর বয়সী অতিবৃদ্ধার পক্ষে চলচ্চিত্রের আউটডোরের পরিশ্রম সহ্য হবে কিনা -- তা নিয়ে সকলের মনেই প্রবল সংশয়। সত্যজিৎ রায় সে কথা স্বীকার করে নিয়েছেন আপন গরজেই,

> জরার প্রকোপে মস্তিষ্কের অল্পবিস্তর বিকার ঘটে থাকে। ইন্দিরের স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করা চলবে ত? অর্থাৎ তিনি সংলাপ মুখস্থ করে ক্যামেরার সামনে বলতে পারবেন ত? বার্ধক্য, অভিনয় দক্ষতা, শারীরিক কষ্ট সহিষ্ণুতা ও সুস্থ মস্তিষ্ক -- একাধারে এই চারের সমন্বয় আদৌ সম্ভব কিনা ...”।[১১]

তাই বঙ্গে হয়তো মণিকাঞ্চন যোগের মতোই সত্যজিতের ইচ্ছা বা চাহিদাকে অপরিতৃপ্ত হতে দেননি চুনিবালা দেবী ওরফে ইন্দির ঠাকরুণ। একদিকে হরিহর-সর্বজয়া-দুর্গা ও অপু চরিত্রের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বাছাইপর্ব স্থির হয়ে গেছে; অন্যদিকে প্রসন্ন-সেজোঠাকরুণ-নীলমণির স্ত্রী চরিত্রের রূপকাররাও একপ্রকার স্থিরিকৃত, কিন্তু ইন্দির ঠাকরুণের মতো ‘গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র’ ছাড়া ছবিটাকেই পরিপূর্ণ ও সফলভাবে রূপ দেওয়া সম্ভব না। ‘গুরুত্বপূর্ণ’ এই অর্থে যে অপু-দুর্গার শৈশবিক বিকাশে, জীবনচরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে ইন্দির ঠাকরুণকে বাদ দেওয়া যায় না – না হলে উপন্যাসের ‘আম আঁটির ভেঁপু’ যেমন তৈরি হত না, বাদ পড়ত প্রভূত বিশেষ বিশেষ কালক্ষেপ, তেমনি চলচ্চিত্রের পরিপূর্ণতায়ও হানি ঘটত। ইন্দির ঠাকরুণের প্রখর স্মরণশক্তি; ছড়া উচ্চারণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশভঙ্গিমা, প্রাণখোলা মনের মানুষ; ছা-পোষা, দরিদ্রপোষিত, সাংসারিক জীবনে উদাসীন, নিরাভরণ, সার্বিক দাবিহীন, রসিকপ্রিয়া, এমনকি বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়েও ভালো রকম ভাবেই সঙ্গীতপ্রিয়। উপন্যাসে তাঁর প্রকাশভঙ্গিমায় স্বাভাবিক আচরণ থাকলেও গানের কোনরকম উল্লেখ নেই। সত্যজিৎ রায় সেখানে সংযোজন করেন গানের --

মন আমার হরি বল হরি বল।
হরি হরি হরি বলে
ভবসিন্ধু পার চল।

ইন্দিরের অজ্ঞাতেই গানটি সংগ্রহ ক’রে রাখেন পরিচালক। এর পরের সময় থেকেই অর্থাভাব সহ বেশ কিছু কারণে ছবির শুটিং বন্ধ হয়ে যায়। এ বিষয়ে উল্লেখ্য যে, ১৯৫২-এর শেষদিকে নিজের গচ্ছিত অর্থব্যয়ে ছবির শুটিং শুরু করেন। প্রথম দিকে তিনি মনে করেন ছবির প্রাথমিক কাজকর্ম দেখে কোনো প্রযোজক হয়তো অর্থলগ্নি করতে তৎপর হবেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁকে নিরাশ হতে হয়। পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সহায়তায় বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি অতিক্রম ক’রে দীর্ঘ সময় যাবৎ পরে ছবির কাজ শুরু হয়। এই ছবি বন্ধের প্রায় বছর-খানেক পর ভাদ্রের এক জ্যোৎস্নালোকিত রাতে পশ্চিম দিকে পা ছড়িয়ে তালি বাজিয়ে গানটি গাইছেন, চারদিকে ঝিঁ-ঝিঁ পোকা ও ভেকের ডাক। আর ক্যামেরা ইন্দিরের সেই মুহূর্তটিকে ফোকাস করছে।[১২]

বয়োঃবৃদ্ধ ইন্দির, সকল দর্শকের মধ্যে একটা অজানা আশঙ্কা থাকাটাও খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। এত বয়সেও কিভাবে সম্ভব হচ্ছে শুটিংয়ের কাজকর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করার। এ বিষয়টার প্রতিও পরিচালক নিষ্ঠাপরায়ণ। বিভূতিভূষণের ইন্দিরের মৃত্যু ঘটেছে চণ্ডীমণ্ডপে। কিন্তু বিশেষ কার্যকারণসূত্রে চিত্রনাট্যে সেই রূপের বদল করতে হয়েছে পরিচালককে। ইন্দির ঠাকরুণের অন্তিম পরিণতির স্থান নিল পল্লীজীবনের শান্ত-নিস্তরঙ্গ বাঁশবন। এ বিষয় নিয়ে ধর্মপরায়ণা ইন্দিরের সঙ্গে সত্যজিতের এক তার্কিক বচসার উপক্রম হয়। পরন্তু যুক্তি-প্রদর্শনে ‘মানিক’ সত্যজিৎ বোঝান বুড়ির বাঁশবাগানে মৃত্যু অপু-দুর্গার শৈশবজীবনে এক বাঁক ফেরানোর পরিকল্পনা-সূত্রেই নির্মিত এবং দর্শকমনেও বিশেষ প্রতিক্রিয়ার বার্তাবাহী। দুই ভিন্ন ভাবধারার মানুষের মতাদর্শগত বিরোধ -- অবশ্যই ছবির নির্মাণ সমস্যার কারণ। তাকে

এক সুঁতোয় মেলানোর সফল পরিকল্পনাতেই চলচ্চিত্রধর্মের সার্থকতা -- এক্ষেত্রে তার ব্যত্যয় ঘটেনি। আপন মননধর্মীতা ও পরিস্থিতির অভিযোজনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মানসিকতাতেই সত্যজিতের অনন্যধর্মীতা। ইন্দিরের শবযাত্রার চিত্রদৃশ্যটিও বিশেষ মাত্রা লাভ করেছে। এ দিক থেকে সত্যজিৎ এক ভিন্ন স্বাদ ও স্বতন্ত্রতার দাবিদার।

(৫)

'পথের পাঁচালী' ছবির যেখানে সমাপ্তি, 'অপরাজিত' ছবিতে উঠে এসেছে তার পরবর্তী ক্রমানুসারী ঘটনা। উল্লেখ্য, 'অপরাজিত'র নিরলস শ্রমসাফল্য সত্যজিৎকে আন্তর্জাতিক মহলে পরিচিত ক'রে তুলল। ভেনিস থেকেও সম্মানিত হলেন 'গোল্ডেন লায়ন' পুরস্কারে। 'অপুর সংসার' যেন এক স্বতন্ত্র জীবনদর্শনের বাগানবাড়ি। সেখানে অপু তার বন্ধু পুলুকে এমন এক উপন্যাসের কথা শোনাচ্ছে, যেটা জীবনধর্মী দর্শানুভূতিতে ঘেরা। কাহিনিটি এরকম -- নিদারুণ দরিদ্র পরিবারের একটি ছেলে, যে আদাবধি জীবনসংগ্রামে উদ্বুদ্ধ। আবেগ থাকলেও বাস্তবোচিত। খুব অল্প বয়সে বাবা-মায়ের স্নেহচ্ছিন্ন হয়েছে। যেন এক নিরস্ত্র যোদ্ধা -- নিজের সকল বুদ্ধি, শক্তি, আবেগ, অনুভূতি, বিশ্বাসের তাগিদে এগিয়ে চলেছে জীবনের পথ বেয়ে। পৌরোহিত্যের সংকীর্ণ পথে নয়, চূড়ান্তভাবে কেরিয়ারিস্ট। প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ নিয়ে সে পরম উচ্ছ্বাসে বন্ধুকে শোনাচ্ছে সেই তেজীয়ান জীবনসংগ্রামী যুবকের গল্প। ফিল্মের একটি দৃশ্য – 'কিন্তু সেটিই শেষ কথা নয়, সেটি ট্র্যাজেডিও নয়। সে মহৎ কিছু করছে না, তার দারিদ্র যাচ্ছে না, তার অভাব মিটছে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে জীবনবিমুখ হচ্ছে না। সে পালাচ্ছে না, escape করছে না। সে বাঁচতে চাইছে। সে বলছে, বাঁচার মধ্যেই সার্থকতা, তার মধ্যেই আনন্দ, he wants to live!

'অপরাজিত'র প্রায় তিন বছর পর 'অপুর সংসার'-এর নির্মাণ। বিষয় অপুর দারিদ্র্যের বেকার জীবনের বৈচিত্র্য। কাহিনির দ্বিতীয় অংশে অপু-অপর্ণার দাম্পত্য জীবন যেভাবে নস্টাল্‌জিক ক'রে তুলেছিল, তেমনি অপর্ণার মৃত্যু অপুর জীবনে এনেছে সংসার-বৈরাগ্য জীবনদর্শন। অবশেষে অপু-কাজলের সম্পর্কের মসৃণতায় কাহিনির শেষ। "আপাতদৃষ্টিতে যা সরল, অনাড়ম্বর - তার অন্তর্লীন চরিত্রে কত দ্যোতনা থাকতে পারে, এ ছবির বহু সিকোয়েন্সে তার নিদর্শন স্পষ্ট। ফুলশয্যার রাত থেকে ট্রেনে অপর্ণাকে বিদায় দেবার দৃশ্যের মধ্যে দরিদ্র অথচ মধুর সাংসারিক জীবনের যে রসঘন রূপ সত্যজিৎ উপস্থিত করেছেন, তা স্মরণীয় হয়ে আছে। অপর্ণার একটি চিঠি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় পড়ার শেষে এক আনন্দঘন মুহূর্তে চরম শোক-সংবাদের আঘাতে যে প্রচণ্ডতা -- তার দুর্লভ অভিব্যক্তি অপুর নিষ্ঠুরতায়, আত্মনিগ্রহে ও আত্মহত্যার প্রয়াসে"।[১৩]

(৬)

'অপুর সংসার' আত্মপ্রকাশের (১৯৫৯) পর ১লা জ্যৈষ্ঠের *দেশ* পত্রিকায় সমালোচক চন্দ্রশেখরের নিন্দাবর্ষণ যতই কর্কশ হোক না কেন -- মনের গহীনে সত্যজিতের দুর্নিবার উপস্থিতিকে তিনি কখনোই অস্বীকার করতে পারেননি। সপ্রশংসায় তিনি বলেছেন, 'ভাবে, রসে ও আঙ্গিকে বাংলা চলচ্চিত্রের একটি অক্ষয় সম্পদ হয়ে থাকবে'। তবে এই ছবি সম্পর্কে তিনি যে নিন্দুকের সমালোচনা করেছেন -- তাতে তাঁকে পরিপূর্ণ মনস্বীর সমালোচক হিসেবে গ্রহণ করা যায় কিনা – সে বিষয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' বা 'অপরাজিত'র কাহিনিপটকে ভাবে-রূপে-রসে জারিত ক'রে বিচিত্র মাত্রায় সংযোজন-বিয়োজন-পরিমার্জনের মাধ্যমে চলচ্চিত্রের স্বতন্ত্র ভাষায় এক ধ্রুপদী শিল্পের জন্ম দিয়েছেন সত্যজিৎ; সবিশেষ উল্লেখ্য, ভেনিসেও এ ছবিগুলি সম্পর্কে অবলীলায় স্তুতিসূচক বহুল প্রশংসা অর্জন করেছেন তিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চন্দ্রশেখরের কটূক্তি (বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' বা 'অপরাজিত' কোনোটাই ভালোভাবে আত্মস্থ না ক'রে 'অপুর সংসার' নির্মাণে ব্রতী হন) সত্যজিতের পরবর্তী জীবনকালে সাফল্যের বুমেরাং হয়ে ফিরল। কঠোর ভাষার এই কঠিন সমালোচনা থেকেই তিনি চলচ্চিত্র জগতকে উপহার দিলেন একের পর এক বিস্ময়কর সৃষ্টিকর্ম। আসলে ঔপন্যাসিক ও

পরিচালকের সৃজনমানস এক নয়। এ বিষয়ে সত্যজিৎ-এর মানসপিতা রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতিই দুই চেতনার সমন্বয়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত –

> প্রাকৃত সত্যে এবং সাহিত্যসত্যে এইখানেই তফাত আরম্ভ হয়। সাহিত্যের মা যেমন করিয়া কাঁদে প্রাকৃত মা তেমন করিয়া কাঁদে না। তাই বলিয়া সাহিত্যের মা'র কান্না মিথ্যা নহে। প্রথমত, প্রাকৃত রোদন এমন প্রত্যক্ষ যে তাহার বেদনা আকারে-ইঙ্গিতে, কণ্ঠস্বরে চারি দিকের দৃশ্যে এবং শোকঘটনার নিশ্চয় প্রমাণে আমাদের প্রতীতি ও সমবেদনা উদ্রেক করিয়া দিতে বিলম্ব করে না। দ্বিতীয়ত, প্রাকৃত মা আপনার শোক সম্পূর্ণ ব্যক্ত করিতে পারে না, সে ক্ষমতা তাহার নাই, সে অবস্থাও তাহার নয়"।[১৪]

এখানে বিভূতি-সাহিত্যকে যদি 'সাহিত্যের মা' রূপে প্রণাম জানাই সেক্ষেত্রে 'বাস্তবের মা'য়ের আত্মপ্রতিষ্ঠার আকুল আকুতিতে মিশে থাকে বিচিত্র ঘটনার সংশ্লেষ। লেখক তাই লৈখিক রীতির আশ্রয়ে যে কল্পনার অন্বেষণ করেন, তাকেই ভিন্ন সুর-রীতি-লয়ের আশ্রয়ে চলচ্চিত্রকার নবরূপায়ন ঘটান তাঁর গতিশীল শিল্পরীতির মাধ্যমে। রচনাশৈলীতে লেখক একটা নির্দিষ্ট সীমানা পর্যন্ত তাঁর কল্পনাকে প্রকাশ করলেও পরিচালকের অভিব্যক্তি সীমাহীন, সেখানে মিশে থাকে উপস্থাপনের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি ও নিজস্ব কল্পনাশক্তি, আর তাকেই বিভিন্ন প্রতীকী বৈচিত্র্যের প্রদর্শনের অনুষঙ্গে এক নির্মীয়মান রূপ দেন স্বাভাবিক জীবনছন্দে। বিভূতিভূষণের অপু চরিত্রের মধ্যে বৈচিত্র্যের বিন্যাস ও অনুভূতিপ্রবণ সত্তার ভিন্ন চালচিত্র ধরা পড়ে, অর্থাৎ আর সকল সাধারণ মানবিকতার সঙ্গে অপুকে সরলরৈখিক রেখায় মেলানো যায় না। অপু সুখ-দুঃখে অল্পেই মৃয়মাণ বা উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। বলা যেতে পারে তার অনুভূতিগুলি খুবই স্পর্শকাতর, খুব সহজেই মনকে দোলায়িত করে। উপন্যাসে দেখা যায় স্ত্রী অপর্ণার মৃত্যুর পর অপু বিরহ যন্ত্রণায় বহুদিন পর্যন্ত 'একলা থাকার অভ্যাসে' নিজেকে সংসার-বিমুখ করে রেখেছিল। হয়তো অপুর অবচেতনে সর্বদা ক্রিয়াশীল থেকেছে কাজলের জন্মলগ্নই তার অপর্ণা-বিচ্ছেদের অন্যতম কারণ। অপুর মনের মধ্যেকার পুঞ্জিভূত ক্ষোভ-বেদনাতুর অভিমান পিতা-পুত্রের সহজ সম্পর্কের প্রধান অন্তরায়। অপর্ণা অপুর জীবনে এমন এক মাইলফলক যার উপস্থিতির পূর্বে অপু তারুণ্যে উজ্জীবিত, প্রাণশক্তিতে ভরপুর, কল্পনাপ্রবণ, আনন্দপিয়াসী – এককথায় ইতিবাচক ভাবনায় আত্মপ্রসারী। আর অন্যদিকে অপর্ণাকে হারানোর পর অপুর বিশ্বসংসার একমুহূর্তে নিরুদ্যম, প্রাণহীন, বিরহকাতর, নিরানন্দময়। তাই কাজলের প্রতি তার পিতৃহৃদয়ের মাতৃব্যাকুলতা কখনোই সদাসক্রিয় হয়নি। কখনো মানি-অর্ডার ক'রে শ্বশুর বাড়িতে টাকা পাঠানোই হোক কিংবা প্রথম দর্শন -- সবসময়ই সে নিষ্প্রভ থেকে গেছে।

(৭)

সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের প্রকরণ ও নির্মাণগতভাবে প্রভেদ আছেই। সকল প্রথম শ্রেণির সাহিত্যই যে চলচ্চিত্রায়নের রূপ পাবে - তা নয়। একটা বিষয়ে সর্বদাই খেয়াল রাখতে হবে যে পরিচালক কত নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে চিত্রকল্পের গ্রহণ-নির্মাণ-সংশোধন-পরিমার্জন শিল্প-সচেতনতার প্রতি বিশেষ দৃকপাত ক'রে দর্শকের মনোরঞ্জনের সামগ্রী করতে পারেন। সাহিত্যের বর্ণনা যখন সংলাপধর্মী চিত্রনাট্যের স্বরূপ বা আদলের রূপ পায়, তখন সাহিত্যের চরিত্রও দৃশ্যদর্শনে নাটকীয় রূপ পায়। আসলে সাহিত্যের ভাষা বা সুর যে ছন্দে মানুষের মনকে সীমায়িত চেতনায় গাঁথতে পারে, চলচ্চিত্রের ভাষায় বেশকিছু ভাব-ভঙ্গিমা বা ব্যঞ্জনাধর্মীতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ না হ'লে -- তা শিল্পসৌকর্যের দাবিদার হতে পারে না। এক সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ রায় বলেছেন, "অনেক সময় যে অনুভূতির প্রকাশে সাহিত্যকে অনেক কথা বলতে হয়েছে, চলচ্চিত্র তা প্রকাশ করেছে মাত্র একটি ভাবগভীর দৃশ্যপ্রতীকে। উদাহরণ হিসেবে 'অপুর সংসার'-এর একটা দৃশ্যের এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। পল্লীগ্রামের বর্ধিষ্ণু পরিবারের মেয়ে অপর্ণা হঠাৎ নিঃস্ব অপুর ঘরণী হয়ে এলো। স্বভাবতই অপুর চালচুলোহীন বাসস্থানের দৃশ্য তাকে বেশ বিমর্ষ করে তোলে। অপুর অনুপস্থিতিতে তার চোখে দু-চার ফোঁটা জলও পড়ে। কিন্তু তার পরেই দেখানো হয়েছে স্বামী-স্ত্রী একই বিছানায়। অপর্ণা সকালে বিছানা থেকে উঠতে গিয়ে দেখে অপু দুষ্টুমি করে তার আঁচলটা নিজের ধুতির সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। একটু হেসে ঘুমন্ত অপুকে ছোট্ট একটা চড় কষিয়ে অপর্ণা আঁচলের

গেরো খুলে বেরিয়ে যায়। এই স্বল্পকালস্থায়ী দৃশ্যটিতে সাহিত্যে বর্ণিত অপু-অপর্ণার ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতার স্বরূপটুকু ব্যঞ্জনার ভিত্তিতে ধরা পড়েছে বলে অনেক দর্শক স্বীকার করেছেন। এখানে চলচ্চিত্র বিভূতিভূষণের কাহিনীর আক্ষরিক অনুসরণ না করেও তার নিজস্ব ইডিয়মে সাহিত্যের আভ্যন্তরীণ বক্তব্যটুকু রূপায়িত করেছে"।[১৫] তাই চলচ্চিত্রকারকে সাহিত্য ও সিনেমা - দুই দিকেই নিবিড় ধ্যানে মগ্ন থাকতে হবে। সাহিত্যের 'অবলম্বনে', 'অনুসরণে', 'অনুকরণে' আখ্যায় পরিচালকের শিল্পচর্চার প্রয়োজনে ব্যক্তিমত প্রকাশে যে স্বাধীনতাটুকু থাকে, কাহিনির গ্রহণ-বর্জন-পরিমার্জনে যে বিশেষ দৃষ্টিকোণের প্রতি আলোকপাত ক'রে এক শিল্পের নবনির্মিত শিল্পরূপের প্রকাশ ঘটান -- তার খোঁজ বক্সঅফিস না রাখলেও স্রষ্টা-শিল্পী-কুশীলবেরা তার খোঁজ যথেষ্টই রাখেন। কারণ সকলের জানা যে একসময় অর্থের অভাবে 'পথের পাঁচালী' শুটিং বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন সত্যজিৎ, নিজের স্ত্রী বিজয়া রায়ের গয়নার বাক্স হাতে প্রযোজকদের দরজায় দরজায় ঘুরতে হয়েছিল সিনেমা নির্মাণের প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য -- আর আশ্চর্যজনক ভাবেই সত্য যে এই 'পথের পাঁচালী'র হাত ধরেই বাঙালিকে চিরন্তনী আনন্দের স্মরণসভায় তিনি স্থাপন করলেন 'অস্কার পুরস্কার' প্রাপ্তির মাধ্যমে; আর পাশাপাশি বঙ্গমানসের মধ্যমণি হয়ে সত্যজিৎ রায় উজ্জ্বল হয়ে থাকলেন অনাগত বিশ্ববাসীর কাছে।

(৮)

সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্রের নির্মাণ হলেও চলচ্চিত্র পরিচালককে গুরুদায়িত্ব নিতে হয় পারস্পরিক সম্পর্কিত দুই জগতের কাছে – একটি তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্র, আর অন্যটি সাহিত্য। দার্শনিক ভাবনায় সাহিত্যের মূল কাহিনির ঘটনাবিন্যাস, চরিত্র, প্রতিবেশ-পরিস্থিতিকে চিরন্তন সত্যসিদ্ধে গ্রন্থিত ক'রে পরিচালক চরিত্রচিত্রণ ও সংলাপস্থাপনে বিশেষ দৃষ্টিকোণের উপর আক্ষিপ্ত হন এবং প্রসঙ্গানুসারে বিভিন্ন বিষয়ের পরিবর্তন করেন। সেখানে ঘটনা বিশদে বর্ণিত না হলেও বিশেষ অনুষঙ্গকে কেন্দ্রে রেখে পরিচালক তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাবেই ব্যঞ্জিত সত্য ও দার্শনিক ব্যপ্তিকে তুলে ধরেন। সুতরাং শিল্পী তাঁর সীমায়িত পরিসরে সাহিত্যের অবলম্বন করলেও শিল্প নির্মাণে আপন রুচিবোধে এক পরিমিতিবোধ নিয়ে শিল্প-নান্দনিকতার কাজে হাত দেন। স্বভাবতই চলচ্চিত্র-নির্মাতার শিল্পপ্রয়াস সাহিত্যিকের অভিরুচির থেকে কোনো অংশে কম নয়। সাহিত্য-নিরপেক্ষ চলচ্চিত্রে তাই পরিচালক অনেকটা স্বাধীন, স্বতঃস্ফূর্ত এবং সর্বোপরি চলচ্চিত্র-মাধ্যমের দৃশ্যধর্মী ভাষাকে তিনি অনেক বেশি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সীমায়িত করতে পারেন।[১৬]

মানবসভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই মানবজীবন ও সমাজ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমন সাহিত্য-শিল্পকলার অঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তেমনি সেই বিষয়গুলিই যখন দর্শক-শ্রোতার আবেদনের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে তখন তাতে পড়েছে ব্যবসায়ীর সুচতুর প্রলোভন-কৌশল। একটি বিষয় বিশেষ থেকে সাধারণ বা অতি-সাধারণ হয়ে বিশেষত্ব লাভ করেছে বিশেষ মুহূর্তের শিল্পসৌন্দর্য। ফলত সীমায়িত হ'ল বাঁধন। একসময় যা ছিল চেনা জগতের পরিচিত গণ্ডি, পরবর্তীতে সেটাই আবার দুর্লভ হয়ে উঠলো। অর্থাৎ বিশেষ কোনো তত্ত্বগত বিষয়ের উদঘাটন ক'রে ক্রমে দর্শকমনে চমক লাগানোর প্রয়াসী আস্ফালন বেশ সুনাম অর্জন করেছে প্রযোজক-পরিচালকের হাত ধরে। কারণ একটি শিল্পকে পার্থিব সত্যেই মুক্তি দিতে হ'লে এক বৃহৎ অংশের আর্থিক পরিসরের দিকে আলোকপাত করার প্রয়োজন। তাই শিল্পীর কাছে Crisis যেমন আর্থিক পরিমণ্ডল, তেমনি ব্যবসায়ীও জানে শিল্পের সার্থক প্রকাশেই বিক্রয়মূল্য লাভজনক হবে। সেক্ষেত্রে শিল্পী ও ব্যবসায়ী দুজনেই পারস্পরিক কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। "ব্যবসায়ী অর্থাৎ প্রযোজক অর্থের সংস্থান করেন, শিল্পী অর্থাৎ পরিচালক সেই অর্থের সাহায্যে ছবি তৈরি ক'রে প্রযোজকের হাতে তুলে দেন। প্রযোজক সেই তৈরি ছবি প্রেক্ষাগৃহ মারফত জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করেন। জনসাধারণ যদি সে ছবি সাদরে গ্রহণ করেন অর্থাৎ যথেষ্ট সংখ্যায় টিকিট কিনে সে ছবি দেখেন, তবেই তাঁর আর্থিক সাফল্য"।[১৭]

(৯)

সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের মধ্যেকার সম্পর্ক, সৃষ্টির দুই ভিন্ন ধারা কীভাবে এক স্রোতে নিত্য বহমান হয়েছে – আলোচ্য প্রবন্ধে সেই সত্য উদ্‌ঘাটনের নিরলস প্রচেষ্টা বহমান। সাহিত্যে যে বিষয়কে শব্দরাজির মাধমে পাঠকের অন্দরমহলে তুলে ধরার চেষ্টা থাকে, ছায়াছবিতে তাকেই অন্যরূপে, অন্যস্বাদে উন্মোচন করতে হয়। তাই সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্রের পরিণতিকালে নির্মাতাকে অনেক বেশি দায়িত্ব-সচেতক হতে হয়। চরিত্র-ভাষা-প্রতীকের ব্যবহার-পরিস্থিতির অনুসন্ধান-Background Music –এ সব কিছুর জন্যই যেন তাঁকে আপন অভ্যস্ত আত্মবিশ্বের সাবলীল বাসিন্দা হতে হয়, নয়তো সেই ঘটমান ইতিহাসের ভাষা আগামীর নতুন বিশ্বের শ্রোতার-দর্শকের মনকে বিগলিত করবে না। বিভূতিভূষণের সেই শান্ত-নিস্তরঙ্গ পল্লীজীবনের কথাকেই নানান কারুকৌশলে ও তাকে চমৎকারিত্ব ক'রে তোলার গুনে শিল্পসৌন্দর্যের দিকে নিয়ে গেলেন সত্যজিৎ। নবনির্মাণ করতে হলে স্রষ্টাকে ধূপের মতোই পুড়তে হয়, লড়াই চালাতে হয় সৃষ্টি-সফলতাকে উন্মেষমুখী করার লক্ষ্যে। একরাশ অতৃপ্তির মাঝেই যেখানে সত্যজিতের সৃষ্টির শিল্পতত্ত্বের নির্যাস, সেখানেই সত্যজিৎ স্বতন্ত্র ও অনন্য; এককথায় 'একমেবাদ্বিতীয়ম'।

উল্লেখপঞ্জি

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *নবজাতক*, কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, বৈশাখ ১৩৪৭, পৃষ্ঠা – ১।

২. নির্মাল্য আচার্য ও দিব্যেন্দু পালিত সম্পা., *শতবর্ষে চলচ্চিত্র* (দ্বিতীয় খন্ড) ইতিহাস ও বিবর্তন, "সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা" : অসীম সোম, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম মুদ্রণ জুলাই ২০১৯, পৃষ্ঠা - ৪৪০।

৩. অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় সম্পা., *আধুনিক কবিতা সঞ্চয়ন*, 'সংগতি' : অমিয় চক্রবর্তী, বর্ধমান : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ, জুলাই ২০০৯, পৃষ্ঠা – ১২৬।

৪. সন্দীপ রায় সম্পা., *প্রবন্ধ সংগ্রহ : সত্যজিৎ রায়*, 'পথের পাঁচালী', কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃষ্ঠা ২০২।

৫. নির্মাল্য আচার্য ও দিব্যেন্দু পালিত সম্পাদিত, *শতবর্ষে চলচ্চিত্র* (দ্বিতীয় খন্ড) ইতিহাস ও বিবর্তন, 'সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা' : অসীম সোম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৪৪৪।

৬. সন্দীপ রায় সম্পাদিত, *প্রবন্ধ সংগ্রহ : সত্যজিৎ রায়*, 'পথের পাঁচালী', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ২০৩।

৮. সন্দীপ রায় সম্পা., *প্রবন্ধ সংগ্রহ : সত্যজিৎ রায়*, 'পথের পাঁচালী', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ২০৩-২০৪।

৯. সত্যজিৎ রায়, *বিষয় : চলচ্চিত্র*, 'বাংলা চলচ্ছিত্রের আর্টের দিক', কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ত্রয়োদশ মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০১৮, পৃষ্ঠা – ১০১।

১০. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পথের পাঁচালী*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, একবিংশ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪০৯, পৃষ্ঠা – ৪।

১১. সত্যজিৎ রায়, বিষয় : চলচ্চিত্র, "ওরফে ইন্দির ঠাকরুণ", প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ১০০।

১২. সত্যজিৎ রায়, *বিষয় : চলচ্চিত্র*, 'ওরফে ইন্দির ঠাকরুণ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ১০২।

১৩. নির্মাল্য আচার্য ও দিব্যেন্দু পালিত সম্পাদিত, *শতবর্ষে চলচ্চিত্র* (দ্বিতীয় খন্ড) ইতিহাস ও বিবর্তন, "সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা" : অসীম সোম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৪৪৫।

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সাহিত্য*, 'সাহিত্যের বিচারক', কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পুনর্‌মুদ্রণ ১৯৫৮ জানুয়ারি, পৃষ্ঠা – ২৩।

১৫ রবিন ঘোষ সম্পাদিত, *শতবর্ষে সত্যজিৎ রায়*, চিত্রনাট্যের সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরে সত্যজিৎ, বিজ্ঞাপন পর্ব ৪৭তম বর্ষ, শারদীয়া ১৪২৬, চলচ্চিত্র আশ্বিন ১৩৬৯, রেজিস্ট্রেশন নম্বর ৩৪৩ ৫৬/৮১, পৃষ্ঠা - ৬৬।

১৬. রবিন ঘোষ সম্পাদিত, *শতবর্ষে সত্যজিৎ রায়*, চিত্রনাট্যের সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরে সত্যজিৎ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৬৮।

১৭. সত্যজিৎ রায়, *বিষয় : চলচ্চিত্র*, 'বাংলা চলচ্ছিত্রের আর্টের দিক', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৪৩।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. পার্থ বসু, সত্যজিৎ রায়, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, দ্বিতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি, ২০১৫।
২. https://bn.wikipedia.org/wiki
৩. .https://bn.wikipedia.org/wiki
৪. https://www.youtube.com/watch

ড. সুব্রত কুমার দে : হুগলীর রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের স্টেট এডেড কলেজ টিচার।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধস্বর :
সত্যজিতের কিশোর সাহিত্য

শঙ্কুর গল্প কি শুধুই কল্পবিজ্ঞান আর অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনি? তার ভেতরে কি প্রচ্ছন্ন হয়ে নেই সভ্যতার 'হীনতম প্রাণী'-দের প্রতি কোনো কঠোর কঠিন ইঙ্গিত? শঙ্কুর গল্পের অন্দরমহলে সামান্য উঁকি দিলেন **সংগ্রাম চ্যাটার্জী**।

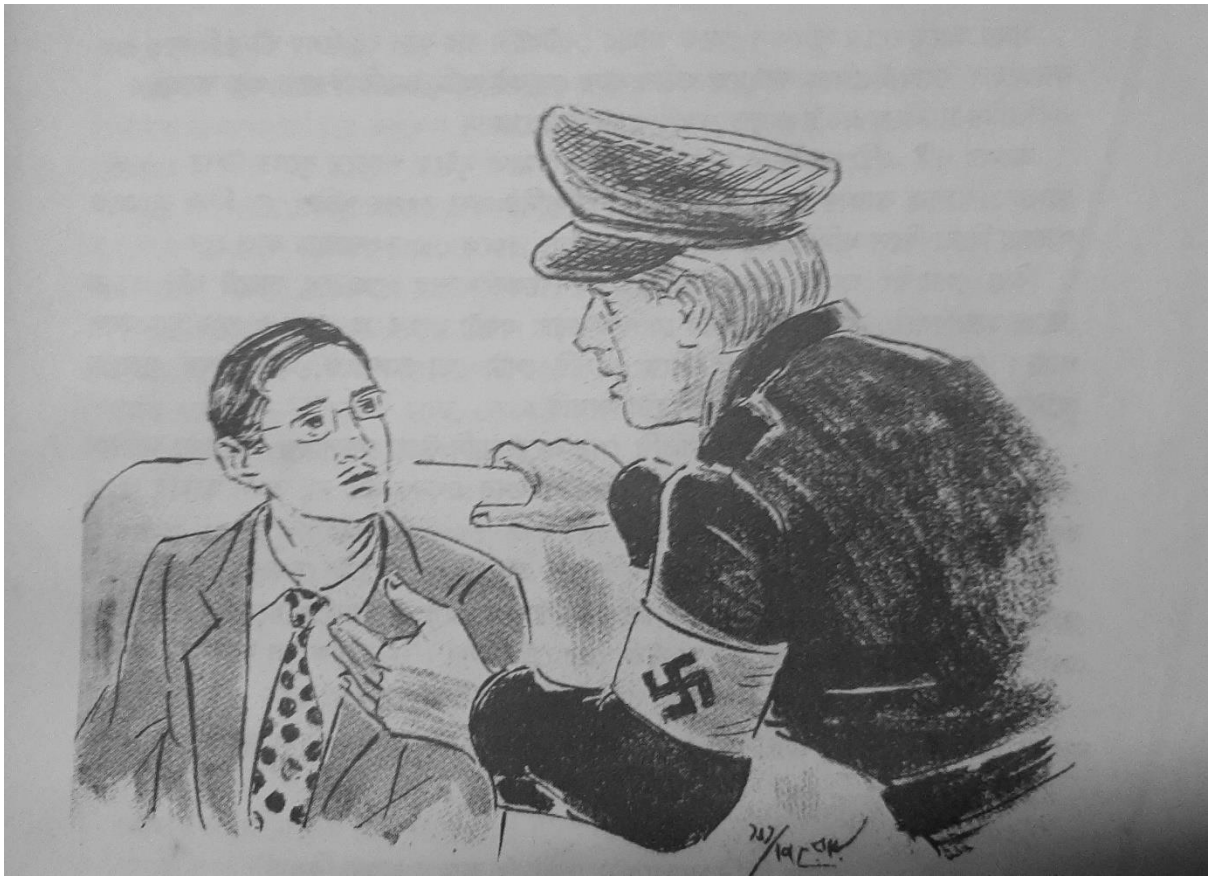

১. 'হীনতম প্রাণী'র উল্লেখ

"মাই ডিয়ার শঙ্কু— তোমার মহৌষধ বিশ্বের হীনতম প্রাণীর উপকারে আসবে এটা আমি চাইনি, চাইনি, চাইনি।"

চেনা অংশ? না চিনতে পারলে বলেই দিই— এটা সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত শঙ্কু কাহিনি 'স্বর্ণপর্ণী' থেকে নেওয়া। গল্পটা কার্যত শেষ হচ্ছে এই কথাটার পরেই।

গল্পটা যাঁরা পড়েছেন, তাঁদের বিরক্তির উদ্রেক না করেই যাঁরা পড়েন নি এখনও— তাঁদের জন্যে একটু বলে দেওয়া ভালো—

এর প্রেক্ষাপট ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাস, অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর ঠিক কিছুটা আগে। ফ্যাসিস্ট হিটলারের নাৎসী বাহিনী তখন জার্মানির একচেটিয়া শাসক। জার্মানি জুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে ইহুদীদের চিহ্নিত করে তাদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বানানোর কাজটা! সেই সময়ে জীবনদায়ী ওষুধ 'মিরাকিউরল' আবিষ্কারের পর জার্মানি গিয়ে তা দিয়ে এক জার্মান ইহুদী অধ্যাপকের জীবন বাঁচান প্রফেসর শঙ্কু। খবরটা জানাজানি হতেই ব্ল্যাকশার্ট বাহিনীর মাধ্যমে খোদ গোয়রিং (নাৎসী বাহিনীর 'নাম্বার টু', হিটলারের পরেই যার স্থান!) তুলে নিয়ে যায় শঙ্কুকে। উদ্দেশ্য— নিজের চিকিৎসা, এবং ঐ মহৌষধ নাৎসী বাহিনীর কুক্ষিগত করা। সেই পরিস্থিতিতে কীভাবে ঐ ইহুদী পরিবারটিকে দেশত্যাগ করতে সাহায্য করে তাদের জীবন রক্ষা করলেন, কীভাবে নিজের জীবন বাঁচালেন এবং সর্বোপরি কীভাবে গোয়রিং এবং গোটা নাৎসি বাহিনীকে ঐ মহৌষধ 'মিরাকিউরল' দেওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেলেন প্রফেসর শঙ্কু— এই নিয়েই এই গপ্পো!

প্রথমে যে অংশটা কোট করেছি সেটা আরেকবার পড়ে দেখুন। ফ্যাসিস্টদের সম্পর্কে সত্যজিৎ লিখছেন— "বিশ্বের হীনতম প্রাণী"

২. শুধু শঙ্কু কাহিনি নয়, ফেলুদার গল্পেও

এটা ঠিকই যে বাঙালি পাঠকের কাছে তুলনায় সত্যজিতের ফেলুদা কাহিনী অনেক বেশিই জনপ্রিয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রথম শঙ্কু কাহিনি 'ব্যোমযাত্রীর ডাইরি' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬১ সালে, অর্থাৎ ফেলুদারও আগে। এর ঠিক পরে পরেই প্রকাশ পেয়েছিল ছোটদের জন্যে লেখা গল্প 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু'। তার আরো প্রায় বছর চারেক পর আত্মপ্রকাশ ঘটে ফেলুদার।

ফেলুদার কাহিনিগুলোয় সরাসরি রাজনীতি প্রায় আসেনি বললেই চলে। যেটুকু এসেছে সে একমাত্র 'টিনটোরেটোর যীশু'তে। এবং সেটাও ঐ একইভাবে ফ্যাসিস্ট এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েই। তবে এখানে জার্মানি আর হিটলারের বদলে পটভূমিকায় ইতালি, অর্থাৎ মুসোলিনি।

যাঁরা ঐ উপন্যাসটা পড়েছেন, তাঁদের পক্ষে মনে করা সহজ যেখানে ঐ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র চন্দ্রশেখর সম্পর্কে বলতে গিয়ে ভগওয়ানগড়ের রাজা ভূদেব সিং বলছেন—

> মুসোলিনি তখন ইটালির একচ্ছত্র অধিপতি। বেশির ভাগ ইটালিয়ানই তাকে পুজো করে। কিন্তু কিছু বুদ্ধিজীবী— শিল্পী, সাহিত্যিক, নাট্যকার, সংগীতকার— ছিলেন মুসোলিনি ও ফ্যাসিস্ট পার্টির ঘোর বিরোধী। চন্দ্র ছিল তাদেরই একজন। কিন্তু তার ছেলেই শেষ পর্যন্ত ফ্যাসিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়। তার এক বছর আগে কার্লা মারা গেছে ক্যানসারে। এই দুই ট্র্যাজেডির ধাক্কা চন্দ্র সইতে পারে নি। তাই সে দেশে ফিরে আসে। ছেলের সঙ্গে সে কোনও যোগাযোগ রাখেনি।

সত্যজিৎ রায়ের ফেলু কাহিনিগুলোর মধ্যে এই 'টিনটোরেটোর যীশু'তেই একমাত্র ফ্যাসিবাদের প্রতি সত্যজিতের তীব্র ঘৃণা সরাসরি প্রকাশ পেয়েছে। আর সম্ভবত কোথাওই না। অথচ ঠিক এর উল্টোদিকে আরেকটু কমবয়সিদের জন্য সৃষ্ট চরিত্র 'প্রফেসর শঙ্কু'র একাধিক কাহিনিতে বারবারই এসেছে সত্যজিতের এই মনোভাব। মোট ৩৮ টা পূর্ণাঙ্গ এবং দুটি অসম্পূর্ণ শঙ্কু কাহিনির খবর আমরা জানি। এর মধ্যে ঐ 'স্বর্ণপর্ণী' ছাড়াও আরো অন্তত গোটা চারেক ক্ষেত্রে তা পরিষ্কার ভাবেই দেখা গিয়েছে।

প্রথম শঙ্কু কাহিনি 'ব্যোমযাত্রীর ডাইরি'র প্রায় ১৩ বছর পরে লেখা 'ডক্টর শেরিং-এর স্মরণশক্তি'তে সরাসরি ফ্যাসিবিরোধিতা না থাকলেও শঙ্কু কাহিনিতে সম্ভবত এই প্রথমবার সত্যজিতের যুদ্ধবিরোধী মনোভাবের প্রকাশ দেখা গেল। 'বি এক্স ৩৭৭' নামক আণবিক মারণাস্ত্রের ফর্মুলা যুদ্ধ ব্যবসায়ীদের হাতে পৌঁছানোর আগেই কীভাবে সেই ফর্মুলা ধ্বংস করা সম্ভব হল— সেই নিয়েই এই গপ্পো।

এর ঠিক পরের শঙ্কু কাহিনিই 'হিপনোজেন', যেখানে প্রথমবার শঙ্কু মোকাবিলা করছে এক ভয়ংকর ডিক্টেটরের— উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র আলেকজান্ডার ক্রাগ। বিজ্ঞানী, বা বলা ভালো অপবিজ্ঞানী। লক্ষ্য – একদিকে মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবন, আবার আরেকদিকে সেই বেঁচে ওঠার এবং বেঁচে থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে গোটা পৃথিবীর একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করা। যার হাতিয়ার – একটা আবিষ্কার, একটি গ্যাস। নাম হিপনোজেন। যে গ্যাসের একটিমাত্র কণা একজন মানুষকে ২৪ ঘন্টা সম্মোহিত বা হিপনোটাইজড্ করে রাখতে সক্ষম! আর সত্যিই তো, "লোকের মন একবার দখল করতে পারলে তাদের উপর কর্তৃত্ব করতে অসুবিধা কোথায়?"

অনবদ্য চরিত্রায়ণ এক ডিক্টেটরের। চেনা লাগছে না? এখান থেকে রিলেট করতেই পারেন 'হীরক রাজার দেশে' ছবির 'যন্তর মন্তর'-এর সাথে।

এর পরের একাধিক শঙ্কু কাহিনিতে সরাসরি ফ্যাসিস্টদের প্রতি মনোভাব চিত্রিত করেছেন সত্যজিৎ। যেমন ধরুন 'শঙ্কুর কঙ্গো অভিযান'।

এখানে এক জায়গায় পরিষ্কার উল্লেখ আছে বুখেনওয়ালড্ কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প এবং সেই ক্যাম্পে ইহুদি বন্দিদের উপর অত্যাচারের। ঐ উপন্যাসেই শঙ্কুর জবানিতে লিখছেন সত্যজিৎ—

> আমি অবাক হয়ে দেখছি হাইমেনডর্ফের দিকে। চোখে ওই ক্রূর দৃষ্টি, ওই ইস্পাত শীতল কণ্ঠস্বর— একজন প্রাক্তন নাৎসীর পক্ষে মানানসই বটে।

এর আরও প্রায় এক যুগ পরের লেখা 'শঙ্কু ও ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন'। পটভূমি আবারও জার্মানি, এবং এবার ফোকাসে নিও-নাৎসীরা। আবারও দ্বন্দ্ব শুভ-অশুভের মধ্যে, এবং পরিশেষে নিও-নাৎসী নেতা রেডেলকে নিও-ফ্যাসিস্ট থেকে নতুন জীবনে পাঠানো, অমানুষ থেকে মানুষে রূপান্তরিত করা। যার পরিণতিতে শঙ্কুর জবানিতে লেখা হচ্ছে – "যতদূর মনে হয় হিটলারপন্থী দল এবার নিশ্চিহ্ন হবে।"

এরও বছর দুয়েক পরের লেখা 'স্বর্ণপর্ণী'।

৩. স্বর্ণপর্ণী-র পুনর্পাঠ

'স্বর্ণপর্ণী' উপন্যাসটা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯০ সালে। এরপর আরও দুটো শঙ্কু কাহিনি প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু দুটোই অসম্পূর্ণ। ফলে এটাই শেষতম সম্পূর্ণ শঙ্কু কাহিনি।

ঘটনা পরম্পরা দেখলে আবার এটাই শঙ্কুর প্রথম কাহিনি! পুরোটাই ফ্ল্যাশব্যাকে বিবৃত। অন্য শঙ্কু-কাহিনিগুলো রোজনামচা আকারে, ডাইরির একের পর এক দিন ধরে এগিয়ে চলা কাহিনি। আর এইটেতে ডাইরির পাতা একটা দিনেই (১৬ জুন) আটকে, নিজের জন্মদিনে স্মৃতিচারণ করার ঢংয়ে বিবৃত গপ্পো।

জীবনসায়াহ্নে এসে স্মৃতিচারণা শঙ্কুর (বা হয়তো সত্যজিতেরও)। এই স্মৃতিচারণার ফর্মেই লেখা হল শঙ্কুর সর্বশ্রেষ্ঠ কাহিনি।

কোনোরকম ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা না, সরাসরি ফ্যাসিস্ট জার্মানির বিরোধিতা। সরাসরি সেই মানবতার শত্রুদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া এবং সর্বোপরি সরাসরি "বিশ্বের হীনতম প্রাণী" ফ্যাসিস্টদের সামান্য একটু হলেও হারানোর কাহিনি। মানবতার জয়ের কাহিনি।

পুনশ্চ

সত্যজিৎ দেখে যেতে পারেননি ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বরের দিনটিকে, যেদিনটা আমার দেশের ইতিহাসে এক মোটা কালো লাইন টেনে দিয়েছে। সত্যজিতের দেখার প্রশ্নই নেই তথাকথিত 'হোয়াটস্ অ্যাপ ইউনিভার্সিটি'র মাধ্যমে সংঘ পরিবারের পক্ষ থেকে ক্রমাগত মগজ ধোলাইয়ের এই সময়টাকে। দেখে যাননি সত্যজিৎ এখনকার NRC-CAA'র পর্বটাকেও।

কিন্তু জেনেছিলেন ইহুদীদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বানানোর ন্যুরেমবার্গ আইনের কথা। দেখেছিলেন গোটা বিশ্ব জুড়ে নিও-ফ্যাসিস্ট প্রবণতার সাময়িক হলেও মাথাচাড়া দেওয়াটাকে। দেখেছিলেন নিজের দেশে সংঘ পরিবারের ক্রমশ বাড়বাড়ন্তকে।

একেবারে ছোটদের জন্য লেখা শঙ্কু কাহিনি। সবচেয়ে বেশি দিন যারা থাকবে, সবচেয়ে বেশি লড়াই যাদের করতে হবে মানবতার শত্রুদের বিরুদ্ধে— তাদের জন্যে লেখা।

আশার পক্ষে, মানবতার পক্ষে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে ইতিহাস থেকে শেখার জন্যেই বোধহয় একদম শেষ লগ্নে আসে 'স্বর্ণপর্ণী'র মতো লেখাটা।

সংগ্রাম চ্যাটার্জী : রাজনৈতিক কর্মী ও প্রবন্ধকার।

চিন্তাভাবনার সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত এখন বাংলা ভাষায়

আন্তর্জাতিক

পাঠশালা

এখন আন্তর্জালিক সংস্করণ

চোখ রাখুন

antorjatikpathsala.com

আগামী সংখ্যার ক্রোড়পত্র

বঙ্গবন্ধুর

শতবর্ষ ও

বাংলাদেশ

মুক্তিযুদ্ধ

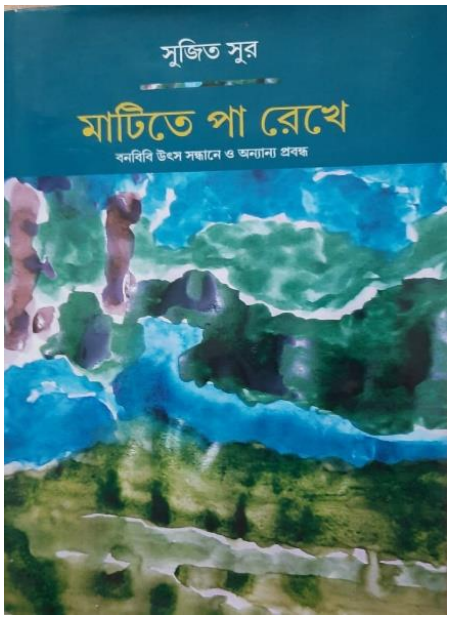

মাটিতে পা রেখে - সুজিত সুর

..

।।প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি , ২০১৪।।

সঙ্কলন ও সম্পাদনা : অমিত রায়।
প্রকাশক : কপোতাক্ষী সুর।
প্রচ্ছদ : শ্রীমান অর্হণ দাশমুন্সী।
মুদ্রক : সুব্রত সরকার।
মূল্য : ৩০০/-
মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৯২
ISBN : 978-81-926858-4-7

জলজঙ্গলের দেশ সুন্দরবন। আর সুন্দরবন মানে জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ। কোনো এক সময় বন কেটে গড়ে উঠেছে বসত, আবাদ। কবে গড়ে ওঠে সেই বসত? কোথা থেকে এসে এখানে জড়ো হয় মানুষ? কীভাবে জন্ম নেয় জনপদ? হিন্দু-মুসলমান – নানা ধর্ম নানা জাত। নানা উপকথা। নানা দেবদেবী। বনের দেবী 'বনবিবি' নাকি জঙ্গলের শাহ শা-জঙ্গলির বোন 'বোনবিবি'? জঙ্গল নির্ভর মানুষ – কাঠুরে, জেলে, মৌলে – আর তাদের সংস্কার – 'জঙ্গলে পড়া'র ভয়। তাদের মনে জোর আনতে গুণিন, বাওলে, পীর-গাজি-ফকির – মন্ত্র, জাদুবিশ্বাস। জীবিকার পাশাপাশি পুজো, উৎসব, লোকগান – শীতলার জাগরণ, শিবের গাজন, চড়ক, মনসার ভাসান, বোনবিবির পালা, দুখে যাত্রা। নানা উপকথায় দক্ষিণ রায়, ধনা মৌলে, মবলেজ ফকির। ইংরেজ আমলে সুন্দরবন। বেনিয়া প্রশাসন। 'নেমক খালাড়ি'র শোষণ। শোষণের হাত থেকে হতদরিদ্র মানুষকে মুক্তি দিতে হেঙ্কেলের প্রচেষ্টা। পরিশেষে, সুন্দরবন অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমানি বিয়ের আচার, বিয়ের গান। মানুষের মধ্যে 'মাটিতে পা রেখে' দাঁড়িয়ে লোকজীবনের নানা গভীর-গহন কাহিনি শোনালেন সুজিত সুর।

পাঠশালা প্রোডাকসন্স

একা দশ কথা - অমিত রায়

।।প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি , ২০১৪।।

প্রকাশক : কপোতাক্ষী সুর।
প্রচ্ছদ : শুভেন্দু দাশমুন্সী।
মুদ্রক : সুব্রত সরকার।
মূল্য : ১২০/-
মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১১২
ISBN : 978-81-926858-7-8

নারী-পুরুষের সম্পর্ক চিরকালীন। মনের মানুষের খোঁজে পথ চলা। সম্পর্ক কখনো জৈবিক। কখনো সামাজিক, কখনো বা মানসিক। কিন্তু সব কিছু ছাড়িয়ে সম্পর্ক যখন মানবিক্, তখনই তা সম্পূর্ণ। নারী-পুরুষের সম্পর্কের নানা ধরনের একফালি গল্প নিয়ে হাজির ‘একা দশ কথা’। কখনও তা মজার মোড়কে কখনো বা তার উপস্থাপনা গম্ভীরতর। এসব নিয়েই অমিত রায়’এর দশটি গল্পের সমাহার।

পাঠশালা প্রোডাকসন্স

মানব মানবী - অমিত রায় ও কপোতাক্ষী সুর

।।প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি , ২০১৪।।

প্রকাশক : কপোতাক্ষী সুর।
প্রচ্ছদ : শুভেন্দু দাশমুন্সী।
মুদ্রক : সুব্রত সরকার।
মূল্য : ৭৫/-
মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৬২
ISBN : 978-81-926858-3-0

নারী-পুরুষ-ভালোবাসা-সম্পর্ক-অসম্পর্ক-সমাজ স্বীকৃতি – সব কিছুতেই ওলোট পালট হয়ে যায় – চোখে চশমা পরে তথাকথিত হিসেবের জাবদা খাতা কে ঘাঁটে – কে গড়ে মানব-মানবীর চিরন্তন ভালোবাসার নিগড়, কোন সে অধিকারে হয় অস্বীকৃত এক-একটি ভালোবাসা, কে দেয় অন্যের জানালায় উঁকিঝুঁকি? নানা ধরনের সম্পর্ক উঠে আসে দু-জন কবির কলমে – মানব-মানবী মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

বইটির অভিনব প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় একই বইয়ের দু-দিক দিয়ে দুই কবির আগমন।

পাঠশালা প্রোডাকসন্স

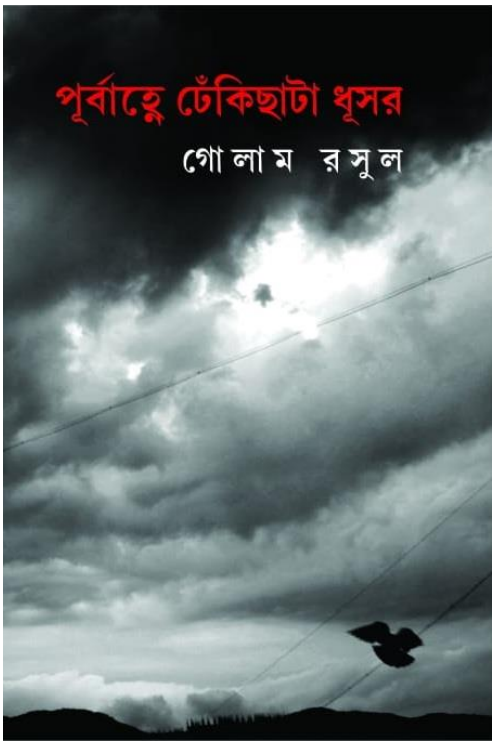

পূর্বাহ্নে ঢেঁকিছাটা ধূসর - গোলাম রসুল

।।প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি , ২০১৪।।

প্রকাশক : কপোতাক্ষী সুর।
প্রচ্ছদ : শুভেন্দু দাশমুন্সী।
মুদ্রক : সুব্রত সরকার।
মূল্য : ৭৫/-
মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৬৪
ISBN : 978-81-926858-5-4

বেশ কয়েক বছর ধরে লেখালেখি করছেন গোলাম রসুল। গত তিন-চার বছরে লেখালেখি এসেছে বহুসংখ্যক পাঠকের সামনে। তৈরি হয়েছে তাঁর কবিতা মুগ্ধ পাঠককুল। গোলাম কবিতা শোনান না – দেখান। একের পর এক ছবি আপাতদৃষ্টিতে সংলগ্ন না হলেও বিনি সুতোর বয়নে সুগ্রথিত। পাঠকের মনে ও মস্তিষ্কে তার অন্তর্গূঢ় সঞ্চার। কবিতার এক পা বাস্তবের মাটিতে অপর পা অতীন্দ্রিয় অনুভুতির জগতে।

মো্ট ৫৩-টি কবিতা নিয়ে এক অনবদ্য সংকলন।

পাঠশালা প্রোডাকসন্স

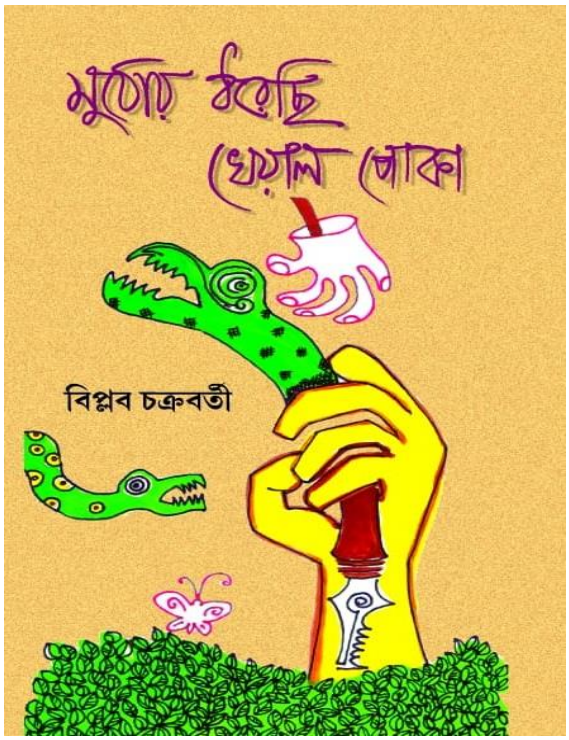

মুঠোয় ধরেছি খেয়াল পোকা - বিপ্লব চক্রবর্তী

।।প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি , ২০১৪।।

প্রকাশক : কপোতাক্ষী সুর।
প্রচ্ছদ : শুভেন্দু দাশমুন্সী।
মুদ্রক : সুব্রত সরকার।
মূল্য : ৭০/-
মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫৬
ISBN : 978-81-926858-6-1

বিপ্লব চক্রবর্তী কবি-গল্পকার। আত্মপ্রকাশ স্কুল-ম্যাগাজিনের পাতায়। সৃজনের সেই পর্যটনের বিপল্ব এখনও অক্লান্ত। মৃত্যু ও বিষাদ থাকলেও তাঁর কবিতায় লীন হয়ে আছে হার-না-মানা এক আশ্চর্য আশাবাদের চলমানতা।

মো্ট ৪৮-টি কবিতা নিয়ে এক অনবদ্য সংকলন।

পাঠশালা প্রোডাকসন্স

মননশীল পাঠকের দরবারে 'আন্তর্জাতিক পাঠশালা'র সাম্প্রতিক কিছু সংখ্যা

আগ্রহী পাঠক সংখ্যাগুলি হাতে পেতে খোঁজ করতে পারেন সম্পাদকীয় দপ্তরে।

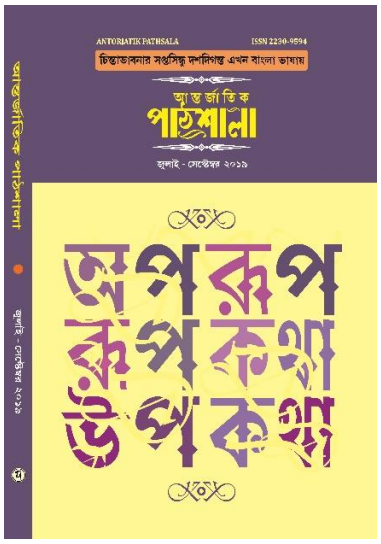

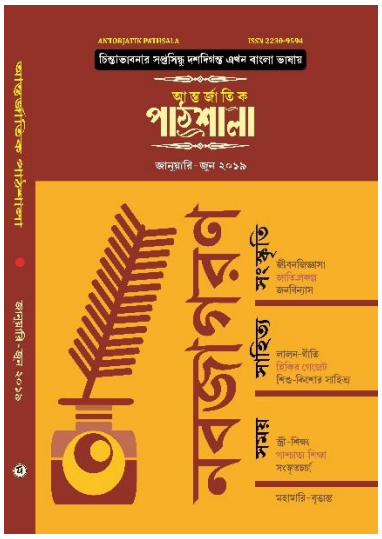

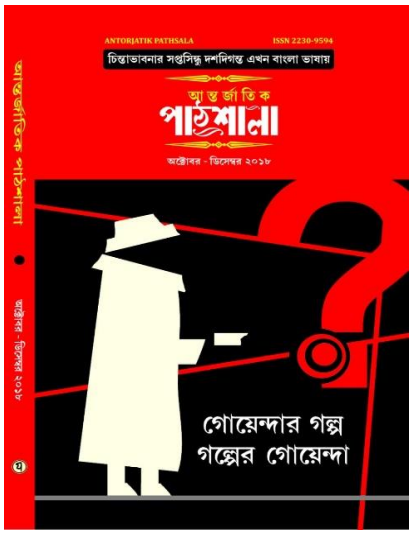

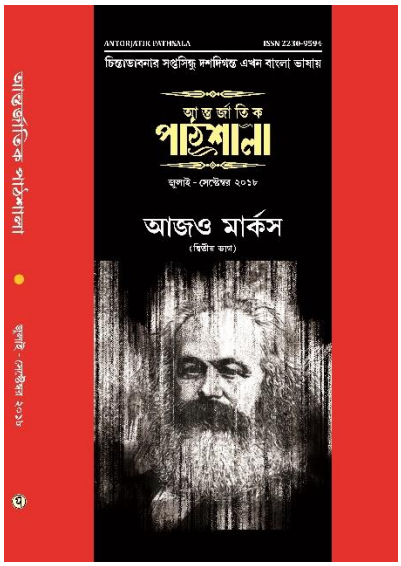

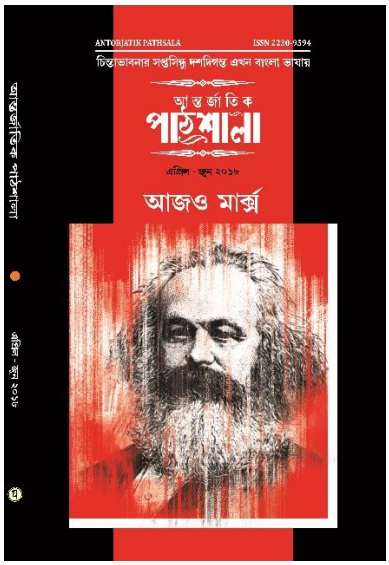

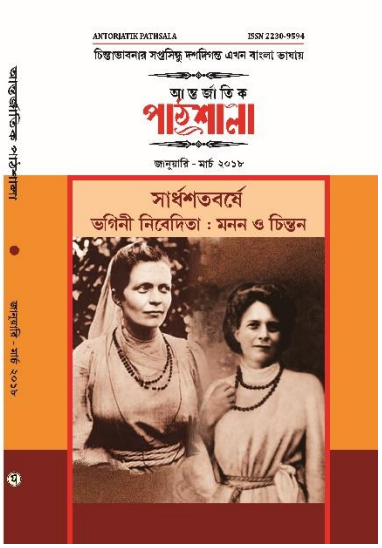

যোগাযোগ :

চলভাষ : 90076 74123.

বৈদ্যুতিন ডাক : antorjatikpathsala@gmail.com

পাঠশালা প্রোডাকসন্স

মননশীল পাঠকের দরবারে 'আন্তর্জাতিক পাঠশালা'র পুরনো কিছু সংখ্যা

আগ্রহী পাঠক সংখ্যাগুলি হাতে পেতে খোঁজ করতে পারেন সম্পাদকীয় দপ্তরে।

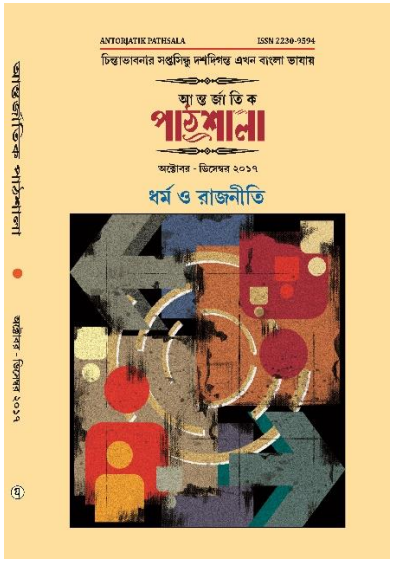

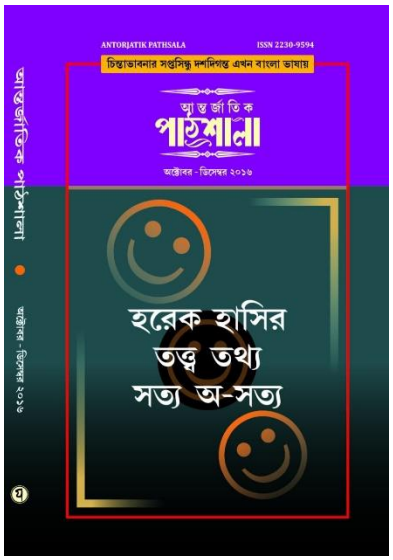

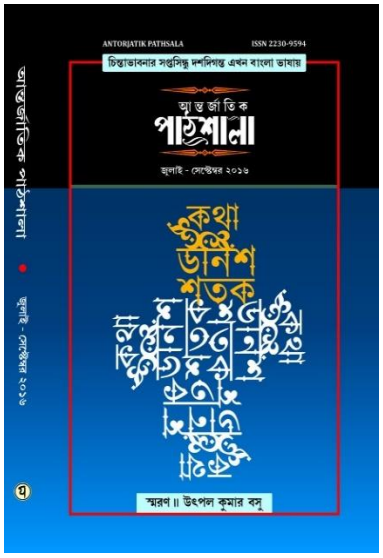

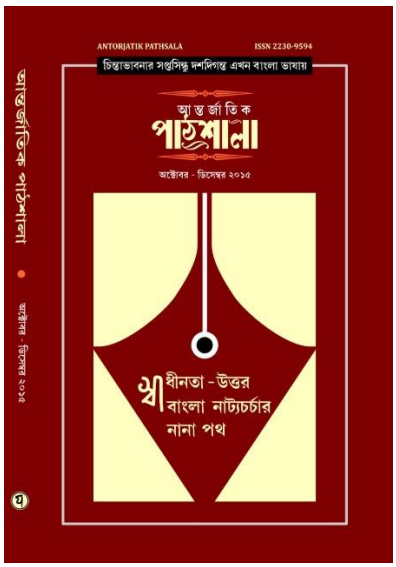

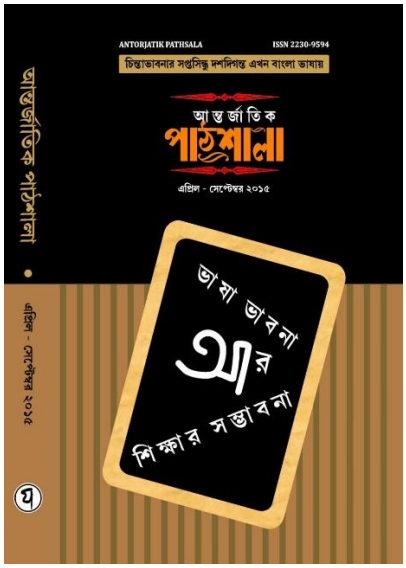

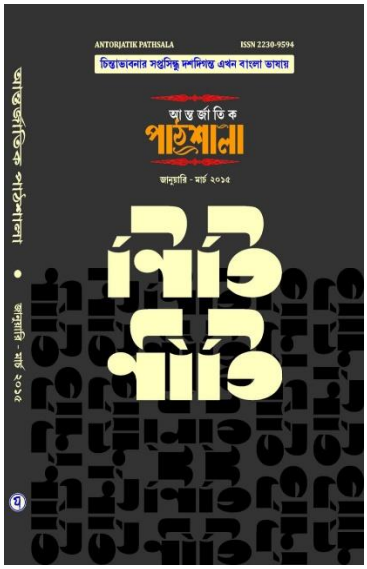

যোগাযোগ :

চলভাষ : 90076 74123.

বৈদ্যুতিন ডাক : antorjatikpathsala@gmail.com

পাঠশালা প্রোডাকসন্স

মননশীল পাঠকের দরবারে ‘আন্তর্জাতিক পাঠশালা’র পুরনো কিছু সংখ্যা

আগ্রহী পাঠক সংখ্যাগুলি হাতে পেতে খোঁজ করতে পারেন সম্পাদকীয় দপ্তরে।

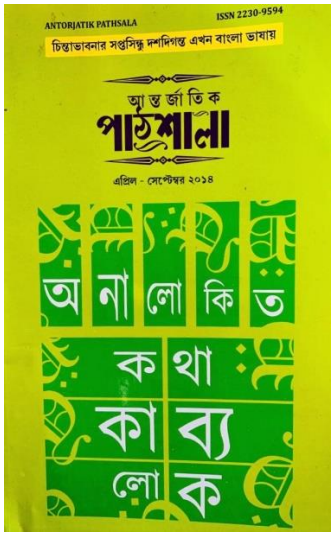

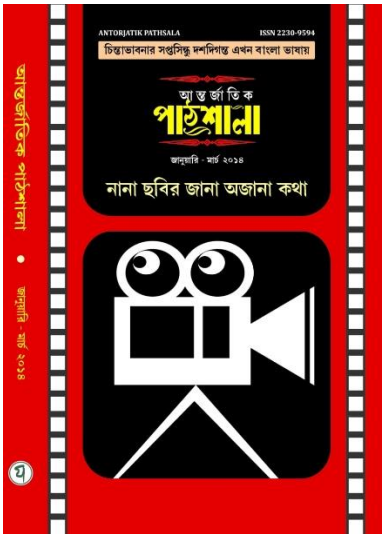

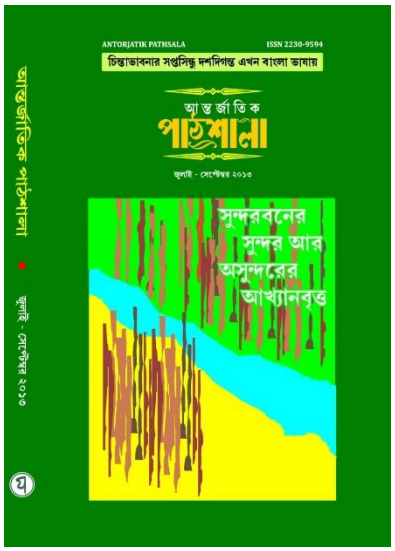

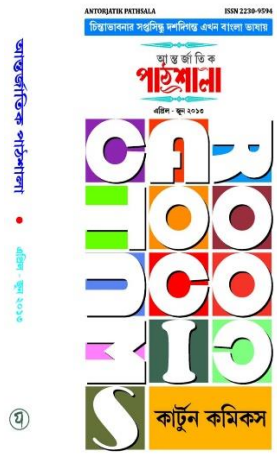

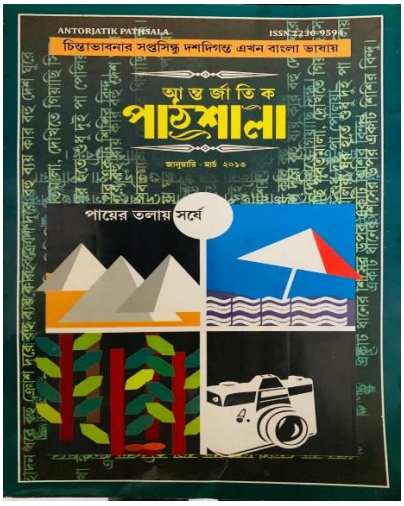

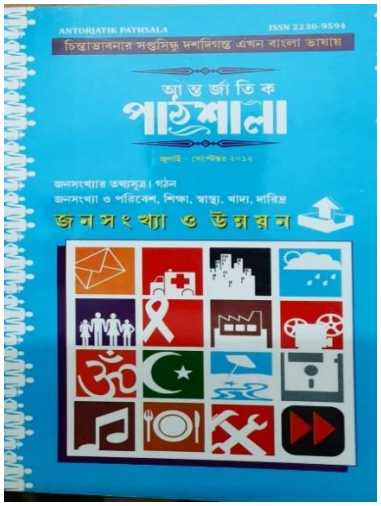

যোগাযোগ :

চলভাষ : 90076 74123.

বৈদ্যুতিন ডাক : antorjatikpathsala@gmail.com

পাঠশালা প্রোডাকসন্স

মননশীল পাঠকের দরবারে ‘আন্তর্জাতিক পাঠশালা’র পুরনো কিছু সংখ্যা

আগ্রহী পাঠক সংখ্যাগুলি হাতে পেতে খোঁজ করতে পারেন সম্পাদকীয় দপ্তরে।

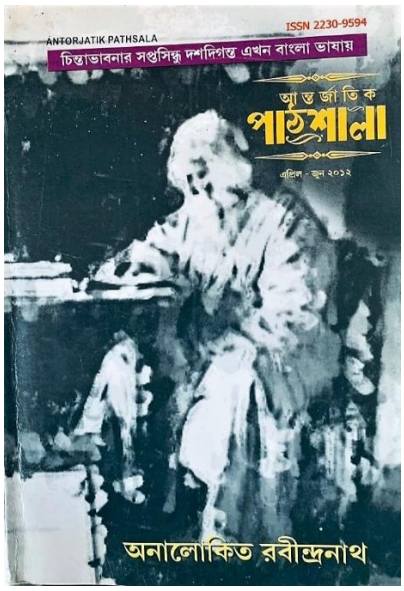

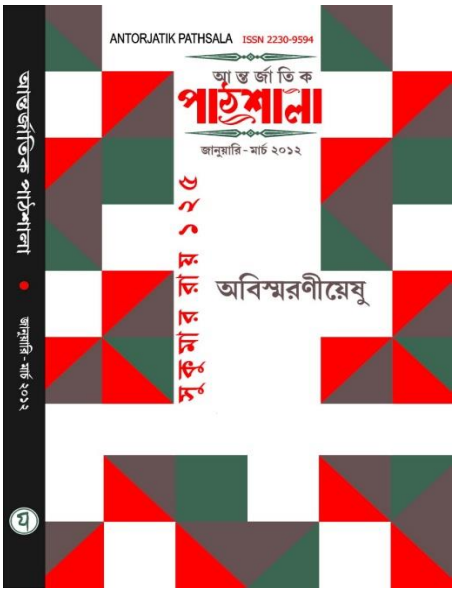

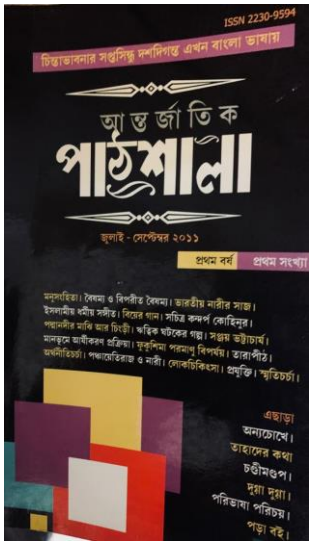

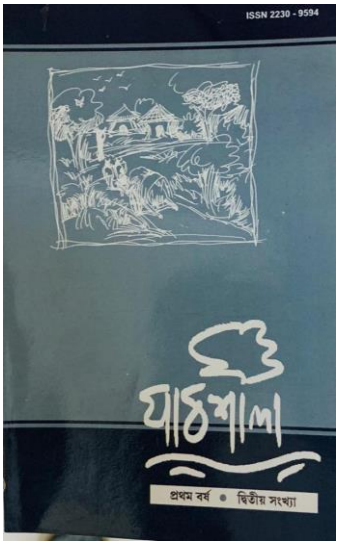

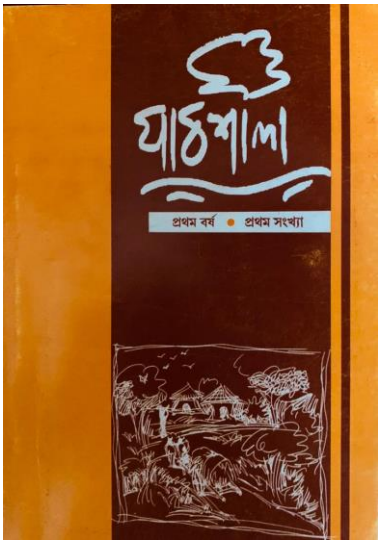

যোগাযোগ :

চলভাষ : 90076 74123.

বৈদ্যুতিন ডাক : antorjatikpathsala@gmail.com

পাঠশালা প্রোডাকসন্স

মননশীল পাঠকের দরবারে ‘আন্তর্জাতিক পাঠশালা’র পুরনো কিছু সংখ্যা

প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটিকা, গল্প, কবিতার সম্ভার নিয়ে উৎসব / বার্ষিক সংখ্যা

আগ্রহী পাঠক সংখ্যাগুলি হাতে পেতে খোঁজ করতে পারেন সম্পাদকীয় দপ্তরে।

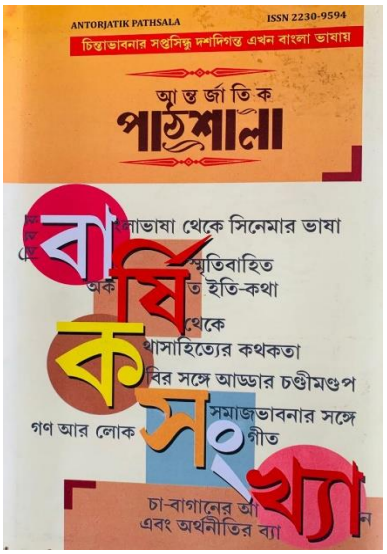

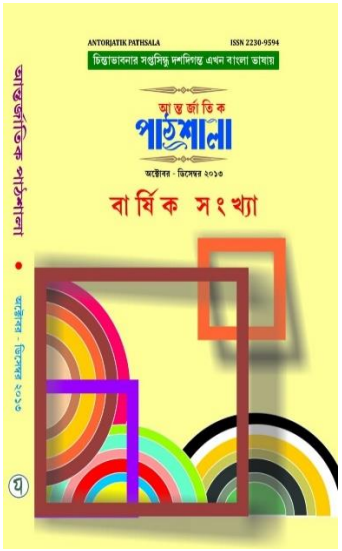

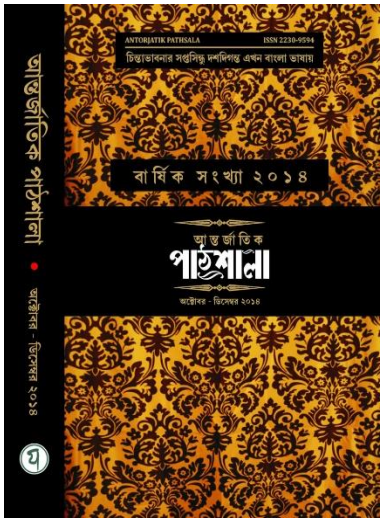

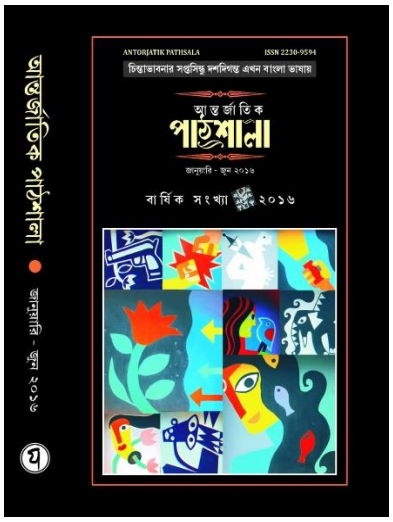

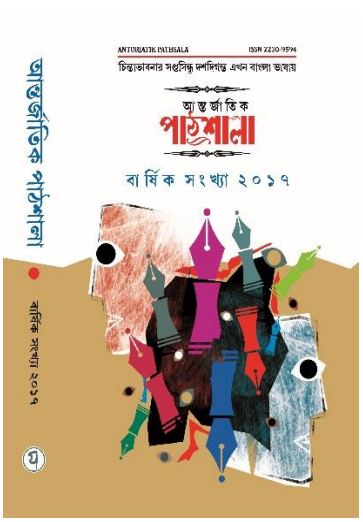

যোগাযোগ :

চলভাষ : 90076 74123.

বৈদ্যুতিন ডাক : antorjatikpathsala@gmail.com

পাঠশালা প্রোডাকসন্স

ANTOJATIK PATHSALA
Vol: X Issue: 1, e-Journal Edition: No-3
JANUARY 2021- MARCH 2021
Regn. No: WBBEN/ 2011/ 46759

চিন্তাভাবনার সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত এখন বাংলা ভাষায়

আন্তর্জাতিক পাঠশালা

এখন আন্তর্জালিক সংস্করণ

চোখ রাখুন
antorjatikpathsala.com

পূর্বতন দুটি সংখ্যার আন্তর্জালিক সংস্করণ
এখনও বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

Owner: Kapotakshi Sur, Publisher & Printer: Amit Roy
Address of Publication: Flat-3B, The Tolly Residency, 338, N.S.C. Bose Road, Kolkata: 700047
Name and Address ofPrinting House: SHYAMA PRESS, 35/E, Kailash Bose Street, Kolkata 700006
CHIEF EDITOR: AMIT ROY